১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ বারো টাকা

দেশ

তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৯৪-১৯৯৪)

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : ছন্নীমূর্খ

স্ক্যান করে দিয়েছেন : সৌমেন্দ্র পর্বত

এডিট করেছেন : সৌমেন্দ্র পর্বত ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

দেশ

২৪ ভাদ্র ১৪০১ • ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ • বর্ষ ৬১ সংখ্যা ২৩

সাহিত্যে অমর হওয়া সহজ নয়। একজন সাহিত্যিক জীবৎকালেই তাঁর সাহিত্যিক-খ্যাতি ম্লান হয়ে যেতে দেখেন। তিরোধানের পর লেখকের রচনা সম্পর্কে পাঠকের আদৌ কোনও আগ্রহ থাকবে কিনা সে ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সন্দিহান। বিরল ঘটনাও ঘটে, মৃত্যুর পর কোনও কোনও সাহিত্যিকের আকর্ষণ যত দিন যায় বৃদ্ধিই পেতে থাকে। নতুন প্রজন্মের পাঠক সেই লেখককে গভীর কৌতূহলে নতুন করে আবিষ্কার করেন ; এইভাবে জন্মে-প্রজন্মে চলে সেই লেখকের আবিষ্কার-পুনরাবিষ্কারের পালা। বিভূতিভূষণ (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-১ নভেম্বর ১৯৫০) ঠিক তেমনই একজন লেখক— যত তিনি প্রাচীন হতে থাকেন, ততই হয়ে ওঠেন নবীন। প্রকৃতি কখনও পুরনো হয় না, বিভূতিভূষণের সৃষ্টিও পুরনো হওয়ার নয়। প্রকৃতিই বুঝি লেখকের হয়ে তাঁর চিরজীবী রচনাগুলি আমাদের রচনা করে দিয়েছে।

সাহিত্য-বিচারে প্রাজ্ঞ অধিকারী, সাহিত্য-রসিক প্রবীণ অধ্যাপক ও সমালোচক বুঝি বা অপেক্ষা করে ছিলেন বিভূতি-জন্মের শতবর্ষের এই আবির্ভাবের জন্য ; তাঁর সমগ্র-সাহিত্য ও জীবনোপলব্ধির সঞ্চয়কে একটি সেরা সৃজনের প্রবন্ধে উজাড় করে দেওয়ার মানসে। শতবর্ষের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের লোকায়ত-বাস্তবতা এবং পরাবাস্তবতার অন্বেষণে ; ছবি আর সাহিত্যের সংযোগ-অনুসন্ধানে। তদ্ব্যতীত এ-যুগের ভিন্নবর্ণ কবি অবিস্মরণীয় অপুর পদচিহ্ন ধরে চলে গেছেন নিশ্চিন্দিপুরের অক্ষয় শৈশবে, সেই সঙ্গে শিল্পী গেছেন তুলি হাতে বিভূতিভূষণের চোখে প্রকৃতিকে ধরতে।

পাঁচালির পথে পথে • কিশলয় ঠাকুর • ২৫ • 'নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে' • সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় • ৩৭ • আরণ্যক : লোকায়ত-পাঠ • সুধীর চক্রবর্তী • ৫১ • অন্য বিভূতিভূষণ • সুতপা ভট্টাচার্য • ৬১ • এখানে তোমার মাটিদেশ • জয় গোস্বামী • ৬৫ • বিভূতি-সাহিত্য • সুনীল দাস • ৭৩ • সম্পাদকীয় • ৫ • চিঠিপত্র • ৭ • আশার ছলনে ভুলি • গোলাম মুরশিদ • ৭৮ • প্রথম আলো • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • ৮৭ • মৈত্রেয়-জাতক • বাণী বসু • ৯৩ • গ্রন্থলোক • ১১৫ • শিল্পসংস্কৃতি • ১০৪ • শেষের পাতা • ১৩০

প্রচ্ছদ • বিমল দাস

সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা। উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা।

DESH (USPS 07-887) is published fortnightly by ANANDA BAZAR PATRIKA LTD., 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA 700 001, INDIA. Our distributor in USA is HOUSE OF ANANDA, P.O. Box 1833, Madison Square Station New York/NY 10010/Second Class Postage paid at New York. N.Y. 10199/Post Master Please send address change to HOUSE OF ANANDA, P.O. BOX 1833, Madison Square Station/N.Y. 10010.

শতবর্ষে বিভূতিভূষণ : জীবন্ত উপস্থিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান বৎসরেই বিভূতিভূষণের জন্ম। শরৎচন্দ্র তখন আঠারো বৎসরের যুবক, সদ্য দু' একটি গল্প লিখতে শুরু করেছেন, আর তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গদ্য দুই-ই লিখছেন সমানভাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের অবসান হলো, এ কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে, কারণ বঙ্কিম নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যুগ। বাংলা উপন্যাসের তিনি স্রষ্টা, প্রথম থেকেই উচ্চ মানে তিনি তুলে দিয়েছেন সাহিত্যের এই নবীন শাখাটিকে, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কোনো ধারা সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। আঙ্গিকে, ভাষা ব্যবহারে ও চরিত্র বিশ্লেষণে বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্তী উপন্যাস বঙ্কিমী-রীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই হিসেবে একই বৎসরে বঙ্কিমের প্রয়াণ ও বিভূতিভূষণের জন্ম তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখালেখি শুরু করেছেন, তখন বাংলা সাহিত্যের গগন বহু তারকায় উদ্ভাসিত। দিনের মধ্য গগনে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, রাতে শরৎচন্দ্র। বলাই বাহুল্য, সাহিত্যে দিন আর রাতের কোনো তফাৎ থাকতে পারে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাম দুটিই যেন বিশেষ এক কালে নিজেদের প্রতিভার সঠিক পরিচয় দেয়। এ ছাড়াও নগরকেন্দ্রিক একদল সাহিত্যিক সাহিত্যের নতুন নতুন পথ অন্বেষণ করছেন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের অভিনবত্ব চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেই সময় সুদূর মফস্বলে বসেও সাহিত্য-সাধনা করা এবং প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি প্রমুখ এইভাবেই পরিচিত হয়েছেন। ভাগলপুর ছিল যেন বাংলা সাহিত্যের খনি. সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বনফুল এমন অনেকেই এসেছেন সেখান থেকে। এত সব জ্যোতিষ্কের মধ্যখানে নিজের স্থান করে নেওয়া নিশ্চিত ছিল খুবই কঠিন

বিভূতিভূষণ কলকাতার সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক-বিরহিত না হলেও গ্রামবাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগই ছিল বেশি। তাঁর সার্থকতার মূল রহস্যটি অতি সরল, তিনি কোনো প্রতিযোগিতার মধ্যেই যাননি। তারাশঙ্করের মতন ঘোর আঞ্চলিকতা কিংবা প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমারের মতন পশ্চিমী সাহিত্যের আঙ্গিক ঘেঁষা শহুরে জীবন, বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিকে গেলেন না বিভূতিভূষণ। তিনি গ্রামবাংলার জীবন নিয়েই লিখতে শুরু করলেন, কিন্তু তা বিশেষ কোনো আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা নেই, বস্তুত সে রকম কিছু কাহিনীই নেই বলতে গেলে, তিনি শুধু লিখতে লাগলেন সাধারণ মানুষের জীবনের কথা, যে-সব মানুষ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন নয়, প্রকৃতির মধ্যেই মিলেমিশে থাকে তাদের জীবনযাত্রা। বিভূতিভূষণ বাংলার সমস্ত কিশোরের একটি নাম দিয়েছেন, সেই নাম অপু। বিভূতিভূষণ যেই অপুর কাহিনী লিখলেন, তখনই পাঠক হিসেবে আমাদের উপলব্ধি হলো যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি অপু লুকিয়ে আছে।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন অনেক। গ্রামবাংলা ছেড়ে তিনি কখনো চলে গিয়েছেন অরণ্যে, আবার সপ্তম স্বর্গেও বিচরণ করেছেন। কিন্তু সব রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে দুটি বিস্ময় ভরা চোখ। তিনি লিখেছেন খাঁটি বাঙালি জীবনের কথা, সেই বাঙালি নিছক গ্রাম্য বা অনাধুনিক নয়, নিজের পরিবেশের সঙ্গে জড়িত কিন্তু বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন। সুখের সন্ধানে সে প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত নয়, তাঁর রচনায় হিংসার স্থান প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।

সেই লেখকেরই জন্ম সার্থক, মৃত্যু যাঁর সৃষ্টির ওপর বিস্মৃতির আবরণ টেনে দিতে পারে না। বাংলার পাঠক-সমাজ ক্রমশই তাকে বেশি প্রিয় হিসেবে বরণ করেছে, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার বাইরে, বহির্বিশ্বে। তাঁর মৃত্যুর পর চুয়াল্লিশ বছর কেটে গেছে, এখন এই জন্মশতবর্ষেও তিনি আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত।

সব রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে দুটি বিস্ময় ভরা চোখ। তিনি লিখেছেন খাঁটি বাঙালি জীবনের কথা, সেই বাঙালি নিছক গ্রাম্য বা অনাধুনিক নয়। নিজের পরিবেশের সঙ্গে জড়িত কিন্তু বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন।

“মুসলমান চিন্তকদের বড় একটা অংশ যে প্রয়োজনে সাহস করে ইজতিহাদ-ইজমার ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন না তার দোষ ইসলামের নয়। এর পিছনে সম্ভবত গোষ্ঠীচেতনা ও সংখ্যালঘু মানসিকতা ক্রিয়াশীল।”

ইসলাম প্রসঙ্গে...

গত ১৮ জুন ’৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত অম্লান দত্তের যুক্তিশীল ও দরদি রচনা ‘ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাচিন্তা’-র বক্তব্য ‘... মুসলিম সমাজকে চলতে হবে যুক্তি ও বিচারকে সজাগ রেখে, শান্তি ও শুভেচ্ছার সেই বাণী নিয়ে ইসলামের শব্দার্থ ও অন্তরাত্মার কাছে যা প্রিয়, আবারও যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথে।’-এরই সমর্থনে এই পত্রের অবতারণা।

ইসলাম যত দিন সৃজনশীল এবং সেই কারণে সবল ছিল, মূল বিশ্বাসকে অপরিবর্তিত রেখে নিজের যুগোপযোগী পরিবর্তন করেছে। ইসলামের শিক্ষাতেই ইজতিহাদ বা ব্যক্তির বিচার স্বাতন্ত্র্য এবং ইজমা বা গোষ্ঠীর সামান্য সম্মতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিধান আছে। অধ্যাপক মহম্মদ মুজীব তাঁর বিখ্যাত The Indian Muslims গ্রন্থের ৫৬-৭ পৃষ্ঠায় ও অন্যত্র এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তকলিদ বা বিনা প্রশ্ন বা চিন্তা-ভাবনায় পূর্বসূরীদের ধর্মীয় নির্দেশ মেনে নেবার ইসলামী প্রথার বিরুদ্ধে ইজতিহাদ অনুসারী নব ভাষ্যকারেরা যে বারবার বিদ্রোহ করেছেন, তার প্রমাণ ইসলামের প্রাণশক্তিতে উচ্ছল পর্বে প্রচুর। ইজতিহাদ বিসর্জন দিয়ে তকলিদের কাছে নতিস্বীকার ইসলামের অন্ধকার যুগের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ বলা অত্যুক্তি হবে না।

ইসলামে যুগোপযোগী ভাবধারার আত্তীকরণের বহু উদাহরণের মধ্যে দুই-একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মোতাজেলাদের (আব্বাসিদ খলিফারা এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) যুক্তিবাদ ও সুফীদের (ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বড় একটা অংশই সুফী অনুগামী) প্রচলিত ইসলামী প্রথাবিরোধী অন্তর্জ্যোতির্বাদ এর মধ্যে অন্যতম। এ যুগে আমাদের বঙ্গদেশেও ঢাকার ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ ও তার মুখপত্র ‘শিখা’ পত্রিকার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রত্যুত, মুসলমানদের চিন্তার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ইজতিহাদ-ইজমা ও তকলিদের বারবার সংঘর্ষের বহু উদাহরণ পেশ করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ (হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ; বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নিজাম বক্তৃতা) শাস্ত্রানুগত্যপন্থী ও বিচারপন্থীদের মধ্যে সংঘাতের নামে।

মুসলমান চিন্তকদের বড় একটা অংশ যে প্রয়োজনে সাহস করে ইজতিহাদ-ইজমার সহায়তায় ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন না তার দোষ ইসলামের নয়। এর পিছনে সম্ভবত গোষ্ঠীচেতনা ও সংখ্যালঘু মানসিকতা ক্রিয়াশীল— যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যের বদলে গোষ্ঠীসংহতি বজায় রাখাই ইসলামী অস্মিতার অধিকতর সহায়ক বলে বিবেচনা করে।

দুটো উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। ইসলামী উম্মা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব যে একটি অলীক কল্পনা তা হজরত আলির উত্তরাধিকারের দাবি ও কারবালার যুদ্ধের যুগ থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে। সেকালের মতো একালেও আরব-ইরান-তুর্কি মুলুকে মুসলমানে-মুসলমানে লড়াইয়ের অসংখ্য উদাহরণ আছে। আশির দশকে ইরাক-ইরানের যুদ্ধ শিয়া-সুন্নী বিবাদের সম্প্রসারণ বলে বাদ দেবার চেষ্টা করলেও কুয়েতকে নিয়ে ওই অঞ্চলে সম্প্রতি যে ছোটখাটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল তাতে সুন্নী ব্যাপকভাবে সুন্নীর রক্তপাত করেছে। আমাদের ঘরের কাছে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হল এবং ওই প্রক্রিয়ায় সুন্নী কর্তৃক সুন্নীর প্রাণহরণই নয়, অসহায় নারীর ধর্মনাশের বহু ঘটনাও ঘটেছে। তবু উম্মা ও তার সঙ্গে জড়িত প্যান ইসলামের মানসিকতা বিসর্জন দিতে এক শ্রেণীর মুসলমানের কুণ্ঠা। অনুরূপভাবে দার উল হারব, দার উল ইসলাম, জিহাদ বা হিজরত প্রভৃতি ধারণা এখনও আঁকড়ে থাকা ইজতিহাদে সহায়তা নেবার সাহসের অভাবের দ্যোতক। এটা যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবিরোধীও বটে।

ঘরের ভিতরের উদাহরণ মুসলমান নারীদের সমান অধিকার দেবার জন্য ভারতে একই ব্যক্তিগত আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে। গণতান্ত্রিক ভারতের জনপ্রতিনিধিরা এটা করুন— এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের নেতা নামে পরিচয়দানকারী ব্যক্তিদের আপত্তির একটা বড় কারণ হল এই যে, ইসলামী আইনে পরিবর্তনের কোনও অধিকার অমুসলমানদের (দার উল হারব মানসিকতা ?) —এমন কি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিদেরও নেই। কিন্তু ভারতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নামে যা খ্যাত, তা কোনও দার উল ইসলামের কৃতি নয়। ইংরেজ প্রশাসক লর্ড মেকলের নির্দেশে কয়েকজন মৌলভি এটা করেন। ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের নির্দেশে একাধিকবার এর যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিমার্জন হয়েছে। আবার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে Age of Consent Act পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকার সম্বন্ধে একই আইন ছিল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে তদানীন্তন মুসলমান নেতারা স্বসম্প্রদায়কে হিন্দুদের থেকে সর্ব বিষয়ে পৃথক দেখাবার চেষ্টায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে থাকেন। তাই ত্রিশের দশকে কেবল মুসলিম নারীদের অধিকার বিধিবদ্ধ করার জন্য পৃথক শরীয়া আইন হয়। কিন্তু যুগোপযোগী পরিবর্তনের ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সেই দুই আইনও ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের অঙ্গ কেন্দ্রীয় পরিষদের (উলেমা সমাজ কর্তৃক নয়) সদস্যরা রচনা করে এর বর্তমান রূপ দেন। সুতরাং আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধের দাবিতে ভারতের সংসদ নারীদের সমান অধিকারের জন্য একই ধরনের ব্যক্তিগত আইন রচনা করতে পারবে না কেন ? আর কেনই-বা গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ দেশের আদালত তার ব্যাখ্যা করতে পারবে না ? কোনও ভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীও এ কথা বলছে বলে কি তা অযৌক্তিক ? এ মানসিকতা ইজতিহাদ- ইজমার বদলে তকলিদ আঁকড়ে থাকার তুল্য।

প্রত্যুত, অনেক ইসলামী পণ্ডিতের (রফিক জ্যাকেরিয়ার Victims of Prejudice প্রবন্ধ ; Seminar, এপ্রিল ১৯৯৪ দ্রষ্টব্য) মতে 'মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন একটা স্থায়ী প্রক্রিয়া। কখনও এর বিরতি ঘটেনি, যদিও সময়ে সময়ে এর গতি মন্থর হয়েছে। ... এমন কি শরীয়ার রূপও কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং এক শতাব্দী পূর্বে এর যা রূপ ছিল আজ তা আর নেই। সৌদি আরব কট্টরপন্থার দুর্গ। কিন্তু সেখানেও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে এতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহু মুসলিম দেশে এতে দূরগামী পরিবর্তন করা হয়েছে। সব দেশে সব ধর্মের গোঁড়ারা যেমন করেন, এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হইচই করলেও তাঁরা এইসব পরিবর্তনকে আটকাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। বহু দেশে নূতন ফৌজদারী দণ্ডবিধি রচনা করে পুরাতন আইনকে বাতিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত আইনেরও বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। ... ইসলামে বিশ্বাসীরা এসব শান্ত চিত্তে মেনে নিয়েছেন। অম্লানবাবুর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তক যে বক্তব্যের সূত্রপাত করলেন, বাঙালি মুসলমানদের ভিতর তা ইসলামের অমূল্য বিধান ইজতিহাদ-ইজমার শরণ নিতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করুক এবং পশ্চিমবঙ্গে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মতো কোনও আন্দোলন গড়ে উঠুক— যা ভারতের ইসলামকে তার শুদ্ধ স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সর্বমানবের সর্বাঙ্গীণ ধর্মকে যুগের প্রয়োজনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে প্রেরিত করুক।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারকনিধি,
রাজঘাট, নূতন দিল্লি-১১০০০২

গত ১৮ জুন ১৯৯৪-এর 'দেশ' পত্রিকার 'ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাচিন্তা' লেখাটির জন্য অম্লান দত্তকে ধন্যবাদ। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা লক্ষ করা যায়। তাদের অজ্ঞতা কাটাতে অম্লানবাবুর লেখা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

কতগুলি যুগান্তরকারী ঐস্লামিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে অম্লান দত্ত আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, মোহাম্মদের সব বাণী মুসলিম সমাজজীবনে সমানভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ ইসলাম ধর্মের দুটি বিধির উপর আলোকপাত করছি। মদ্যপান ও শূকর-মাংস ভক্ষণ ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শূকর-মাংস ভক্ষণ করে এমন মুসলিম খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু, সুরাপানাসক্ত মুসলিমের সন্ধান সহজে পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মমতে নামাজ পড়া আবশ্যিক কর্তব্য। নামাজ পড়েন না— এরকম মুসলিমের সংখ্যাই বেশি। কোনও মুসলিম আলেম (পণ্ডিত) হয়তো বলবেন যে, যে মদ্যপান করে, নামাজ পড়ে না, সে মুসলিম নয়। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই। আমাদের প্রশ্ন— যে নামাজ পড়ে না অথচ কোরান শরিফকে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ বলে মানে, সে মুসলিম নয় তো কি ? মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান ইত্যাদি টার্মগুলোর সমাজে প্রচলিত অর্থেই আমরা বিবেচনা করব। কোনও ধর্মশ্রয়ী পণ্ডিতের কুটিল ব্যাখ্যার আবর্তে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নই। বর্তমান যুগে আমরা 'শহীদের রক্ত'কে পবিত্র বলে জানি। সে যুগে মোহাম্মদ বলেছিলেন : 'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র'। মুসলিমদের উপর মোহাম্মদের এই বাণীর প্রভাব এখন ক্ষীণ। দায়ী ইসলাম নয়,

শারদীয়ার উপহার

বিগত একশ বছরের বাংলাসাহিত্যের ৫৮ জন বিখ্যাত লেখক-লেখিকার বাছাইকরা ৫৮টি ছোটগল্পের এক অভিনব মনোজ্ঞ সংকলন শারদীয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে

সম্পাদনা : সমরেশ মজুমদার

একশ বছরের সেরা গল্প ৮০৲

॥ উপহারোপযোগী সংকলন ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❑ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ রাজশেখর বসু ❑ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ জগদীশ গুপ্ত ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ❑ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ অন্নদাশঙ্কর রায় ❑ বনফুল ❑ মনোজ বসু ❑ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ❑ প্রমথনাথ বিশী ❑ প্রেমেন্দ্র মিত্র ❑ সৈয়দ মুজতবা আলী ❑ শিবরাম চক্রবর্তী ❑ বুদ্ধদেব বসু ❑ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ❑ প্রবোধকুমার সান্যাল ❑ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ চারুচন্দ্র সেন ❑ সুবোধ ঘোষ ❑ জরাসন্ধ ❑ লীলা মজুমদার ❑ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ❑ আশাপূর্ণা দেবী ❑ সুমথনাথ ঘোষ ❑ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ❑ বিমল মিত্র ❑ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ❑ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ❑ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ❑ সন্তোষকুমার ঘোষ ❑ সমরেশ বসু ❑ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ❑ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ❑ দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ নবেন্দু ঘোষ ❑ বিমল কর ❑ রমাপদ চৌধুরী ❑ মহাশ্বেতা দেবী ❑ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ❑ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ দেবেশ রায় ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ❑ বুদ্ধদেব গুহ ❑ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ❑ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ❑ সমরেশ মজুমদার ❑ দিব্যেন্দু পালিত ❑ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ❑ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ❑ মতি নন্দী ❑ কমলকুমার মজুমদার ❑ প্রফুল্ল রায়।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

দায়ী বর্তমান যুগের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (ভারতের বেলা তো বটেই)। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্পর্কে কোরান-শরিফের বিধানের পিছনে সামাজিক কারণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন অম্লানবাবু। ব্যাখ্যাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। মোহাম্মদের অনুগামী অনেক যুবক উহুদের যুদ্ধে নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বিধবা ও অনাথদের ভরণপোষণের সামাজিক সমস্যা সমাধানের সহজ পন্থানুসারে মুসলিম পুরুষের বহুবিবাহ অনুমোদন করা হয় কোরানের নির্দেশে। উল্লেখ্য, অনুমোদন ঢালাও নয়, একজন পুরুষ সর্বাধিক চারটি বিবাহ করার অনুমতি পায়। আমরা প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি। সে সময়ে বহুবিবাহ সমাজে শুধু যে প্রচলিত ছিল তা নয়, একজন যতবার খুশি বিয়ে করত। খুশি-সংখ্যক বিয়ে করার প্রথা সেকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চালু ছিল। আমাদের দেশে কৌলীন্য-প্রথা বহুসংখ্যক বিয়ের নিদর্শন। উহুদের যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বিধবা ও অনাথদের ভরণপোষণের সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালে প্রচলিত অসীমিত সংখ্যক বহুবিবাহ প্রথা বেশি কার্যকরী হতে পারত। স্বভাবতই এ প্রশ্নটি জাগে যে, সীমিত সংখ্যক (অর্থাৎ চারটি) বহুবিবাহের নির্দেশ কেন দেওয়া হল? ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবা যেতে পারে। মোহাম্মদ চেয়েছিলেন ইসলামকে মানবিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা করতে। তাই এটা সহজে অনুমান করা যায় যে, অমানবিক বহুবিবাহ প্রথা মোহাম্মদের অনভিপ্রেত ছিল এবং তাঁর অনুগামীরা যেন একাধিক বিয়ে না করে সে ব্যাপারে তিনি প্রভাব খাটাতেন। উহুদের যুদ্ধে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার সপক্ষে জোরালো যুক্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং বহুবিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজেও চালু রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অনন্যোপায় মোহাম্মদ আল্লার নির্দেশে (যুক্তিবাদীরা মোহাম্মদের আত্মোপলব্ধি মনে করতে পারেন) অসীমিত সংখ্যক বহুবিবাহের পরিবর্তে সীমিত সংখ্যক বিয়ের নির্দেশ দেন এবং এই মানবিক শর্ত আরোপ করেন যে, বিবাহিত প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান মর্যাদা দিতে হবে; তা না পারলে ধর্মবিরোধী আচরণ হবে। দূরদর্শী হজরত মোহাম্মদ বুঝেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে নারীরা যখন আত্মসম্মান ফিরে পাবে তখন সতীনদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রাধান্য পাবে এবং কোনও পুরুষের পক্ষে তাদেরকে সমান মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে না এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ধর্মরক্ষার্থে একটি মাত্র বিয়ে করতে বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে যে সব মুসলিম একাধিক বিয়ে করে তারা তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের সমান মর্যাদা দিতে পারে না এবং তারা অবশ্যই আল্লার অপ্রিয়। বর্তমান যুগে বহুবিবাহ ইসলামের মূল নীতিকে লঙ্ঘন করেই ঘটে। ধর্মের বাণী এ ক্ষেত্রে অচল। অবশ্য সুবিবেচক মুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষই একাধিক বিয়ে করে না। একাধিক বিয়ে করে দুর্বৃত্তেরা— ধর্মের বাণী বা আইন দিয়ে তাদের ঠেকানো যায়নি। এতক্ষণ আমরা দেখেছি ইসলাম ধর্মমতের কোন্ বাণীর প্রভাব মুসলিম সমাজে প্রবল, আবার কোন্ বাণীর প্রভাব ক্ষীণ। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ চলে মূলত মানবধর্ম মতে। কোনও গোষ্ঠী বা সমাজ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতকে হুবহু অনুসরণ করতে পারে না। বর্তমান যুগে মানুষকে সঠিকভাবে চলতে হলে যুক্তিনির্ভর হতে হবে। আবার যুক্তি দিয়ে আল্লা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না। তাই যে-কোন ধর্মমত যুক্তিকে ভয় পায়। তাই 'ইসলাম আজ যুক্তিকে ভয় পায়', 'ইসলামকে সহিষ্ণু হতে হবে' ইত্যাদি জাতীয় অম্লানবাবুর মন্তব্য যুক্তির খাতিরে মূল্যহীন। অতীত কালে মানবসভ্যতাকে গতিশীল রেখেছিল বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলি। আমাদের আবেগপূর্ণ হৃদয় সেসব ধর্মীয় মতবাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও লালন করে। ধর্মমতকে লালনের ক্ষেত্রে আবেগই আমাদের প্রধান সহায়; তাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদও বিদ্যমান। আমরা এক ধর্মের তুলনায় অপর ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রসঙ্গে বিতর্ক তুলি। এবং তা করতে গিয়ে আমরা যুক্তিবাদী মানুষরা সাময়িকভাবে একেবারে যুক্তিহীন কলহের সৃষ্টি করি। বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীগত মানুষ পরস্পর সম্পর্কে কিছু সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করি। এর কুফল অবশ্য বেশিটাই ভোগ করতে হয় সংখ্যালঘুদের। (অর্থাৎ বাংলাদেশে হিন্দুদের এবং ভারতে মুসলিমদের ক্ষতি বেশি।) ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজকে পরস্পরের ধর্মমতের প্রগতিশীল অংশকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে হবে এবং পরস্পর সম্পর্কে অযৌক্তিক সংকীর্ণ ধারণাগুলিকে (যেমন হিন্দুরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বা মুসলিমরা প্রতিক্রিয়াশীল বা অসহিষ্ণু ইত্যাদি) ত্যাগ করতে হবে।

আবু মীর হাসান
হায়দারপুর, মালদা-৭৩২১০১

সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি দেশে মৌলবাদীদের যে প্রকাশ্য অসহিষ্ণুতা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অম্লান দত্ত মহাশয়ের 'ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাচিন্তা' ('দেশ'— ১৮ জুন '৯৪) প্রবন্ধটি খুবই সময়োচিত হয়েছে মনে করি। হজরত মোহাম্মদের যেসব নির্দেশ উক্ত হয়েছিল দেড় হাজার বছর আগে, তাকে কালোপযোগী করার প্রয়োজন আছে বোধ করে শ্রীদত্ত সেগুলি পুনর্মূল্যায়নের সম্ভাব্যতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনকে আলোড়িত করেছে। তাই এই চিঠির অবতারণা। আমার প্রশ্ন— ধর্মগ্রন্থের বিশেষ কোনও অনুশাসনের পরিবর্তন করলেই কী মৌলবাদী উগ্রতা হ্রাস পাবে? কোরান ইসলাম ধর্মের আকর গ্রন্থ এবং বলা হয়েছে হজরত মোহাম্মদ ঈশ্বরের শেষ নবী (অর্থাৎ কোরান শেষ গ্রন্থ)। কোরানে স্পষ্ট নির্দেশ আছে ধর্মে কোনও জবরদস্তি চলবে না। আবার তারই পাশে দেখা যাচ্ছে 'জেহাদ'-ও কোরান-উপদিষ্ট। এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যের সুরটি মুসলমান সাধারণের পক্ষে হারিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়— এ কথা মনে রাখতে হবে। অপরপক্ষে, হিন্দুর প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' হলেও ধর্মের উত্তরণ ঘটেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। ঋগ্বেদের সৃষ্টিকালের (আনু. ৪৫০০ খ্রিস্ট পূর্ব) পর থেকে একাধিক বেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, মীমাংসাগ্রন্থ, উপনিষদ, সূত্রগ্রন্থ, সাংখ্য ও ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব অতিক্রম করে মহাভারত ও গীতার রচনাকাল পর্যন্ত (৯০০ খ্রিস্ট পূর্ব) সেই উত্তরণের সময়কাল প্রসারিত। এই ধর্মশাস্ত্র সমুদয় হিন্দুর ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের মুখ্য নিয়ামক এবং তা অসংখ্য সংহিতাকার ও টীকাকারদের দাক্ষিণ্যে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে থেকেছে। সেই যুক্তিতে বলা যায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের পরিবর্তনশীল অনুশাসনগুলির কালোপযোগী হওয়ার সম্ভাব্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তা ছাড়া হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও প্রসারকালে কোনও উল্লেখ্য প্রতিহর্তা ধর্ম ছিল না বলে সংঘাতের বা সহনশীলতার কোনও সজ্ঞান নির্দেশ হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে স্থান পায়নি। হিন্দু ধর্মে সহনশীলতা প্রাধান্য পেয়েছে অন্য কারণে, অপ্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যেও কী মৌলবাদী উগ্রতার কিছু অভাব আছে? এটা অনস্বীকার্য যে, কিছু স্বার্থান্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী মৌলবাদীদের হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে, মদত দেয়। তা জেনেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতাসীন দল অপরাধী গোষ্ঠীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা থেকে বিরত থাকেন। এই সমস্যার বিকল্প সমাধান হিসেবে যদি আমরা কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অবাঞ্ছিত অনুশাসনের

পরিবর্তন করে মৌলবাদীদের মধ্যে সুমতি আনার চেষ্টা করি, তবে সে চেষ্টায় সফলতা লাভের সম্ভাবনা কতটা তা বলা শক্ত। কোরান, বেদ কিংবা বাইবেল কোনও দেশের সংবিধান তো নয় যে, সহসা পরিবর্তন সাধন করা যাবে। যে-কোনও ধর্মশাস্ত্রের অবাঞ্ছিত অনুশাসন অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, শাস্ত্রীয় বিধান মানুষের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে ; তাকে উৎখাত করতে গেলে অনেক অমৌলবাদীও মৌলবাদীর পাশে দাঁড়িয়ে বাধা দেবেন। ইসলামধর্মী মানুষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন। কোনও বিশেষ একটি বা কয়েকটি মাত্র দেশের আগ্রহে ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। বিশ্ব জাতিপুঞ্জের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভবপর বলে মনে হয় তা হল মানবীয় অধিকার ভঙ্গের বিষয়ে একটা সুদৃঢ় ন্যায়নীতি রচনা করা এবং লঙ্ঘনে যথাযথ শাস্তি প্রয়োগের কঠোর ব্যবস্থা করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবিতে ধর্মগ্রন্থের সংস্কারের যদি প্রয়োজন হয়, তবে সেই সংস্কার মক্কা-মদিনার বা অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর অনুমোদন বা সক্রিয় প্রচেষ্টা ভিন্ন কি কোনও দিন সম্ভব হবে ? কোরানে যে 'শেষ নবী'র উল্লেখ আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে একটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় ও শেষ বক্তব্যটি হিন্দু সমাজের 'অস্পৃশ্যতা' সংক্রান্ত। যদিও এই বিষয়টি প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে গৌণভাবে, তবুও বর্তমান পরিস্থিতি মনে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু বলতে চাই। ইসলামের সামাজিক সাম্যের যে নির্দেশ মোহাম্মদ দিয়েছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে (হিন্দুদের লক্ষ্য করে) অম্লানবাবু বলেছেন— " এ দেশে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে 'অস্পৃশ্যতা' পাশাপাশি চলে।" এই বক্তব্যের স্থূল ইঙ্গিত হল যে, মুসলমানরা শাস্ত্রোক্ত সাম্যনীতি যথাযথভাবে পালন করছেন কিন্তু হিন্দুরা শাস্ত্রের মহান আদর্শ উপেক্ষা করে বিস্ময়করভাবে তার বিপরীত আচরণ করছেন। বক্তব্যটিকে খতিয়ে দেখতে হলে আমাদের জানতে হবে কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হল এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে 'অস্পৃশ্যতা'র স্থান কোথায় ? প্রথম বিচারেই দেখি, ইসলামের সামাজিক সাম্যনীতির উৎস কোরান ; কিন্তু হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা যে ধর্মবিগর্হিত আচরণ তা বেদ বা বেদান্তে বলা হয়নি, বলার কারণও ছিল না। দ্বিতীয়ত, 'অস্পৃশ্যতা' সাধারণভাবে হিন্দু সমাজের 'অভিশাপ' হলেও তা অদ্বৈতবাদীদের কখনওই সজ্ঞান অনুমোদন পায়নি। তৃতীয়ত, অদ্বৈতবাদীরা হিন্দু সমাজের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মাত্র। এই ত্রয়ী বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করা যায় না। বোধ হয় একটু ব্যাখ্যাত হওয়া দরকার। জীব, জগৎ, ব্রহ্ম— এই তিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে সুদীর্ঘদিন বেদার্থচিন্তন হয়েছে, আর তার পরিণামে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, পরিণামবাদ ইত্যাদি বহুবিধ দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রচলন হয়েছে। অদ্বৈতবাদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (অর্থাৎ মোহাম্মদের পরবর্তী কালে)। অস্পৃশ্যতাকে জাতিভেদ প্রথার এক অবাঞ্ছিত উগ্র পরিণাম বলে যদি চিহ্নিত করা যায়, তবে বোধ হয় নিতান্ত ভুল হবে না। সেই জাতিভেদের অস্তিত্ব যে বৈদিক যুগে ছিল না, তার নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদে আর ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ইত্যাদি উপনিষদে। ম্যাক্সমুলারও ওই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। জাতিভেদ প্রথা প্রথম নৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল সম্ভবত 'মনুসংহিতা'য়। গীতায় শ্রীভগবানের কথাটাও স্মরণ করা যেতে পারে—যেখানে তিনি বলছেন, গুণ ও কর্ম অনুসারে 'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং'। গুণ ও কর্ম অনুযায়ী যদি চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে 'অস্পৃশ্যতা' তো দূরের কথা, জাতিভেদ প্রথারও বংশগত কোনও রূপ বা পারম্পর্য প্রাচীন কালে ধর্মীয় স্বীকৃতি পেয়েছিল বলা চলে না। পরিশেষে বলি, হিন্দু ধর্মে বারবার মানুষের সাম্যের কথা বলা হলেও তা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। 'আত্মজ্ঞান', 'সোঽহং', 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করা জনসাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের, বিশেষত বেদ ও উপনিষদের অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাষ্যের ফলে হিন্দুর কাছে শাস্ত্রোক্তির আবশ্যিক মান্যতা বহুলাংশে শিথিল হয়ে দেখা দিয়েছে ইসলাম ধর্মের তুলনায়। ভারতের প্রধান ধর্মে অতি প্রাচীন কালেই বলা হয়েছে— 'ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ' এবং সেই উপদেশ বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে। কিন্তু সেই দেশেই তো দেখছি মানুষ পরকে আঘাত দিয়েই আনন্দ পাচ্ছে।

সুজিতকুমার বিশ্বাস
সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

গত ১৮ জুন ১৯৯৪ সংখ্যায় অম্লান দত্তের 'ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাচিন্তা' প্রবন্ধটি সম্পর্কে এই পত্র। শ্রীদত্তের মতো মনীষী চিন্তকও প্রবন্ধটি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে লিখেছেন, কারণ, তিনি মুসলমান নন। কুণ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, ধর্ম চিরদিনই একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কোনও ধর্মের সংস্কারে অন্য ধর্মের ব্যক্তি উদ্যোগ নিলে তা জটিলতার সৃষ্টি করে। সৈয়দ আমীর আলী যদি হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর প্রথাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন তা কোনওদিনই ফলপ্রসূ হত না। জেফারসন খ্রিস্টান ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে খ্রিস্ট ধর্মের সর্বোত্তম অংশগুলির নির্বাচন ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর বর্জন সম্ভব হয়েছিল। ঠিক একই কারণে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দরা হিন্দু ধর্মের সংস্কারে সাফল্য লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এ-হেন বঙ্কিমচন্দ্রও লিখে গেছেন, 'গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত নহে। অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মতো স্মরণে রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সকলই যে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।' বিবেকানন্দ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও বলতে পারেন, 'আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে ? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক লিপিকুশল ব্যক্তি (shorthand writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন।' (গীতাতত্ত্ব—তৃতীয় প্রশ্ন—বিবেকানন্দ রচনাবলি) উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, মুসলমানের নিকট যেমন কোরআন শরীফ, হিন্দুর কাছে গীতাও সেইরূপ।

তবুও হিন্দু সন্ন্যাসী বা হিন্দু হওয়ার গর্বে গর্বিত বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি ভগবদ্ বাক্য কি না তা সন্দেহ করতে কুণ্ঠা হয়নি। কারণ, তাঁরা যুক্তিবাদী ছিলেন। শাস্ত্রকে তাঁরা যুক্তির আলোকে বিচার করেছিলেন। তাতে হিন্দু ধর্মের কিছু ক্ষতি হয়নি, বরং তা গ্লানিমুক্ত হয়ে উঠেছে অনেক পরিমাণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামি জগতে কোরআন শরীফের আয়াৎগুলিকে যুক্তির আলোকে দেখার কাজটা এখনও শুরুই হল না।

সার কথা এই—জেফারসন, রামমোহন,

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দরা তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের শাস্ত্রবচনকে যুক্তির আলোকে বিচার করার সাহস দেখিয়েছেন—যা মুসলিম সমাজের পণ্ডিতগণ কোরআন শরীফের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত করেননি।

ফলে শুরু হয়েছে এদের পশ্চাদ্গামিতা—যা খুবই বেদনাদায়ক। ধর্মীয় খ্রিস্টানোন্মাদনা ও ধর্মোন্মত্ততার মধ্যেও গ্যালিলেও, কেপলার আবির্ভূত হয়েছেন ; আর ইসলাম দিয়েছে কিছু পীর, সুফী ও দরবেশ। সুতরাং জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই বিরাট ইসলামি জগতের অবদান প্রায় শূন্য, এবং এটার শুরু দ্বাদশ শতক থেকে—যা এখনও বহমান।

শ্রীদত্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামি জগৎ যদি এইভাবে চলে তবে "হারাতে হবে সেই জাগতিক উন্নতির সম্ভাবনাও"। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলেছেন নোবেল-বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম। পাকিস্তানের নাগরিক এই বিজ্ঞানী ধার্মিকও বটেন। তিনি ইসলামি জগতের এই জ্ঞান, বিশেষত বিজ্ঞান-বিমুখতার ফলস্বরূপ ইসলামি জগৎ যে কিভাবে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে যাচ্ছে তা অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন লেখায় লিখেছেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাইস তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যে দেশের G.N.P. যত বেশি সেই দেশের বৈজ্ঞানিক তৎপরতাও সমানুপাতিক। কিন্তু সালাম বলছেন যে, ইসলামি বিশ্বের ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়। মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে বিশ্বের মোট সংখ্যার $\frac{১}{৫}$ অংশ। আয়ের দিকে বিচার করলে $\frac{১}{১৫}$ অংশের মালিক তারা। প্রাইসের সূত্র অনুযায়ী অতএব বিশ্বের ১৫টি গবেষণাপত্রের একটি ইসলামি বিশ্বে লেখা উচিত। তেমনি ১৫ জন সক্রিয় বিজ্ঞানীর একজন মুসলমান হওয়া উচিত। প্রকৃত অবস্থা এর কাছাকাছিও নয়। ১-১৫ না হয়ে ১-২০ হলেও সালাম খুশি হতেন। যেসব দেশে বিজ্ঞানচর্চাকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে সেখানে জাগতিক উন্নতির আশা করাই মূর্খামি। (সূত্র, 'জিজ্ঞাসা', বাংলাদেশ সংখ্যা—চতুর্থ সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ-এর শহিদুর ইসলাম-এর 'শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম' প্রবন্ধ।) আবদুস সালাম এই সব লিখেছেন আশির দশকের মধ্যভাগে। আজ প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত। তাঁর দুশ্চিন্তার কোনও প্রভাব ইসলামি দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে না। অথচ সালাম অবশ্যই একজন পণ্ডিত, ধার্মিক ও বিশ্বাসী মুসলমান।

অধ্যাপক দত্তের হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু সমাধান তাঁর হাতে নেই।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়
বোরহাট, বর্ধমান

বামপন্থীরাই এখন...

'বামপন্থীরাই এখন প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী' (দেশ, ২১মে) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে সবিনয়ে কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

সম্পাদকীয়র এক জায়গায় কানোরিয়ার সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, '...এই শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন নামে এক অরাজনৈতিক ইউনিয়ন গড়েছেন।' 'অরাজনৈতিক ইউনিয়ন' বলতে সম্পাদক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। তবে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের দুই বহিরাগত নেতা, যাঁরাই প্রকৃতপক্ষে কিছু বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে কানোরিয়ার আন্দোলন চালাচ্ছেন, MLOC নামক মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলের নেতা সংগঠক। বিশ্বের তাবৎ ঘটনার মধ্যে যেখানে রাজনীতি রয়েছে, সেখানে একটি বন্ধ কারখানা খোলার আন্দোলন 'অরাজনৈতিক' হওয়া তো সোনার পাথরবাটি নির্মাণের তুলনায়ও অসম্ভব।

এ কথা ঠিক যে, কানোরিয়ার আন্দোলন নতুন পথনির্দেশ ঘটিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে বীতশ্রদ্ধ এবং এর একঘেয়েমি ও দ্বিচারিতায় ক্লান্ত, যখন তারা কোনও ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রায় ভুলতে বসেছিল, তখন কানোরিয়ার আন্দোলন প্রসঙ্গে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। যাকে সহজবোধ্য ভাষায় বলা যায়, রিঅ্যাক্ট করেছে। বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবী সহ ব্যাপক মানুষ শামিল হয়েছিলেন কানোরিয়ার সমর্থনে। কানোরিয়া বলতে গেলে প্রায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কেন এই জোয়ারকে রাখা গেল না? কেন 'কৌশলগত' কারণে কানোরিয়ার বহিরাগত নেতৃত্ব বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন? কেন ২৮ ফেব্রুয়ারির রেল রোকোতে শামিল চল্লিশ হাজার, ১১মের রেল রোকোতে চল্লিশের নিচে নেমে গেল? কেন 'বর্বর পুলিশি

সহজ আর গভীর, সমসময়ের আর চিরকালীন চারটি নাটকের সংকলন
কবির মৃত্যু ৩০.
রত্নাংশু বর্গী
এতে আছে ১টি পূর্ণাঙ্গ—'ধর্ম' আর ৩টি একাংক—'যুদ্ধের দিন', 'পয়লা মে' ও 'কবির মৃত্যু'
বুকমার্ক ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

Read **BARIN DE'S**
Omnipotent Rs 120/-
The Passage to Heaven
and
Jesus Came To Me Rs 40/-
The mystical writing from the world of spirits
Published by: SRI AUROBINDO UNIVERSAL
172 A Sarat Bose Road, Calcutta-700029, India

বারীণ দে'র **আমি বুর্জোয়া** ২৫.
মোনালিসা পাবলিশার্স
১৭২-এ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-৭০০০২৯
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস

আবদুল আযীয আল-আমানের অবিস্মরণীয় কিছু গ্রন্থ
বেহেশতের পাখীরা অখণ্ড
চার খলিফার বিচিত্র জীবনকথা ৪০ আলোর রাসূল আল-আমীন ১৫
ছোটদের মহানবী ১৫ শিশুদের নবী ১০ কাবার পথে ২ খণ্ড ১৫০
আলোর আবাবিল ১৫ মানুষের নবী ১৫ হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ॥ কলকাতা-৭০০০০৭

অত্যাচার'-এর পর অনশনকারীরা 'অত্যাচারী' সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে আসছেন ?

বস্তুতপক্ষে কানোরিয়ার নেতারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। যতই পুলিশি 'অত্যাচার' আর 'নিপীড়নের' কথা বলা হোক না কেন, কানোরিয়ার নেতারা যেন তেন প্রকারেণ কারখানা খোলার জন্য উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। অথচ এ ছাড়াও অন্য পথ ছিল। যে পথের আলো হত সুদূরপ্রসারী। কানোরিয়ার বন্ধ কারখানা খোলার আন্দোলন অন্য অনেক বন্ধ কারখানা খোলার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত না হলেও অন্তত পশ্চিম বাংলার সেই সময়ে বন্ধ হয়ে থাকা দশটি চটকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত। পশ্চিম বাংলার সাতান্নটি চটকলের মধ্যে বজবজ, অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান, ওয়েভারলি, মেঘনা, ভিক্টোরিয়া, হেসটিংস, কেলভিন, অ্যাঙ্গাস, বরানগর এবং কানোরিয়া— এই দশটি পাটকল বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে পশ্চিম বাংলার এক লক্ষ সত্তর হাজার পাটকল-শ্রমিকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছত্রিশ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত। এর মধ্যে কানোরিয়ার শ্রমিক সংখ্যা আড়াই হাজার। এই আড়াই হাজার শ্রমিকের উত্তুঙ্গ আন্দোলনকে যদি ছত্রিশ হাজারের স্রোতে শামিল করা যেত ? কিংবা ছত্রিশ হাজারকে আড়াই হাজারে ? খোলামেলা আলোচনা করলে এ কথা মানতে হবে যে, কানোরিয়ার থেকেও অসভ্য পাটকল মালিক অনেক রয়েছে। যেমন পাটকল চুক্তি অমান্য করে যে ছয়জন মালিক মজুরি কম দেয় তার মধ্যে কানোরিয়া একজন হলেও অন্যতম নয়। যেমন কানোরিয়া প্রতিদিন যেখানে ১১ টাকা করে মজুরি কেটে নেয়, সেখানে প্রেমচাঁদ জুট মিলে কাটে মাসে ন' শ' টাকা, তিরুপতি জুট মিলে মাসে আট শ' টাকা, হনুমান জুট মিলে তিন শ' পঁচাত্তর টাকা। অথচ এইসব কারখানায় আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধেনি প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিচারিতার কারণে। পি এফ-এর টাকা যে তিরিশ জন বাকি রেখেছে সেই তালিকায়ও কানোরিয়া শীর্ষে তো নয়ই, বরং বেশ নিচুতে। কানোরিয়ায় বাকি সত্তর লক্ষ টাকা, আর সেখানে অ্যাঙ্গাসের বাকি সাড়ে সাত কোটি টাকা। মেঘনার বকেয়া পৌনে ছ' কোটি, বরানগরের পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ, কাঁকিনাড়ার বাকি সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। কানোরিয়ার তুলনায় পি এফ-এর টাকা কম বাকি রেখেছে শ্রীহনুমান (চোদ্দ লক্ষ), ডালহাউসী (ষোল লক্ষ), ক্যালকাটা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ, নস্কর পাড়া (উনচল্লিশ লক্ষ), ফোর্ট উইলিয়াম (একত্রিশ লক্ষ), প্রবর্তক (উনিশ লক্ষ), অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান (তিরিশ লক্ষ), আলেকজান্দ্রা (সতেরো লক্ষ), কিনিসন (দশ লক্ষ) এবং ইউনিয়ন (সাড়ে চার লক্ষ)। অর্থাৎ তিরিশ জন মালিকের মধ্যে উনিশজনই কানোরিয়ার তুলনায় বেশি টাকা পি এফ থেকে খরচ করে ফেলেছেন। অথচ এসব কারখানার কোথায়ও কানোরিয়ার মতন আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। সেই অর্থে কানোরিয়া এক নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল পাটকল শ্রমিকদের কাছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় মেলবন্ধন ঘটল না। বাকি ন'টা বন্ধ কারখানা বা বাকি উনত্রিশটা পি এফ-এর টাকা বাকি রাখা কারখানার শ্রমিকরা যেমন কানোরিয়ার সঙ্গে একাত্ম হল না, তেমনি কানোরিয়ার পক্ষ থেকেও কোনও চেষ্টা হল না এই মেলবন্ধন ঘটানোর। শ্রমিক বন্ধুদের বাদ দিয়ে কানোরিয়ার নেতারা প্রচারের শিরোনামে থাকার জন্য শিল্পী, কলাকুশলী, সংবাদপত্রের লোকজন, সাহিত্যিক—এঁদের বেছে নিলেন। যৌথ রান্নাঘর খুললেন নয় নয় করে পঞ্চাশটা, যা অনিবার্য নিয়মেই টিকিয়ে রাখা যায়নি। কিন্তু এই সঙ্গে প্রশ্ন হল : যৌথ রান্নাঘর নির্মাণ কি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনও পথ হতে পারে ? কানোরিয়ার আন্দোলন একসময়ে যৌথ রান্নাঘরের সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। কানোরিয়ার আন্দোলন যে নতুন মোড় নিল তার প্রধান কারণ যৌথ রান্নাঘর চালানোয় নেতৃত্ব অপারগ হলেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত তিরিশ লক্ষ টাকা তহবিল গড়ার আহ্বানে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। শ্রমিকদের পাশে শ্রমিকদের দাঁড় করাতে না পারলে, বন্ধ কারখানার পাশে চালু কারখানা শামিল না হলে, শ্রমিকের জমায়েতে আন্দোলন গড়ে না তুললে, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আর সংবাদপত্রের উপর নির্ভরশীল কোনও আন্দোলন টিকে থাকতে পারে না। সহযোগী শক্তি যদি মূল শক্তি হয়ে দাঁড়ায় তবে আন্দোলনে যতিচিহ্ন নেমে আসে। মাত্র আড়াই হাজার শ্রমিক এই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কতটুকু এবং কতক্ষণ লড়তে পারে ? প্রয়োজনে সে জামাই-আদর করে নেতাকে নিয়ে যাবে রাইটার্সে, প্রয়োজনে রাতের অন্ধকারে তাঁবু ভেঙে নেতাকে তুলে দেবে হাসপাতালে !

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত
সম্পূর্ণ সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা

বিশ্ববাণী

সম্পাদক : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও স্বামী পরমাত্মানন্দ

বার্ষিক গ্রাহক হউন (৫৬ তম বর্ষ) গ্রাহক করা হচ্ছে

পূজার বিশেষ সংখ্যা সমেত ফাল্গুন থেকে মাঘ ১৪০১ পর্যন্ত সংখ্যাবলিও পাবেন বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০.০০ টাকার বিনিময়ে। এছাড়া আজীবন গ্রাহক (২৫ বছর পর নবীকরণ সাপেক্ষ)। পাঁচশো টাকা এককালীন অথবা এক বছরের মধ্যে দশটি কিস্তিতে দেয় দানের বিনিময়ে। দানের অর্থ ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। বার্ষিক গ্রাহক ও আজীবন গ্রাহকরা বেদান্ত মঠ প্রকাশিত গ্রন্থে যথাক্রমে ১০% ও ২০% ছাড় পাবেন। পূজাসংখ্যার পৃথক মূল্য ১৬.০০ টাকা। বিক্রেতাগণ ১০.০০ টাকায় পাবেন।

পূজাসংখ্যায় বিখ্যাত মনীষী লেখকদের মধ্যে আছেন— স্বামী অভেদানন্দ (দেবীদুর্গা), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রী প্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন, শ্রী রণজিৎকুমার সেন, বিহারীলাল সরকার, ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী, ডক্টর তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ, শ্রী বাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

সত্বর গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে তালিকাভুক্ত হোন

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৩৩-৭৩০০, ৩৩-৮২৯২

ড. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী **বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ-নিবিড় পাঠ** ৪০.০০
ড. সত্য গিরি **বৈষ্ণব পদাবলী** ৪৫.০০
অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
শাক্ত পদাবলী [তৃতীয় সং] ৪৫.০০
নজরুল ইসলাম
কবি মানস ও কবিতা [২য় সং] ৫০.০০
ড. সনৎ নস্কর **কবিকঙ্কণ চণ্ডী** ৬০.০০
অধ্যাপক তরুণ ঘোষ
কপালকুণ্ডলা ৪০.০০
ড. প্রসূন মুখোপাধ্যায়
গৃহদাহ [দ্বিতীয় সং] ৫০.০০
ড. সমরেশ মজুমদার
আরণ্যক ৪০.০০/**কালিন্দী** ৩৫.০০
পুস্তক বিপণি ■ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
রত্নাবলী ■ ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৯

কবি বিনয় মজুমদারের
ষাট বর্ষ পূর্তিতে আমাদের অভিনন্দন
খুব শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে কবির প্রবন্ধগ্রন্থ
ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য
কম্পিউটার কম্পোজ, অফসেটে ছাপা, চাররঙা প্রচ্ছদ। ৩০
বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র ৪৫
তাপস সেন অন্তরঙ্গ আলো ৬০
বাদল সরকার ❑ মিছিল ১০
থিয়েটারের ভাষা ২০
দিলীপকুমার মিত্র সম্পাদিত
শ্রুতি-নাট্য সংগ্রহ ১ম ৩৫, ২য় ৩৫
বিভাস চক্রবর্তী
মাধব মালঞ্চী কইন্যা ৩৫
সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত
রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা ৪০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ-গল্প
দেবীপ্রসাদ ঘোষ চলচ্চিন্তা ৩০
সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত
চলচ্চিত্র চর্চা ৬০
[illegible] আমার কথা ৩০
[illegible] শেষ সাক্ষাৎ
[illegible] সত্যজিৎ ৩০
[illegible]
প্রতিভাস [illegible]

আন্দোলনের শুরু থেকে জয়ের খোয়াব দেখলে আন্দোলনকারী নেতাদের রাষ্ট্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণও কালক্রমে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।
পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়ে রাষ্ট্রশক্তি এ যাত্রা কানোরিয়ার নেতাদের বাঁচিয়েই দিল! এতৎসত্ত্বেও পুলিশি জুলুমের নিন্দা করব। কামনা করব, কানোরিয়ার শ্রমিকরা জয়যুক্ত হোক!

পাচু রায়
শ্যামনগর রোড, কলকাতা-৫৫

পাক্ষিক 'দেশ' পত্রিকায় ২১ মে সংখ্যায় 'বামপন্থীরাই এখন প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী' সম্পাদকীয় সম্পর্কে এই চিঠি। কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন নতুন পথে হাঁটছে এটা আশার কথা ঠিকই, কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে সরকারপক্ষ হঠাৎ করে পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অনশনকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই সরলীকৃত ব্যাখ্যাটি বোধ হয় মানা যায় না।
আপনারা বলেছেন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন চরম ব্যবস্থা হিসাবে রেল রোকোর ডাক দিয়েছিল! সেটা ছিল লাগাতার রেল রোকো।
কানোরিয়ার কয়েক হাজার শ্রমিকের জন্য তাতে ভুগতো শ্রমিকসংখ্যার থেকেও আরও অনেক বেশিসংখ্যক সাধারণ মানুষ। অনেক রোগী সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছতে পারত না, পরীক্ষার্থীরা পারত না সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে, চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে পড়তেন নিত্যযাত্রীরা। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, নির্বাচিত সরকারের পক্ষে কি দর্শক হিসাবে এই লাগাতার রেল রোকো প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? তখন তো আপনারাই আবার অন্য সমালোচনা করতেন। আসলে আমরা এমন একটা বিপজ্জনক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে কোন কারখানায় সময়মত বোনাস না হলে থেমে যায় রেলের চাকা, এমন কি বিনা টিকিটের যাত্রীকে হাতেনাতে ধরে শাস্তি দিলে তার সমর্থনেও হয় রেল রোকো। অল্পসংখ্যকের জন্য ভোগান্তি হয় বহুসংখ্যকের।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসন থাকে নীরব দর্শক। আর যখন এরকম কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন গর্জে ওঠে সম্পাদকীয় স্তম্ভ। আমরা সাধারণ মানুষরা যাই কোথায় বলুন তো?

[illegible]
[illegible] ৭৪৩-৭১১৩১২

হিন্দু জাগরণ

অমলেশ ত্রিপাঠী-র 'হিন্দু জাগরণ' শীর্ষক নিবন্ধের পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে আলাউদ্দীন আহমদ তাঁর পত্রে ('দেশ', ২১ মে) প্রশ্ন রেখেছেন— মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাঁচাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ভাগের দাবি যদি ঠিক কাজ হয়ে থাকে, তা হলে গোটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাত থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিন্নার দেশভাগের দাবি অন্যায় হবে কেন? আপাতদৃষ্টিতে, শ্রীআহমদ-র বক্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু, দেশভাগের পরবর্তী পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে।
১৯৫১ সালের আদমসুমার অনুযায়ী ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩.৫৪ কোটি; ১৯৮১-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৫ কোটি এবং বর্তমানে তা প্রায় বার কোটি। পাশাপাশি, ওই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা, বাংলাদেশ) হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে ২৩% থেকে ১% এবং ৩০% থেকে ১০%-এ নেমে এসেছে। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান কি বলে না যে, ভূয়োদর্শী শ্যামাপ্রসাদের আশংকা অমূলক ছিল না এবং জিন্নার হিন্দু আতঙ্কের মূলে কোনও সত্য ছিল না? আসলে, মুসলমানদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জিগির তুলে দেশভাগের প্রস্তাবটা এক বিরাট ধাপ্পাবাজি ছিল। দেশভাগের প্রস্তাবের সঙ্গে জিন্না লোকবিনিময়ের প্রস্তাব রাখেননি; তাই প্রশ্ন, বিভক্ত ভারতবর্ষে যদি সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপরই নির্ভরশীল থাকে, তা হলে সেই নির্ভরতা অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের ক্ষেত্রে কেন থাকতে পারে না? এর কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই।
একই তারিখে (২১ মে) প্রকাশিত আর একটি পত্রে গৌতম রায় অমলেশবাবুকে ইতিহাস-বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করেছেন, যদিও তিনি নিজে তাঁর বক্তব্যে এন্তার ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়েছেন। যেমন, তিনি শৈব রাজা কর্তৃক হাজার হাজার জৈনকে শূলে চড়ানোর ঘটনার প্রমাণ হিসাবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত The History & Culture of the Indian People—Vol. V গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডঃ মজুমদার সেখানে কি বলেছেন তা উদ্ধৃত করেননি। ডঃ মজুমদার ওই গ্রন্থে (Chap. XVI) বলেছেন—
'According to Tamil Puranas, the Saiva

religion was firmly established by the cruel torture inflicted on the Jains. Specific reference is made to a case of an earlier period when 8000 Jains were impaled on stakes. But according to some scholars the story is apocryphal.'

দেখা যাচ্ছে, ওই শূলে চড়ানোর ঘটনা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে এবং ডঃ মজুমদার তার উল্লেখও করেছেন ; কিন্তু, গৌতমবাবু সে কথা বেমালুম চেপে গিয়েছেন।

অধ্যাপক ত্রিপাঠীর আর একটি উক্তি ('শুরু হল ধর্মান্তরকরণ আর তার সঙ্গে হিন্দু সত্তা সঙ্কট') 'কোনও মানবধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিকের নয়' বলে গৌতমবাবু কটাক্ষ করেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধার করে লিখেছেন— 'ভারতে মুসলিম বিজয় নির্যাতিত গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেইজন্যই এদেশের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছিল। এসব অস্ত্রের জোরে হয়নি। ...এজন্যই বাংলার চাষীদের মধ্যে দেখা যায় হিন্দুদের থেকে মুসলিম বেশি।' শুধু স্বামীজি নন, গৌতমবাবুর সেই 'সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-চর্চার জন্য সুপরিচিত' ঐতিহাসিক স্বয়ং রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)' বইতে ওই প্রসঙ্গে বলেছেন— 'হিন্দু সমাজের অত্যাচারই নিম্নবর্ণের মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল।' তা, অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু অত্যাচারী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কি কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছিল ? গৌতমবাবু নিশ্চয়ই এর জবাবে ইসলামের প্রেম, সাম্য, সৌভ্রাত্র ইত্যাদি বুলি কপচাবেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজির 'বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য' দুটি মাত্র উক্তি উল্লেখ করছি। 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ' প্রসঙ্গে বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা-৩য় খণ্ড) স্বামীজি বলেছেন— "মুসলমানগণ 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব' করে, বাস্তবিক কাজে কত দূর দাঁড়ায় ? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয় তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না— তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক।" 'বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়' প্রসঙ্গে আর একটি বক্তৃতায় স্বামীজি বলেনে— "তাহাদের একহস্তে ছিল কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি, 'হয় কোরাণ গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর আর অন্য উপায় নাই'। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভুতপূর্ব সাফল্য হইয়াছিল। ছয় শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই।"

গৌতমবাবু স্বামী বিবেকানন্দের ওইসব উক্তি বিষয়ে অবহিত নন, তা কি সম্ভব ?

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি নিয়েও গৌতমবাবু চাতুরি করেছেন। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর ডায়েরিতে অবশ্যই লিখেছেন— 'একটা Civil war ছাড়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না।' সেই সঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন— 'Civil war আমরা চাই না। কিন্তু যদি অপর পক্ষ তৈরি হয়ে ওঠে আর আমরা প্রস্তুত না থাকি তা হলে আমরাই ঠকব শেষ পর্যন্ত।' এ সম্পর্কে তাঁর ডায়েরিতে আরও অনেক সুচিন্তিত বক্তব্য আছে। কিন্তু, গৌতমবাবু তাঁর একপেশে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে শুধু ঐ একটিমাত্র ছত্র উদ্ধার করেছেন।

গৌতমবাবু তাঁর পত্রে শ্যামাপ্রসাদকে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর জন্য দায়ী করে লিখেছেন, শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে তাঁর রাজনৈতিক মুখপত্র 'নবযুগ'-এর পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকারকে চাল সরবরাহের বরাত পায়, যার পরিনাম 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। এই অতি উদ্ভট অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তাই শুধু এটুকু জানাই যে, 'নবযুগ' পত্রিকাটি ১৯৪১ সালে ফজলুল হক প্রকাশ করেছিলেন এবং শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকের দ্বিতীয় প্রগতিশীল মোর্চার মন্ত্রিসভায় যোগদানের বৎসরখানেকের মধ্যেই, মেদিনীপুর ও অন্যত্র বাংলার গভর্নরের দমননীতির প্রতিবাদে, ১৯৪২-এর নভেম্বরে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে ১৯৪৩ সালে 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে' ব্যাপক সাহায্যের জন্য সংগঠন গড়ে তোলেন।

গৌতমবাবু যেভাবে গজনীর মামুদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণ, বখ্‌তিয়ার খল্‌জির নালন্দা-বিহার ধ্বংসের সমর্থন করেছেন, আওরঙ্গজেবের গুণগান করেছেন সেসব নতুন ব্যাপার নয়। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আরম্ভ থেকেই এর সূত্রপাত। কেন এবং কি পরিমাণে তা করা হচ্ছিল, সে সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'History of Mediaeval Bengal' গ্রন্থের ভূমিকায়। (p. vi) বলেছেন— 'This was prompted by the political motive of bringing together the Hindus and Muslims in a common fight against the British...A noted historian sought to exonerate the Mahmud of Gazni's bigotry and fanaticism, and several others came forward to defend Aurangzib against the charge of religious intolerance brought by (Sir) Jadunath Sarkar, the greatest

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

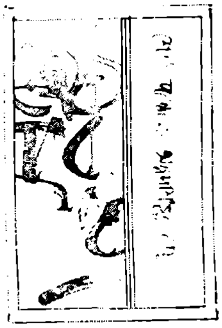

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ৭৫

লেখকের সদ্য প্রকাশিত অন্যানা বই

বিনুর বই ৬০ সংস্কৃতির বিবর্তন ২০
ছড়া-সমগ্র ৭০ সাত ভাই চম্পা ২০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৬৫ শ্রেষ্ঠ কবিতা ২০
অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী ১ম-৫ম খণ্ড ৩৯০
রত্ন ও শ্রীমতী ১৩০

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের নূতন সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত ২৫% এবং অন্যান্য বইতে ২০% ডিসকাউন্ট

ড. ভবতোষ দত্ত
রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গ ১৮

রমানাথ রায় শ্রেষ্ঠ গল্প ২৫

সুবিমল মিশ্র শ্রেষ্ঠ গল্প ৩৫

ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত

চলচ্চিত্রের অভিধান

(পরিমার্জিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রায় ৪০০টি বিষয়ের অনবদ্য আলোচনা-গ্রন্থ। আলোচিত প্রসঙ্গের মধ্যে আছে ছবি ও ছবির ধরন, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখা, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল, চিত্রপ্রযোজনাকারী দেশ, চিত্রপরিচালক ও কলাকুশলী, চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গের মিথস্ক্রিয়া, লিখেছেন দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন লেখক ও সমালোচক। সঙ্গে ৩২টি আলোকচিত্র।

গ্রন্থটির মূল্য ১৭০.০০ এককালীন গ্রাহক মূল্য ১০০ যাঁরা ৫০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা ২৫% ডিসকাউন্ট পাবেন। গ্রাহক হওয়ার শেষ তারিখ : ৮-১০-'৯৪।

বইটি ১লা ডিসেম্বর '৯৪ প্রকাশিত হবে। গ্রাহকদের ৩১.১.'৯৫ তারিখের মধ্যে বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশের মুখ্য পরিবেশক পাঠক সমাবেশ ঢাকা

বাণীশিল্প ১৪এ টেমার লেন কলি-৯

প্রকাশিত হলো। মহাভারতের কবি যা স্বকণ্ঠে বলেননি, অথচ বলতে পারতেন, এমন কিছু সংলাপে সমৃদ্ধ মহাভারত ভিত্তিক এগারোটি কাব্যনাট্যের সংকলন। **বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

অমৃত মন্থন ৩২

ভূমিকা : নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

রূপার বই ॥ **২টি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী দুর্গম হিমালয়ে বিশ্বস্ত ভ্রমণসঙ্গী। মানচিত্র ও ছবিসহ— বৈতালিক** এর

গিরিরাজ হিমালয় ৩৫

হিমতীর্থ পঞ্চকেদার, তুষারতীর্থ অমরনাথ, গুহাতীর্থ বৈষ্ণদেবী, চম্বাকৈলাস, মণিমহেশ ও ত্রিলোকনাথ এবং সমগ্র কিন্নর কৈলাস

গিরিনদী কান্তার ৩০

তমসা গাড়োয়াল, উৎস হরকিদুন। নেপালের তিব্বত সীমান্তে কালীগঙ্গা, বিধৌত মুক্তিনাথ চিত্রকূট সহ বিন্ধ্য পরিক্রমা, নর্মদা ও শোন উৎস অমর কন্টক

রূপা ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশিত হল

শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর লেখা 'শিশু-মন'। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিশু, শিশুই। তার মন একটা সাদা পাতার মত, সেখানে আমরা যেমন খুশী লিখতে পারি, দাগ কাটতে পারি। আমাদের ব্যস্ততাময় জীবনে কতবারই না আমরা তাদের অবহেলা করি, তুচ্ছ করি। তাদের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে যখন সযত্নে, ভালোবেসে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে পরিপুষ্ট করে তোলা আবশ্যক, তখন আমরা তাদের পদদলিত করে ফেলি। তাদের কামনা-বাসনাগুলোকে কখনো পূর্ণ আবার কখনো দমন করে কিভাবে ঈশ্বরের পথে চালিত করতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করেই আমরা দিনগত পাপক্ষয় করি আর পরিশেষে চোখের জল ফেলি। কুঁড়ি ছেঁড়ার অপরাধে আজ আমরা অনেকেই অপরাধী। আশা করি শিক্ষক সমাজ ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে লেখা বইটি পরিবারে তথা সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শিশু-মন পদ্মা মিত্র ১০.০০

প্রাপ্তিস্থান UNIVERSAL BOOK DEPOT

57/D, College Street Cal-73

historian of India.'

এত করেও যে দেশভাগ রোখা যায়নি, তার কারণ, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না। গৌতমবাবুরা যত শীঘ্র এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন, ততই দেশের মঙ্গল।

বিমলেন্দু ঘোষ
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০

গত ২১ মে ১৯৯৪-এর 'দেশ' পত্রিকায় আলাউদ্দীন আহমদের চিঠি পড়লাম, এখানে দেখলাম পত্রলেখক ১৯৪৭-এর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন বঙ্গদেশ বিভাগের দাবিকে স্যার সৈয়দ আহমদের কাজের সঙ্গে তুলনা করে স্যার সৈয়দ আহমদের কাজের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। আমার মতে, প্রথমে ভাবতে হবে কি কার্যকারণে এই দুই ঘটনা ঘটে। এটা সকলেরই জানা যে, ইংরেজ সরকার ভারতে তাদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করতে ভেদনীতির আশ্রয় নেয়। সেই ভেদনীতির ফলশ্রুতিস্বরূপ একাধিক ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়নকরূপে দ্বিজাতিতত্ত্বের অবতারণা করে—সে সৈয়দ আমীর আলিই হোন, বা স্যার সৈয়দ আহমদই হোন, বা পরবর্তী কালে মহম্মদ আলি জিন্নাই হোন। স্যার সৈয়দ আহমদ এই তত্ত্বের জনক না হলেও ধারক ও বাহক ছিলেন অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে যে বিষবৃক্ষ লাগানো হয়েছিল, স্যার সৈয়দ আহমদ সেটার রক্ষণাবেক্ষণ ও পুষ্টির চেষ্টা করেছেন।
পত্রলেখকের মতে, স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি চাননি। কিন্তু এটা সবাই জানেন যে, স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি ওই বিষবৃক্ষেরই ফল।
যখন দেশভাগের দাবি গ্রহণ করা হল এবং brute majority-র ভয়ে (পত্রলেখক উল্লিখিত) মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ তৈরি হচ্ছে তখন শ্যামাপ্রসাদ ওই একই যুক্তিতে বঙ্গদেশ ভাগের দাবি তোলেন। অর্থাৎ যে হিন্দু brute majority-র ভয় ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ ও জিন্নার মনে, শ্যামাপ্রসাদ ঠিক সেই মুসলমান brute majority-র ছায়া দেখেছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশে এবং তখন বঙ্গদেশ বিভাগের দাবি জানান বঙ্গদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মঙ্গলার্থে।
অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের কাজ সমর্থন করলে স্যার সৈয়দ আহমদের কাজের সমর্থন মেলে না। কারণ, শ্যামাপ্রসাদের দাবি স্যার সৈয়দ আহমদ বা জিন্নার দেশবিভাগের দাবির ফলশ্রুতি মাত্র। বরঞ্চ বলা যায় শ্যামাপ্রসাদ স্যার সৈয়দ আহমদ ও জিন্নার কাছে শিক্ষালাভ করে বঙ্গ বিভাগের দাবি জানান কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘুর মঙ্গল করার জন্য।
পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা—ভারতে হিন্দু brute majority মুসলমানদের কাছে ভীতিপ্রদ হয় না, আর পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশে মুসলমান brute majority-র সামনে হিন্দুদের কি অবস্থা হয়েছে।

মানসকুমার মৈত্র
কামডহরী, গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪

বাংলা কবিতা কি পিছিয়ে পড়ছে ?

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রতিবেদন 'বাংলা কবিতা কি পিছিয়ে পড়ছে ?' ও সেই প্রসঙ্গে ৭ মে সংখ্যায় কৃষ্ণা বসুর চিঠির বিষয়ে কিছু প্রসঙ্গান্তর টেনে আনছি।
সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার কবিরা যে উদ্ভট, স্ববিরোধী অভিযোগগুলি করে গেলেন, তার কোনও সদুত্তর কি শ্রীমতী সেনগুপ্ত ওই সভায় দিতে পেরেছিলেন ? লেখা পড়ে মনে তো হল না। এমন কি, যে অনুষ্ঠানটিতে এইসব অভিযোগ তোলা হয়, সেই অনুষ্ঠানের আবৃত্তি করা কবিতাগুলি কেমন ছিল, বিভিন্ন ভাষার কবিতাগুলি কোনও মানদণ্ড বেঁধে দিয়েছিল কিনা, যার রূপরেখায় বাংলা সাহিত্য বা কবিতার অগ্রগতিকে মাপা যাবে—এসব কিছুই কিন্তু আলোচিত হয়নি প্রতিবেদনে। জানবার ইচ্ছা থেকে গেল যে, দীর্ঘ সময় ধরে যাঁরা বাংলা সাহিত্য/কবিতাকে তিরস্কার বর্ষণ করে গেলেন, ওই অনুষ্ঠানে পঠিত তাঁদের কবিতার মান কিরকম ছিল। এই বিশ্লেষণের দিকে তো স্বয়ং এক কবি সেনগুপ্ত গেলেন না—কেবল তাঁর 'অহং ধাক্কা খেল' ? বাংলা সাহিত্যের নিন্দামন্দে তিনি 'অত্যন্ত রেগে' গিয়েছেন বুঝলাম, অথচ একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারতেন কেন অভিযোগকারীদের মতামত এত একপেশে। কেন বাংলায় এত কথাসাহিত্যিক থাকতে শরৎচন্দ্রের পরে কেবল সত্যজিৎ রায়ের কথাই ওঁদের মনে হল ? এ তো বাজারি চাহিদা-যোগানের নিকষেই বিচার করা বলে সন্দেহ হয়। সত্যজিৎ রায় অধিক marketable—তাঁর লেখার ইংরেজি অনুবাদ সোৎসাহে করা হয়েছে—তাই অবাঙালি পাঠক তাঁকে জেনেছেন। আমার ঘনিষ্ঠ এক অবাঙালি বন্ধুকে উপহার দেব বলে কলট

প্রসে দিল্লির সবচেয়ে বড় হিন্দি পুস্তকালয়ে গিয়ে তন্নতন্ন করে আমি খুঁজেছি শরদিন্দু-বিভূতিভূষণের অনুবাদ। 'পথের পাঁচালি'র কোনও হিন্দি অনুবাদ পাইনি। 'রূপা' প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ পড়েই ক্ষান্ত দিতে হয়েছে আমার বন্ধুকে। অথচ দেশজ মাটির গন্ধ ঠিক ঠিক ধরতে পারত ভারতীয় ভাষার অনুবাদই। ওই দোকানে শংকরের 'সীমাবদ্ধ'-'জন অরণ্য' পেয়েছি। আশাপূর্ণা দেবী বহুলভাবে পঠিত ও উপস্থিত। কিন্তু বাকি কাউকে পাইনি।

নরেন্দ্রনাথ-নারায়ণ-সতীনাথ-মানিকের মতো শক্তিধর লেখকেরা কেন অনূদিত হন না, সে প্রশ্নের উত্তর তো আত্মগর্ব গর্বিত বাঙালিকেই দিতে হবে। আমাদের দোষ আমরা নিজেদের তুলে ধরতে যথেষ্ট সচেষ্ট নই। নিজ ভাষাগণ্ডির পাঠক পেয়েই আমাদের অহংবোধ তৃপ্ত হয়। সুতরাং বাইরের পাঠক, যাঁরা পুরোপুরি অনুবাদের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের মতামত খণ্ডিত তো হবেই।

ঠিক একই খণ্ডিত দৃষ্টির ফলে তাঁরা বলতে পেরেছেন পরবর্তী বাঙালি কবিরা এখনও রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের অনুসারী অথবা 'ভাষার দিক থেকেও বাংলা থেমে আছে।' এ কথাগুলি কত ভুল তা আমরা বাংলা কবিতার সচেতন পাঠকমাত্রেই জানি। এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে অন্য সমস্যা—বাংলা কবিতা তার নিজ ভাষার অনুরণনশীল শব্দগুচ্ছে সম্পূর্ণ সমাহিত— প্রতিটি শব্দ সেখানে টেনে নিয়ে আসে অজস্র অনুষঙ্গ—যা কেবল বাঙালি বুঝতে, ধরতে পারবেন। সত্যজিতের ছবির ডায়ালগের মতোই, বঙ্গসংস্কৃতির পটভূমিবিহীনের কাছে এর অনুবাদ অর্থহীন, অসম্ভবও। তা ছাড়া, কবিতা ব্যাপারটিই তো মূলত অননুবাদনীয়—তার এই অনুষঙ্গ-শৃঙ্খলিত অস্তিত্বের জন্যই। সমস্ত দেশের কবিরাই এ কথা মানেন।

এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দিভাষী বান্ধবীকে প্রয়াগ শুক্ল-কৃত 'বনলতা সেন'এর হিন্দি ভাষান্তর শোনাতে গিয়ে কি যে বিপদে পড়েছিলাম! 'পাখির নীড়ের মত' চোখ যখন 'চিড়িয়োকে খোঁসলেকে তরহ্' হয়ে দাঁড়াল বন্ধুটি আঁতকে উঠল তার রূঢ়তায়—অর্থের নিবিড়তাটুকুও তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হল। শুধু অর্থনিষ্কাষণ করা তো নয়, কবিতায় শব্দের ভূমিকা তাকে পেতলের বাসনের মতো নিটোলভাবে বাজিয়ে তোলাও। শ্রুতির এই দিকটি অনুবাদে কদাচিৎ রক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলি, নিজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কর্মসূত্রে কিছুদিন থাকবার ও নানা প্রদেশের সমবয়সী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে মেশবার সুযোগ ঘটবার ফলে, একই সঙ্গে average বা above average সর্বভারতীয় পাঠককুলের রুচির পরিচয় খানিকটা পেয়েছি, যেমন পপুলার হিন্দি কবিতা সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে কিছুটা। শের-শায়রী-গজল ছাড়া বড় একটা কোন কবিতাই এদের পাচ্য নয় — অতি প্রাচীন গালিব থেকে আধুনিকতম 'মধুশালা' (বচ্চন) পর্যন্ত এদের ভালোবাসার গণ্ডি—যার কোনটাই 'আধুনিক' নয়। বাঙালি ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে যেভাবে সুভাষ - শক্তি -শঙ্খ - জয় গোস্বামী ফেরেন (জীবনানন্দকে ছেড়ে দিলাম — তিনি একটি প্রতিষ্ঠান—তা ছাড়া স্কুলপাঠ্যও!) সেভাবে কোনও সত্যিকার আধুনিক কবিতার কলি মুখস্থ রয়েছে অবাঙালি ছেলেমেয়েদের— এ প্রায় অভাবনীয়।

কোনও সাহিত্যের পাঠক কতটা সচেতন ও শিক্ষিত সেটা কি সেই ভাষার সাহিত্যের 'এগিয়ে থাকা'র মাপকাঠি নয়? ক'জন পাঞ্জাবি যুবক অমৃতা প্রীতম বা মনজিৎ কাউরের কবিতায় প্রেমিকাকে সম্ভাষণ করেন, জানতে চাই। পাঠকের গুণমান নিশ্চয়ই কবিতার গুণমানকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আসলে বাঙালির সাহিত্যজগৎ বড়ই আত্মম্ভরী ও বাংলাকেন্দ্রিক — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওঁরা ঠিকই বলেছেন, আমরা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখি না। কিন্তু এও ঠিক যে, স্বভাষার বিপুলসংখ্যক আগ্রহী সচেতন পাঠক আমাদের লেখকেরা পান। ওঁরা তা পান কি? সন্দেহ হয়।

যশোধরা রায়চৌধুরী
রাঁচি, বিহার

বন্ধ কারখানা...

'দেশ', ২৩ এপ্রিল ১৯৯৪-এর পৃষ্ঠায় রণবীর সমাদ্দারের নিবন্ধ 'বন্ধ কারখানা, রুখে দাঁড়ানো শ্রমিক' অনেক প্রত্যাশা নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড আশাহত হয়ে এই চিঠি লিখছি। ভেবেছিলাম একটা পথের সন্ধান রণবীরবাবুর লেখা থেকে পাব।

রণবীরবাবুর নিবন্ধটিকে সারাংশ করলে দাঁড়ায় বর্তমান পশ্চিম বাংলাতে সরকার, মালিকপক্ষ, রাজনৈতিক দল বা শ্রমিক সংগঠন কেউই শ্রমিকদের কল্যাণ চায় না, চায় শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বা কর্তৃত্ব। তাই আজ সংকটের দিনে সরকার নিষ্ক্রিয়, শ্রমিক সংগঠনগুলি গতানুগতিকতায় আবদ্ধ এবং মালিকপক্ষ আগ্রাসী। এই অসহনীয় অবস্থায় একমাত্র কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকগণ নূতন

জ্যোতির্বিদ শিবশংকর ভারতীর ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ ৪৫.০০
চারটি খণ্ডে আছে সমগ্র গুজরাট রাজস্থান উড়িষ্যা দিল্লীসহ উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ, পথের বিবরণ, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পশ্চাদপট, পথচলতি সাধুদের কাম প্রেম যৌনচিন্তা কুঅভ্যাস ও সুন্দরী রমণী দর্শনে মানসিক প্রতিক্রিয়া, সংসারীদের নানা সমস্যা সমাধানে সাধুদের উপদেশ, তীর্থমাহাত্ম্য।
ভাস্বতী, ১০৩ সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিষয়ক তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ
অমলেন্দু দে
প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ ৩০
★
বিমান বসুর ভূমিকা সংবলিত
ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত
ইতিহাস-নিষ্ঠ আলোচনা-গ্রন্থ
হিন্দু-পাদ-পাদশাহী ৩০
তিনটি অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ
ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য-এর
রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ৪০
রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন ১৮
শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক ১৫
চিরায়ত প্রকাশন ॥ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩

বদরুদ্দীন উমর
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক
দুশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই বন্দোবস্ত উদ্ভূত সমস্যাবলীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য সংরক্ষণ যোগ্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ ❑ ২২.০০
ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা ৪০.০০
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ১৮.০০
বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ১৫
আবুল হাশিম/আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি ১৮.০০
জে. বি. এস. হ্যালডেন
বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন ১৮ মানুষের বিভিন্নতা ১৮
অশোক মিত্র
নাস্তিকতার বাইরে ৩০ সকলই তোমার ইচ্ছা ৩৫
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস ৫৫
ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত/সৌন্দর্যতত্ত্ব ৩৫.০০
নেপাল মজুমদার
রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ ৪০.০০
পবিত্র সরকার
বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৮.০০
লোকভাষা লোকসংস্কৃতি ৩৫.০০
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক ১৬.০০
● চিরায়ত প্রকাশন, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩ ●

নেতৃত্বের অধীনে এক 'উদ্ভাবনশীলতা' হাজির করেছে। তাঁর ভাষায় 'শ্রমিক আন্দোলনের সামনে চলে এসেছে একটা বড় কথা : উৎপাদনক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম শ্রমিকরা করবে কি না ?'
এই প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় রণবীরবাবু যাকে যেভাবেই সমালোচনা করুন না কেন, শ্রমিকদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, শ্রমিকদের জীবনের সমস্যাগুলি শুধু শ্রমিকদের নয়, সারা সমাজেরও। কিন্তু শ্রমিক যদি উৎপাদনের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তা হলে তাকে কাঁচামাল, মজুরি নির্ধারণ, প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং বিপণনের মতো সমস্ত ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রমিক কি তা পারবে ? পৃথিবীর যে দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তার আগে তারা দখল করেছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করল সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি ব্যক্তি-মালিকানার উচ্ছেদ ঘটাতে সমর্থ হলেও ব্যক্তি-শ্রমিকের উচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। তাই ব্যক্তি-শ্রমিকের সঙ্গে রাষ্ট্র-মালিকের সংঘাত ঘটেছে ; এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। কানোরিয়ার শ্রমিকদের বর্তমান প্রিয় নেতৃত্ব শুধুমাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রের অধিকার গ্রহণ করলেই অনিবার্যভাবে ব্যক্তি-শ্রমিকের সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হবে। কারণ, প্রথমত, নেতৃত্ব যতই সৎ এবং সুযোগ্য হোক না কেন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে একসময়ে সংকট আসবেই ; দ্বিতীয়ত, মুনাফার স্বার্থে বাজার বজায় রাখতে উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবেই। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সকল শ্রমিককে একসঙ্গে উন্নত করে নেয়া যায় না। তখন দুঃখের সঙ্গে পিছিয়ে-পড়া শ্রমিককে বিদায় দিতেই হয়। সমাজের বিকাশের প্রতিটি স্তরে এই প্রক্রিয়া আছে, এবং এটিকে এক ধরনের দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখাই শ্রেয়।
সেই 'হ্যাভস'এবং 'হ্যাভ নটস'-এর দ্বন্দ্ব, তবে 'মাইক্রো লেবেলে'। মেধা ও দক্ষতার সম্পদে যে শ্রমিক এগিয়ে যায় সে টিকে থাকে। আর যে এগুতে পারে না সে পরাজিত এবং কর্মচ্যুত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া সর্বত্রই এই প্রক্রিয়া বা প্রতিযোগিতা চলছে। তাই, নিশ্চিন্তে বলে দেয়া যায়, পশ্চিম বাংলার যে শ্রমিককুলকে রণবীরবাবু অহল্যা ভেবেছেন তাদের উদ্ধারের জন্য এই কলিযুগে কোনও রামচন্দ্র পদস্পর্শ দিতে এগিয়ে আসবে না। পরিবর্তে মহাভারতের শিক্ষা থেকে শ্রমিককে এ কথাটা বোঝানোই দরকার যে, সকলেরই একসময়ে 'কাল পূর্ণ' হয় এবং তখন চলে যেতে হয় ভাবীকালের মানুষকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। চটশিল্পেরও কাল পূর্ণ হতে চলেছে। এই শিল্প অস্তগামী। পূর্ব দিগন্তে প্লাস্টিক ও নাইলনের সোনালি আভাস দেখা যাচ্ছে।

পৃথ্বীশকুমার সানা
দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৪

উলুধ্বনি

গত ২৩/৪/৯৪ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত ভবদেব বিশ্বাসের চিঠিতে জোকার এবং উলুধ্বনির উৎস সন্ধানে যে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে তা প্রশংসনীয় হলেও একপেশে। এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারকে কেন দূরে রাখলেন বোঝা গেল না। সেখানে একটু খোঁজ নিলেই তিনি দেখতে পেতেন যে, সংস্কৃত 'জয়কার' বা 'জয়-জয়-কার' শব্দ থেকে জোকার শব্দটি এসেছে, অস্ট্রিক ভাষা থেকে নয়।
উলু-ধ্বনির ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নয়। মেয়েদের বাক্‌যন্ত্র নিঃসৃত মঙ্গলধ্বনি উলু উলু বা 'উলুলু' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩/১৯/৩) বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। পূর্বোক্ত উপনিষদের ব্যাখ্যাতা আনন্দগিরির মতে, উলুলু (= উলু+উলু, বহুবচনে 'উলুলবঃ')-এর অর্থ—'দেশবিশেষে প্রসিদ্ধ উৎসবকালীন শব্দবিশেষ।' সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত-এ (১৪/৫১) এবং নাটক অনর্ঘরাঘব-এ (৩/৫৫) উলূলুধ্বনির উল্লেখ আছে অনুরূপ অর্থে। অথর্ববেদেও নাকি 'উলুলয়ঃ' (উলুলি'র বহুবচন) পদের সন্ধান পাওয়া যায়।
পূর্বোক্ত কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির অনুকরণে শব্দটির 'উলু' বা 'উলুলি' নামকরণ। অন্য কোনও বিশেষ শব্দ ভেঙে তার থেকে এর উৎপত্তি হয়নি।

কালীজীবন দেবশর্মা
ডানকুনি, হুগলী

বড় ফুল পেতে বিশ্বাস প্রণীত
ফুলের বাগান
৩ খণ্ড/প্রতি খণ্ড—৩০ টাকা
কিচেন গার্ডেন—৩০ ফলচাষ বারমাস—২০
কল্পবৃক্ষ নারকেল—১২
নাথ ব্রাদার্স, ৯ এস সি দে স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কলি-৭৩

এবার পুজোয় ভারত নেপাল ভূটান ভ্রমণের অপরিহার্য গাইড বুক
ভ্র ম ণ স ঙ্গী
সমগ্র ভারত ১৫০ /১৭৫ * উইক এন্ড ট্যুর ৪৫ * নেপাল ও ভূটান ৪০
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ❑ কলকাতা-৭০০০০৭ ❑ ডায়াল ২৪১২৩৮৬

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অলৌকিক গল্প ৩০
বাছাই গল্প ৩০
অপ্রকাশিত রচনা ৫০

বাছাই গল্প সিরিজে স্মরণীয় সংযোজন
কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
বাছাই গল্প ৩০
সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ
মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

৩য় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
পরমপদকমলে ৩৫
চতুর্থ মুদ্রণ
কালকূট-এর **পৃথা** ১৮

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র·চ্ছ·দ নি·ব·ন্ধ

পাঁচালির পথে পথে

কিশলয় ঠাকুর

একটি নদী, একটি গ্রাম, এক স্বপ্নময় কিশোর, দারিদ্র্য, আদর্শ, বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়া, পায়ে পায়ে পথচলা, এই তো পথের পাঁচালি। স্রষ্টা এইভাবেই সৃষ্টিতে মিশে যান। কাহিনী, কল্পনা ও জীবনের সীমারেখা এইভাবেই হারিয়ে ফেলে বারে বারে।

শতাব্দী পেরিয়ে আজও হয়তো শ্যামরসে বিভোর সে কিশোর কঞ্চি হাতে এই সবুজের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। হারিয়ে যায় বনধুঁদুলের আড়ালে, উলটি-বাঁচরা-বৈঁচি ঝোপের জটলায়। তার লুকোচুরি বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে, আম, বকুল আর সাঁইবাবলার শ্যামচ্ছায়ায়। তার অঙ্গে অঙ্গে ঘেঁটু ফুল আর সোঁদালির সৌরভ। সে যেন বনস্থলীর সবুজ আত্মার প্রতীক। তাকে ঘিরেই ঋতুতে ঋতুতে বনপুষ্পের মহোৎসব।

তার সত্তার সঙ্গে এই সবুজে-ডোবা পল্লী আজীবন জড়ানো। এই তার পল্লী। দূরে গিয়েও সে তাকে জানায়, —'দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখিডাকা, তেলকুচো ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটেকে অভিনন্দন করে শুধু জানাতে চাই,— ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি ভুলিনি।... তোমার কথাই লিখে যাব— সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।' এই দিনলিপি, এই প্রণয়লিপি যার উদ্দেশে, সে তার গ্রাম— বারাকপুর। এই কিশোর— চিরকিশোর বিভূতিভূষণ।

'শুক্লপক্ষ ১৩০১ সন, ২৮ ভাদ্র, বুধবার, দিবা সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয়। মুরাতিপুর গ্রামে। ইঙ্গরাজী ১৮৯৪/১২ সেপ্টেম্বর। দিবা ৩০/৪২, রাত্র ২৯১৮ ॥'

এর পর রাশি, গণ বিচার করে নবজাতকের ভবিষ্যৎটাও একবার দৈবালোকে বিচার করে দেখলেন পিতা। তৈরি হল বিভূতিভূষণের জন্মপত্রিকা— ২৮শে ভাদ্র, বুধবার, ত্রয়োদশী ৬০। শ্রবণা নক্ষত্র।১২/৪৫ ইং দিবা ১০/৫৮ কৌলাবকরণ অতিগণ্ড যোগ। ১২/২২ ইং দিবা ১/৪৮/৪৮ যাত্রা নাস্তি পাপযোগ। জন্মের মকর রাশি, দেবগণ, শূদ্র বর্ণ। নিচে নিজ স্বাক্ষর— শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী কথক।

বাপ খুশি ছেলের জন্মপত্রিকা বিচারে। ত্রয়োদশীর ন্যায় উত্তম তিথিতে জাতকের আবির্ভাব। বার হিসাবে বুধ তাকে দেবে শিল্পপ্রতিভা। মহৎ চরিত্রের অধিকারী হবে সে দেবগণাশ্রিত বলে। এবং সঙ্গে যুক্ত চিন্তাশীলতা ও চেতনা প্রসারের দ্যোতক মকররাশি। আবার শূদ্রবর্ণে সে হবে বৈষ্ণবের বিনয়মণ্ডিত। সর্বোপরি, সবগুলির সঙ্গে বলবান হয়ে বিরাজমান রবি। এরকম যোটকে রবিই জাতকের জীবনে নিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত যশোরাশি। বাঃ! মন ভরে যায় পিতা মহানন্দর।

●

তার লুকোচুরি বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে, আম, বকুল আর সাঁইবাবলার শ্যামচ্ছায়ায়। তার অঙ্গে অঙ্গে ঘেঁটুফুল আর সোঁদালির সৌরভ। সে যেন বনস্থলীর সবুজ আত্মার প্রতীক। তাকে ঘিরেই ঋতুতে ঋতুতে বনপুষ্পের মহোৎসব।

●

মুরাতিপুর বিভূতিভূষণের মাতুলালয়। জন্ম সেখানে হলেও পৈতৃক বাড়ি বনগাঁর গোপালনগর থানার বারাকপুর গ্রামে। এলাকাটায় ছিল নীলকর সাহেবদের নীলচাষের রমরমা। কাছেই মোল্লাহাটি কুঠি ছিল তার হেড কোয়ার্টার। কুঠি ছিল এই বারাকপুরেও। সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এলাকাটি। রোজগারের সুবিধা দেখে পিতামহ কবিরাজ তারিণীচরণ বসিরহাটের পানিতর থেকে চলে আসেন এখানে। পুত্র মহানন্দকে তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রপাঠ দিয়ে কাশীতে পাঠালেন। সেখান থেকে শাস্ত্রী উপাধি অর্জন করে দেশে ফি-রলেন মহানন্দ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলেন আর এক বাই। একা থাকতেন কাশীতে। ইচ্ছেমতো ঘুরে ঘুরে ঘোরনচণ্ডী স্বভাব হয়েছে। আর একটা হয়েছে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাগবত পাঠের আসর দেখে দেখে কথকতার নেশা।

পিতার ভয়ে প্রথম প্রথম লুকিয়ে-চুরিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়ায় কথকতার আসর বসাতেন। তারিণীচরণের মৃত্যুর পর সে মুক্ত পুরুষ।

কথক ঠাকুর বাড়ি আছেন গো!

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আলাম সেই বানপুর থেকে। বাবা ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠে পালা শুনতি চাই।

কোথায় বারাকপুর আর কোথায় বানপুর! তা ডাক আসে বইকি! গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর, রাধানগর, রানাঘাট, শা'গঞ্জ, কেওটা—দূর দূর গাঁয়ের কতো নরনারী কথক ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠের রসধারায় আপ্লুত হতে চায়। গামছায় পুঁথি বেঁধে, কাঁধে চাদর, গলায় পদ্মবীজের মালা, কোঁচা দুলিয়ে ছাতা হাতে শাস্ত্রী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারা চাকলার কথকঠাকুর বেরিয়ে পড়েন। এরপর কোথা থেকে কোথায় যাবেন, কবে ফিরবেন কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। বাড়িতে না-কোনও পয়সাকড়ি পাঠানোর খেয়াল, না-কোনও চিঠিপত্র দেওয়ার দায়। কিন্তু স্ত্রী, বিভূতিভূষণের মাতা মৃণালিনী দেবী সংসার চালান কী করে? ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এদিকে ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। পাঠশালায় দেওয়া দরকার। মহানন্দও যুগলক্ষণ বোঝেন।

গাঁয়ের হরিমোহন রায়ের মুদি দোকান-কাম-পাঠশালায় পুত্রকে ভর্তি করে দিলেন। তবে কেবল ভরতি করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে গেল না, তার জন্য মাসান্তে কিছু রসদ যোগাতে হয়। হরিমোহন তো আর মাগনায় স্কুল খোলেননি! মহানন্দর সেদিকে হুঁশ নেই। মৃণালিনীও সামলাতে পারেন না। ফলে বিভূতিভূষণকেও পাঠ চুকিয়ে দিতে হয়। ফের অন্য পাঠশালার সন্ধান। এইভাবে কাছে-দূরের বেশ কয়েকটি পাঠশালা ঘুরে অগত্যা এক সময় পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হল।

এবার শুরু হল বিভূতিভূষণের জীবনের নতুন পাঠশালা। ঘুঘুডাকা বাঁশবনের মধ্য দিয়ে সে কিশোর এগিয়ে চলে। গোঁড়া লেবুর গন্ধমাখানো, বনমালতীর রূপ ছড়ানো, ঘেঁটকোলের রেণুজড়ানো, সোঁদালির ঝাড় দোলানো, মধুমল্লির সৌরভবেভুল বনময় সবুজের মধ্যে ফুলসজ্জার উৎসব-সভায় তার চলা। আর এত সবুজও আছে এ-তল্লাটে। বিভূতিভূষণের ভাষায়, 'ঘরের পাশেই ইছামতীর তীর পর্যন্ত শুধু সবুজ আর সবুজ। পথ এখানে সবুজের সমুদ্রে হারা।' এই সবুজ জগতের পাঠবিতানে ভর্তি হয়ে গেল মহানন্দ-তনয়। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে নব নব পাঠ। ভাঁটফুলের ঝাড়ে নতুন.অনেক প্রজাপতি, কত রঙ রেখা আঁকা তাদের ডানায়। একটা কুকোপাখি ডাকছে। এতদিন ডাক শুনে শুনে কতো কথাই ভাবত, আজ চেনা হয়ে গেল। রাতে বাবার কাছে শুয়ে শুনতে পেত ইছামতীর দিক থেকে গান ভেসে আসছে। বাবা বলেন, ও মাল্লা-মাঝির গান। আজ ওর সামনে দিয়েই তারা গেয়ে যায় দাঁড় টানতে টানতে। কোথা থেকে আসে, কোথায়ই বা যায়! ভেবে ভেবে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। ঘেঁটু ফুলের পাপড়ির মতো জ্যোৎস্না ফোটে। কিশোর ঘরে ফেরে উন্মন।

ছেলেকে যজমানির কাজে আটকানর জন্য তার উপনয়ন দিলেন পিতা। তাঁর দিনলিপিতে লেখা আছে তারিখটা— ১৩১৩ সাল, ৫ ফাল্গুন, রবিবার, পঞ্চমী তিথি। ইংরেজি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭। কিন্তু ছেলেকে ইছামতী-লালিত উলটি-বাঁচরা-বৈচির জগৎ থেকে যাজনক্রিয়ায় ফেরান গেল না।

ইতিমধ্যে মৃণালিনীর কোলে আরও ক'টি সন্তান এসেছে। বিভূতিভূষণের পরে ইন্দুভূষণ, অল্পদিনেই মারা যায়। তার পরে জাফরি, ভাল নাম জাহ্নবী, তার পরেও মেয়ে মণি—ভাল নাম সরস্বতী, তারপরে পুত্র নুটু—নুটবিহারী। সংসারের ভার যতই বাড়ুক নির্ভার মহানন্দ। মনের আনন্দে ঘোরচক্কর আর কথকতা নিয়ে আছেন। কালেভদ্রে কিছু আয় হলে পাঠান। এ দিকে অভাবের সংসারে সুখে-দুঃখে ছোটদের আগলাতে গিয়েই মা মৃণালিনী হিমশিম। জ্যেষ্ঠ পুত্র এই সুযোগে বল্গাহীন। পাঠশালার একদা-সহপাঠীরা সব বড় হয়ে দূরের বনগ্রাম হাইস্কুলে যাচ্ছে। বয়েসটা বিভূতিভূষণেরও থমকে নেই। সমবয়সীদের নানা মন্তব্যে মাঝে মাঝে তারও অপমানবোধ জাগে। এ বয়সে পড়তে হলে তাকেও বড় ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে। ভেবে ভেবে একদিন মাকে বলল ইচ্ছেটা। বড়ছেলেই যদি মুখ্যু হয়ে থাকে পরের কটির দশা কী হবে! মার মনেও দুঃখ ছিল। অনেক ভেবে তিনিও তাঁর হাতে যা পয়সা-কড়ি ছিল, লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য করে সব ছেলের সাজিমাটি দিয়ে কাচা কাপড়ে বেঁধে পাঠিয়ে দিলেন। বিভূতিভূষণও আড়াই ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে বনগাঁয়ে বড় ইস্কুলের সামনে হাজির।

কোথায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাঁঠালতলা, হরিপোড়োর মুদি-কাম-পাঠশালা, গগন পালের ইউ পি। এ যে দেখি ইলাহি ব্যাপার। এল-এর মতো প্যাঁচমারা বিরাট বাড়িটার কোন ঘরে যাবে? সে শুনেছে আগে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি পরীক্ষা করবেন। উৎরোলে কেরানির কাছে টাকা পয়সা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে তবে ভরতি। ভয় পেয়ে গেল। স্কুল বাড়িটার বাইরে থেকেই কয়েকবার চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরে এল। দু'দুবার এমনি ফিরে এসে তৃতীয় দিন মরিয়া হয়ে হাজির। সেটা আগস্ট মাস। বর্ষাকাল। স্কুলের কাছে পৌঁছতেই ঝমঝম বৃষ্টি। দুগ্‌গা বলে স্কুলের বারান্দায় উঠে পড়ল। ক্লাস ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। বাইরে কে দাঁড়িয়ে? চশমা চোখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন,— ক্লাসে না গিয়ে এখানে কী করছ?

—হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব। ঢোক গিলে কোনওরকমে কথাটা বলে ফেলল বিভূতি।

—কেন কী দরকার?

স্কুলে ভরতি হওয়ার আগ্রহ-আকুতি ওর মুখে শুনতে শুনতে বোধহয় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন হেডমাস্টার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—তা বছরের মাঝখানে ভরতি হয়ে কি চালাতে পারবে? তোমার সঙ্গে বড় কেউ আসেনি, বাবা, দাদা?

—বাবা বাইরে। আর বড় কেউ নেই, আমিই বড়।

চারুচন্দ্র তাকে ভেতরে নিয়ে করণিকের কাছে হাজির করলেন, এর কত লাগবে দেখে ভরতি করে নিন।

কাপড়ের খুঁট খুলে সব টাকা রাখল বিভূতি। করণিক টাকাটা দুবার গুণে চশমা তুললেন, আর কোথায়?

আর তো নেই! বিভূতির মুখ রক্তশূন্য।

কী ব্যাপার? চারুবাবু এগিয়ে এলেন। দেখলেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য করে আনা সিঁদুরমাখা টাকা! বললেন, ঠিক আছে। যা কম পড়েছে আমি দেখব। তুমি আজ থেকেই ক্লাস শুরু করে দাও।

সরস্বতীর কমলবনে ভীরু পায়ে যে দরিদ্র কিশোর উৎসুক, উন্মুখ হয়ে সর্বস্ব সমর্পণ করে আজ প্রবেশ করতে চাইছে, আদর্শ শিক্ষক চারুচন্দ্র তাকে ফেরাতে পারেন না। বিভূতি তাঁকে প্রণাম করল। ঠিক প্রণাম নয়, দেহমন যেন তার লুটিয়ে পড়ল ওই প্রবীণ গুরুর পবিত্র চরণাশ্রয়ে। বাইরে তখনও অঝোর বর্ষণ। চারুবাবুর নির্দেশে দফতরির পিছন-পিছন সে পৌঁছল পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ তখনকার সিক্সথ ক্লাস 'বি' সেকশনে। তারিখটা পাঁচ আগস্ট, উনিশ-শ আট।

বছরের মাঝখানে ভরতি হয়েও পরীক্ষায় প্রথম হল বিভূতি। কিন্তু মুশকিল হল, প্রায়ই দেরিতে পৌঁছয় স্কুলে। আড়াই ক্রোশ পথ। তাও অন্যান্য ছাত্রদের কাছে শোনা গেল, বিভূতি তাদের মতো সোজা পথে না এসে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘোরা পথে আসে। বিভূতির বাবাকে দেখা করতে বললেন চারুবাবু। মহানন্দ সব শুনে বললেন, তাই তো! ওকে বোর্ডিং-এ রাখতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ফি যে মাসিক পাঁচ-পাচটা টাকা! মহানন্দ হতাশভাবে তাকালেন। চারুবাবু বুঝতে পেরেছেন। তিনি মহানন্দর হাতদুটি ধরে বললেন, আপনার অবস্থা আমি জানি, শাস্ত্রীমশাই। বিপত্নীক চারুচন্দ্র পুত্র কৃষ্ণপ্রসন্নকে নিয়ে এই বোর্ডিং-এই থাকেন। বললেন, আপনার বিভূতি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

বারাকপুরের পাঠ তুলে বনগাঁর বোর্ডিং-এ চলে এল বিভূতিভূষণ।

সেবার আড়ংঘাটার কথকতার আসর খেকে ধুম জ্বর নিয়ে টলতে টলতে বাড়ি এলেন মহানন্দ। মৃণালিনীর কাঁধে ভর দিয়ে দাওয়ায় উঠেই আচ্ছন্নের মতো বললেন, খোকা, খোকা কোথায়? ছোট ছেলে নুটুকে বনগাঁ বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিলেন। বড় ছেলে এলো। ওষুধ-ডাক্তার ব্যর্থ হল। একটা অসহায় পরিবারকে হালভাঙা নৌকোর মতো ইছামতীর তীরে ফেলে রেখে কাণ্ডারী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিলেন। এটা বাংলা সন তেরো-শ' আঠারো।

কথক ঠাকুরের ভিটে শূন্য হল। মৃণালিনী

স্বজন-পরিজনদের সঙ্গে বিভূতিভূষণ *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

ছোটদের নিয়ে মুরাতিপুরে বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

ক্লাসে প্রথম হওয়ার সুবাদে মাইনে ফ্রি বিভূতিভূষণের। বোর্ডিং-এর ভার চারুবাবুর। কিন্তু এবার কিছু রোজগারও দরকার। স্থানীয় সরকারি ডাক্তার বিধুভূষণ ব্যানার্জির ছেলে ও মেয়েকে পড়ানোর বাবদে কিছু পয়সার ব্যবস্থা হল। তাতে অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি আটকায়নি। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হল বিভূতিভূষণ। সেটা ইংরেজি উনিশ-শ চোদ্দ সাল। স্কুলের খাতায় উনিশ বছর ছ'মাস হলেও ওর আসল বয়স তখন একুশ।

মৃণালিনী অল্পেতেই খুশি, তুই বরং একটা চাকরি খুঁজে নে খোকা।

কিন্তু বিভূতিভূষণ আর পিছন ফিরবে না। কলকাতায় এসে আর্টস নিয়ে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হল। থাকার ব্যবস্থা ২৪/১ মদনমোহন সেন লেনের মেসবাড়ি। খরচা চালাতে কয়েকটা ট্যুইশানি যোগাড় করে নিল।

এ সময়ই একদিন শুনল, সেন্ট পলস কলেজ হস্টেলে নাকি রবীন্দ্রনাথ আসবেন। বাল্যকাল থেকে ওর কাছে ও-নামে ছিল ইন্দ্রজাল জড়ান। কলেজ কামাই দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কলেজ হস্টেলের সামনে নিজেকে মোতায়েন করল বিভূতিভূষণ। হস্টেলের সামনের মাঠে আয়োজন। লোকে ভরে গিয়েছে মাঠটা। হঠাৎ চাঞ্চল্য। চিড় খেল জমাট ভিড়টা। দীর্ঘদেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্য সুন্দর মূর্তি। কবি এগিয়ে গেলেন. দু-চোখে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টি। বিভূতিভূষণের ভাষাতে 'বক্তৃতা দিতে উঠলেন. কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে উঠলাম। মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনিনি। মনে হল, অসাধারণ, জীবনে এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল যা হাজার লোকের মধ্যে পৃথক করে নেওয়া চলবে। তিনি চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়ে একটা মুদ্রা করে বলছিলেন,— কল্পলোক, কল্পলোক। আর কিছু মনে নেই।'

কলেজে টেস্ট হয়ে গিয়েছে। এবার পরীক্ষার ফি গোনার পালা। বাড়তি টাকা কোথায়! বন্ধুদের পরামর্শে কয়েক জায়গায় গিয়ে ব্যর্থতার পর শেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ। আচার্য রায় এই গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীকে শূন্যহাতে ফেরাননি। সেই থেকে সারাজীবন তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে ছিলেন বিভূতিভূষণ। যথাকালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হলেন বিভূতিভূষণ।

এবার বি.এ. ক্লাস। কিন্তু কী করে চালাবেন? মা মৃণালিনী ছোটদের নিয়ে মুরাতিপুরে মামাদের গলগ্রহ হয়ে আছেন। ভাবনাটা মা মৃণালিনীরও। এমন সময় পানিতর থেকে জমিদার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় এলেন মুরাতিপুরে, বিভূতির সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে গৌরীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তারিণীচরণও এই পানিতর থেকেই এসেছিলেন বারাকপুর। সুতরাং এদের বংশপরিচয় কালীভূষণের জানা। এখন বিভূতি যখন এফ, এ.পাশ করেছে প্রথম বিভাগে, মেধাবী, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আর মাতুলাশ্রয়ে থাকবে না। তিনি প্রস্তাব রাখলেন মৃণালিনীর কাছে।

কালীভূষণ কেবল সম্পন্ন জমিদার নন, পেশায় মোক্তার। তিনি দান চাললেন। মৃণালিনীকে বললেন, আপনার ছেলের পড়াশুনোর ভার আমি নিচ্ছি। আপনি বারাকপুরের ভদ্রাসনে পুত্রবধূ নিয়ে সংসার পাতুন। আপনার ভাইয়েরা তো রইলেনই। তাছাড়া আমিও তো আছি।

কথাটা মনে ধরল মৃণালিনীর। বিভূতিকে

দেশ
শুধু পত্রিকা নয়
এক ঐতিহ্য

বিশেষ আকর্ষণ

● রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের প্রায় একশো অপ্রকাশিত চিঠি। মীরাদেবী-নগেন্দ্রনাথের দুর্ভর দাম্পত্যজীবনের, তাঁদের ছিন্নভিন্ন সংসারের পরিচয় এই পত্রাবলীতে উদ্ঘাটিত।

অপুর পাঁচালি

● চলচ্চিত্রকার হিসাবে আত্মপ্রকাশের সূচনাপর্ব সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের ইতিপূর্বে-অপ্রকাশিত সুদীর্ঘ স্মৃতিকথার শেষ পর্ব : 'অপুর পাঁচালি'।

দীর্ঘ বিতর্ক তোলা রচনা

● সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে অন্তর্ধান ও তিরোধানের মূল কারণ কি গান্ধীজি ? বহু তথ্য ও যুক্তিসহ বিতর্কের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু' রচনায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রন্থিত নাটিকা 'ঢোল কাড়া'

● রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্রের নাটিকা, যা এতকাল লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসংকলন

● জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকলার এক বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন কমল সরকার, সঙ্গে শিল্পকীর্তির সচিত্র বিন্যাস।

সুদীর্ঘ রসরচনা

● বিদ্যাসাগরের দৌলতে লেখক ইন্দ্রমিত্রকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে সুদীর্ঘ মজাদার রসরচনা।

উপন্যাস

বিমল কর
রমাপদ চৌধুরী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মতি নন্দী
আবুল বাশার
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বড় গল্প

শংকর
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সমরেশ মজুমদার

গল্প

অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন, বাণী বসু, হর্ষ দত্ত ও আরও অনেকে।

কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, শামসুর রাহমান, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীল বসু, তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী ও অন্যান্যরা।

অন্যান্য আকর্ষণ

একাধিক সচিত্র প্রবন্ধ ও বহুবর্ণ চিত্র। একটি রামকিঙ্কর অঙ্কিত অপরটি শ্রীশ্রীদুর্গা : প্রাচীন কাঠখোদাই।

প্রচ্ছদ : রামেশ্বর ব্রুটা

শা র দী য়
দেশ
আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভার
১৪০১ ❑ ৬৪ টাকা

Clarion 3A4B04

খবর দেওয়া হল। বাপের বাড়ির লোক দিয়ে কনে দেখা শেষ। মেয়ের নাম গৌরী। সুন্দরী, গৌরবর্ণা মেয়ে। দিনক্ষণ পাকা হল। শুভবিবাহ বাংলা বত্রিশ শ্রাবণ, তেরো-শ' চব্বিশ সন। ইংরেজি উনিশ-শ' সতেরো। বিভূতিভূষণের বয়স তখন তেইশ আর গৌরী চোদ্দ বছরের উনযৌবনা বধূ।

প্রতি শনিবার কলেজ ছুটির পরে বনগাঁর ট্রেনে বাড়ি আসতে রাত হয়ে যায়। ততক্ষণে মৃণালিনীর বিছানায় গৌরী ঘুমে কাদা। সে রাতে আর পায় না বউকে। পরদিন, শাশুড়ির আর ননদদের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারে না গৌরী। লম্বা ঘোমটা টেনে সামনে দিয়ে চলে যায়। এভাবেই চলছে। তবে পাঠে ফাঁকি নেই বিভূতিভূষণের। ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করলেন। এবার টানা অবসরে বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে গৌরীর মোহময় সান্নিধ্য পেলেন। বিভূতিভূষণ একদিন গৌরীকে বললেন, ভাল পাস করলাম, বল, তোমাকে কী উপহার দেব ? গৌরী বলল, একখানা সুন্দর শাড়ি। দিদিরা গেলেই বলে, দেখি তোর বর তোকে কী দিল ? আমার ভারি লজ্জা করে তখন।

তাই-ই হবে। কলকাতায় এসে কলেজ স্ট্রিটের কমলালয় থেকে সুন্দর চওড়া একখানা কালোপাড় শাড়ি কিনে রাখলেন। পুজোর আগে বাড়ি গিয়ে দেবেন। এদিকে দর্শন নিয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলেন। মোক্তার শ্বশুরের ইচ্ছানুযায়ী আর একটা উপসর্গ জোটালেন, ল' ক্লাস। মেসসঙ্গী বৃন্দাবন সিংহরায় সে বছরই আইন পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বইগুলি দিয়ে দিলেন ওকে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলেন। শাড়িখানা লুকিয়ে দিলেন গৌরীকে। শাড়ি পেয়ে ভারি খুশি সে। বিভূতিভূষণ ভাবছেন এবার ছুটিতে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যাবে গৌরীকে। এমন সময় পানিতর থেকে লোক এলো, জমিদার কালীভূষণের বাড়ির বিরাট পুজো। এ সময় সবাই আসবে। মেয়ে-জামাইকেও নিতে এসেছেন তাঁরা।

সে কী, মৃণালিনী অবাক। পুজোগণ্ডার দিনে ওরা থাকবে দূরে। কিন্তু বড়লোক 'বেয়াই, তার ওপরে কথা চলে না। মৃণালিনী ব্যথিত। ক্ষুব্ধ বিভূতিভূষণ বললেন, ওকে যেতে দাও মা। আমি যাবো না। ছেলেকে নিয়েই খুশি থাক মা।

বেচারি গৌরী, কে নেয় তার মনের খবর ! বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে চোখের জলে পানিতরের উদ্দেশে গৌরীর নৌকো ভাসল ইছামতীর জলে।

বড় বোন আশালতা গৌরীকে পাকড়াও

বিভূতিভূষণ ও রমা দেবী। ঘাটশিলা ১৯৪৭ *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

করল, দেখি তোর বর পুজোয় তোকে কী দিল। এবার সগর্বে বোনেদের সামনে সে মেলে ধরল শাড়িখানা। ওরা হেসেই কুটিপাটি। এ-মা, নতুন বউকে কিনা কালো পাড়ের শাড়ি !

অভিমান হল গৌরীর। বেশ করেছে, দিয়েছে। কালোপাড় আমিই চেয়েছিলাম। অপমানে বিভূতিভূষণকে চিঠি পাঠালেন— আপনি এসে আমাকে নিয়ে যান।

গৌরীর চিঠি ! বিভূতিভূষণ গেলেন। আদর যত্ন পেলেন ; কিন্তু মেয়েকে তাঁরা দিলেন না। লক্ষ্মীপুজো কেটে যাক। তার পরে পাঠাবেন। আহত বিভূতিভূষণ ফিরে এলেন। মৃণালিনী সান্ত্বনা দিলেন, বউমা ছেলেমানুষ, ওর পরে তুই রাগ করিসনে খোকা।

দুর্গাপূজা শেষ। লক্ষ্মীপূজাও এলো— চলে গেল। মনের দুঃখ চেপে মৃণালিনী মেয়েদের নিয়ে কোজাগরীর আল্পনা দিলেন সারা দাওয়ায়। পানিতর থেকে কোনও খবরও নেই। খবর যখন এলো, এলো একেবারে ঝড়ের মতো। বিভূতিভূষণের শাশুড়ির বাড়াবাড়ি অবস্থা। জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।

সেবার বাংলা দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো একটা নতুন রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। যাকে ধরছে, আর ছাড়ছে না।

উদ্বিগ্ন মৃণালিনী বললেন, খোকা, আর দেরি করিসনে।

লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন বিভূতিভূষণ।

জমিদার বাড়ির সেই বড় দীঘি। কিন্তু ওর পারে এত লোক কেন ? একটা চাপা কান্নার রোল ভেসে আসছে না ? পা-দুটো ভারি হয়ে উঠল বিভূতিভূষণের। বড় শ্যালক ভবানীপ্রসাদ এগিয়ে এলো। সারামুখে কালি, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। বিভূতিভূষণের হাতদুটো ধরে হাউহাউ করে

কেঁদে উঠলেন, বড় দেরি করে এলে ভাই।

ভিড় সরে গেল। বিভূতিভূষণ দেখলেন, পাশাপাশি দুটি প্রাণহীন দেহ— মা আর মেয়ে। বিভূতিভূষণের শাশুড়ি কামিনী দেবী। আর তার গৌরী। তাঁর দেওয়া সেই কালোপাড় শাড়িখানা পরে আছে গৌরী! সে নিয়ে যাবে বলে পথ চেয়ে চেয়ে যেন অভিমানে ক্লান্ত কিশোরী ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা বাংলা ছয় অগ্রহায়ণ, তেরো-শ' পঁচিশ সন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার আঘাত। ভাটপাড়ায় সন্তান হতে গিয়ে ছোট বোন মণির মৃত্যু হয়েছে। গৌরীর খেলার সাথী ছিল সে। বছর দেড়েক আগে বিয়ে হয়েছে। আগেই বিয়ে হয়েছিল বড় বোন জাহ্নবীর। মৃণালিনী ভেঙে পড়লেন। প্রায় পাগল হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ। মনের এ অবস্থায় আর পড়াশুনো কিছুই ভাল লাগছে না। ঘুরতে ঘুরতে কলেজ স্কোয়ারেই সন্ধান পেয়ে গেলেন থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির। অ্যানি বেসান্ত এর প্রতিষ্ঠাতা। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনিও স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ-পথ ধরেন। কেবল তাই নয়— প্ল্যানচেটে স্ত্রীর আত্মা কাছে আনার ক্ষমতাও নাকি আয়ত্ত করেন। লেগে গেলেন বিভূতিভূষণও।

এমন সময় একদিন বৃন্দাবন সিংহ রায় মেসে এসে হাজির। আইন পরীক্ষা দিয়ে তিনি তাঁর গ্রাম, হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় চলে যান। সেখানে একটি স্কুলে অস্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষকের ভার নিয়েছেন। তখনও দশম শ্রেণী পর্যন্ত হয়নি। চেষ্টা চলছে। বিভূতিভূষণকে তিনি সেখানে নিয়ে গেলেন শিক্ষকতার জন্য। স্কুলের সভাপতি শশিভূষণ দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল, সঙ্গে তাঁর ছেলে-মেয়েদের পড়ান। পঞ্চাশ টাকা বেতনে সহকারী প্রধান শিক্ষক রূপে সাত ফেব্রুয়ারি, উনিশশ' উনিশ তারিখে তিনি কাজে যোগ দিলেন।

বৃন্দাবনবাবু স্কুলের কাজ ছেড়ে ওকালতি ব্যবসায় যেতে চান। তাঁর ইচ্ছে সেখানে বাবু বিভূতিভূষণকে বসাবেন। কিন্তু ততোদিনে আর একজন দাবিদার এসেছেন। এই গ্রামেরই লোক রজকুমার ভড় এম.এ। স্কুল কমিটি সিদ্ধান্ত করল, বৃন্দাবনবাবু যখন কাজ ছেড়ে দিতে চাইছেন সেক্ষেত্রে বাবু রাজকুমার ভড় এম.এ.-কে প্রধান শিক্ষক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হোক। অতঃপর বৃন্দাবনবাবু যে ক'দিন থাকবেন অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক রূপে গণ্য হবেন। অপমানাহত বৃন্দাবনবাবু পদত্যাগ করলেন। বিভূতিভূষণ কী করবেন? সে জন্য অবশ্য তাকে ভাবতে হল না। স্কুল বাড়িতে সন্ধ্যার পর কয়েকদিন, তিনি প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছিলেন। এই নিয়ে কথা উঠল— মাস্টার স্কুলে ভূত-পেত্নীর কারবার করেন। রাজকুমারবাবুও ওকে পথের কাঁটা মনে করছিলেন। তাঁর সুপারিশে স্কুল কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন, 'বাবু বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি আনস্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যাজ এ টিচার। সো, হি শুড বি রিমুভড ফ্রম দি টিচিং স্টাফ।' — উনিশ-শ' একুশের এক ফেব্রুয়ারিতে জাঙ্গিপাড়া যাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিল, আজ একবছর পরে বিশ ফেব্রুয়ারি উনিশ-শ' বিশ, তাঁকে বিদায় করে দিল।

কলকাতা এসেই দেখা করলেন আচার্য রায়ের সঙ্গে। যাবার সময় তাঁকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। তিনিও আশীর্বাদ করেছিলেন। এবার দুঃখের কথা জানালেন। আচার্য রায় তাঁকে ভেঙে না পড়তে বললেন। তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র চারুকে খবর দিলেন। আচার্য রায়ের ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন স্ব-গ্রাম হরিনাভি অ্যাঙলো স্যান্সক্রিট ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি। তাঁকে বললেন, ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করতে। আচার্য রায়ের ইচ্ছের কথা জানিয়ে তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল কমিটির সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন। আচার্য রায়ের সুপারিশ, এ নিয়ে আর কথা উঠতে পারে না। স্কুল কমিটির বৈঠক বসল উনিশ-শ বিশ-এর বিশে জুন। সিদ্ধান্ত হল, জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে বিভূতিভূষণ স্কুলে যোগ দেবেন। প্রারম্ভিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। বছরে দু-টাকা করে বেড়ে ষাট টাকা পর্যন্ত দাঁড়াবে। নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিল স্কুল কমিটি। শিয়ালদা সাউথ সেকশন থেকে ট্রেনে করে সোনারপুর নেমে রাজপুরের মধ্য দিয়ে দেড় ক্রোশ হেঁটে পয়লা জুলাই শুক্রবার সরাসরি স্কুলে এসে যোগ দিলেন বিভূতিভূষণ।

ভিড় সরে গেল। বিভূতিভূষণ দেখলেন, পাশাপাশি দুটি প্রাণহীন দেহ— মা আর মেয়ে। বিভূতিভূষণের শাশুড়ি কামিনী দেবী। আর তাঁর গৌরী। তাঁর দেওয়া সেই কালোপাড় শাড়িখানা পরে আছে গৌরী! সে নিয়ে যাবে বলে পথ চেয়ে চেয়ে যেন অভিমানে ক্লান্ত কিশোরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রধান শিক্ষক কিশোরীলাল ভাদুড়ি। সহকারী প্রধানশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র লাহিড়ি তাঁর রাজপুরের বাড়িতে ওকে নিয়ে গেলেন। আপাতত সেখানেই থাকবেন।

রাজপুরে প্রধান শিক্ষক কিশোরীবাবুর শ্বশুর নগেন বাগচির খালি বাড়িটা পড়ে আছে। তাঁর ব্যবস্থায় ক'দিন পরে সেখানেই আবাস করলেন বিভূতিভূষণ। নিজে কোনওদিন রান্না শেখেননি। জ্ঞানবাবুর বড় ভাইয়ের বউ নিভাননী একদিন খোঁজ করতে গিয়ে রান্নার ছিরি দেখে অবাক। ক'দিনের এই আত্মভোলা মানুষটির ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে এসে সব গুছিয়ে দেয়। আর বলে, এবার মাকে নিয়ে আসুন। তাঁর পীড়াপীড়িতেই মায়ের ভিটে ছাড়তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ তাঁকে আনলেন এখানে। মৃণালিনী চেয়েছিলেন ছেলেকে আবার বিয়ে দিয়ে থিতু করতে। ছেলে নারাজ, গৌরীকে সে ভুলতে পারে না। অগত্যা মৃণালিনীকেই ছেলের ঘর গোছাতে হয়। নুটুও সঙ্গে এসেছে।

বেশ চলছিল। স্কুলশেষে গাছপালার জগৎ ঘুরে এসে একদিন বিভূতিভূষণ দেখেন, মা জ্বরে কাঁপছেন। প্রথমটায় ভেবেছিলেন, দু-চার দিনেই কমে যাবে। ক্রমে বাড়াবাড়ি হল। ডাক্তার এসে বললেন, টাইফয়েড। তখনকার অন্যতম কালান্তক রোগ।

জ্ঞানবাবুর ভ্রাতৃবধূ নিভাননীর নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তিনিই চাপ দিয়ে বিভূতিভূষণের মাকে এখানে আনিয়েছিলেন। নিভাননী আর তাঁর ষোড়শী কন্যা ফুলি— অন্নপূর্ণা এসে শুশ্রূষার কাজে হাত লাগালেন। কিছুতেই কিছু হল না। আক্রমণের সাতদিনের মাথায় এক মধ্যযামে বড়ছেলের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন মা মৃণালিনী। এটা উনিশ-শ' একুশের সেপ্টেম্বর।

সামনে নুটুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, তাকে বনগাঁ স্কুল বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। নগেন বাগচির বাড়িটা মায়ের স্মৃতিভারে মন্থর। বাড়িটা বদলে সত্য মজুমদারদের পড়ো বাড়িটার বাইরের ঘরে এসে উঠলেন। উদ্‌ভ্রান্ত মন শান্তি পায় কিছুটা প্রকৃতির রাজ্যে। আমবাগান, জামবাগান, লিচুবাগান, পেয়ারার বন, পদ্মপুকুর, পানাশেতলা, কচুরিফুল, কলমিদামের কোল ঘেঁষা পথ দিয়ে চলতে ভাল লাগে তাঁর। ভাল লাগে কঞ্চি দিয়ে গুলঞ্চের ঝাড়ে সাড়া জাগাতে, মন ভুলে যায় গ্রীষ্মদিনে ফোটা থলো থলো সাদা আকন্দের শোভায়। ঘেঁটুবনের রূপবিতানে, গোঁড়

লেবুর গন্ধমাতাল পথে পথে চলতে। কলাবন, বাঁশ বাগান, পক্ষী কাকলি মুখর এ এক আশ্চর্য নিশ্চিন্দিপুর।

মৃণালিনীর প্রবাস-মৃত্যু আর বিভূতিভূষণের এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিভাননীকে এক অপরাধবোধে আক্রান্ত করে। তাঁরও মায়া পড়ে গিয়েছে মাস্টারের প্রতি। সুযোগ পেলেই রান্নাবান্নায় সাহায্য করে যান। মেয়ে ফুলি এসে জামা-কাপড় কেচে দেয়।

জ্ঞানবাবুর বাড়িতে ক'দিন থেকে বিভূতিভূষণ বুঝেছিলেন, এই নারীর জীবনেও গোপন দুঃখ আছে। স্বামী হরিমোহন লাহিড়ি বাইরে থাকেন। রোজগার যৎসামান্য, তেমন টাকা পাঠাতে পারেন না যৌথ সংসারে। ফলে, নিভাননীরা দিনরাত যতই খাটুন, উপেক্ষিতা। তাঁকে নিয়েই কলম ধরলেন বিভূতিভূষণ। জীবনের প্রথম গল্প।

ইচ্ছে ছিল 'ভারতবর্ষ' কাগজে দিয়ে দেখবেন লেখাটা। কিন্তু শিয়ালদায় নেমে কাছেই 'প্রবাসী' অফিস পেয়ে গেলেন। সেখানেই জমা দিলেন।

ক'দিন বাদেই ফেরত এলো লেখাটা। ফলে ভেঙে পড়ছিলেন প্রায় বিভূতিভূষণ। কিন্তু সঙ্গের চিঠিখানি পড়েই বিস্মিত। জানানো হয়েছে, গল্পটি তাঁরা ছাপবেন, তবে সামান্য অদল-বদল করে পাঠাতে হবে। কী অদল-বদল বিভূতিভূষণ তা বলেননি। তবে তার বিবরণ জানিয়েছেন তাঁর পাণ্ডুলিপির একমাত্র পাঠক, বিভূতিভূষণের অনুগত চ্যালা পাঁচু, যতীন রায়। গল্পের নায়িকা ছিলেন 'দিদি', তাকে করা হল 'বউদি', আর নামটি 'পূজনীয়া' বদলে হল— 'উপেক্ষিতা'। বাংলা সন তেরো-শ' আঠাশ, মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। মাঘ সংখ্যার ইংরেজি প্রকাশকাল— চোদ্দ জানুয়ারি, উনিশ-শ বাইশ। সাহিত্যের কমলবনে এই তাঁর প্রথম প্রবেশ। একটা নতুন জগৎ যেন রঙিন হয়ে আসে তাঁকে ঘিরে।

এদিকে গ্রামে কিন্তু অন্য রকম একটা গুঞ্জন উঠেছে। দাবার আড্ডায়, চণ্ডীমণ্ডপে, পঞ্চাননতলায় উপেক্ষিতার নায়িকা সম্পর্কে নানা গবেষণা। নায়ক তো মাস্টার নিজেই, তবে নায়িকাটিকে ? চেনা চেনা লাগছে যেন ! হরিমোহনের স্ত্রী না ? ছি, ছি, গ্রামের বউ-ঝিদের নিয়ে কেচ্ছা।

কথাটা জ্ঞানবাবুর কানেও গেল। প্রধানশিক্ষক কিশোরীবাবু নিজেই কথাটা তুললেন তাঁর কাছে। তিনিও অস্বস্তি বোধ করছেন। দাদা হরিমোহন গ্রামে ফিরতেই জ্ঞানবাবু অবস্থাটা জানালেন তাঁকে। হরিমোহন বিব্রত।

পুত্র তারাদাস ও স্ত্রী রমা দেবীর সঙ্গে। ঘাটশিলা ১৯৪৯ *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

বনবাদাড়ে ঘোরা বিভূতিভূষণ এ সবের কোন খবরই রাখেন না। 'প্রবাসী' তাঁর কাছে আরও লেখা চেয়েছে। পাঠালেন দ্বিতীয় গল্প—উমারাণী। বিজ্ঞাপন বেরুতেই গ্রামে আবার চাঞ্চল্য, মাস্টার আবার কাকে নিয়ে ফাঁদল হে !

আবার কাকে, আগে মাকে, এবার মেয়েকে নিয়ে। তা বাইরের লোক, আমাদের গ্রাম সমাজের মান ইজ্জত নিয়ে তার বালাই কী ? একে এবার বিদেয় করলে হয় না ! গাঁয়েরই পাঁচজন সরাসরি প্রধান শিক্ষকের কাছে পেশ করল কথাটা। অসহায় বোধ করে তিনি, একদিন বিভূতিভূষণকেই সমস্যাটার কথা বললেন। বিভূতিভূষণ প্রশ্ন করলেন, লেখাটা আপনি পড়েছেন ?

কিশোরীবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমি তো তেমন কিছু পাইনি। তবে গাঁয়ের পাঁচজন তো আর পড়ে বলবে না, গুজবে মাতছে। যা হোক আপনিই এবার ভেবে একটা ঠিক করুন কী করবেন।

কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন বিভূতিভূষণ। তাঁর শৈশবপাঠ্য মাধবী কঙ্কণের পরিচ্ছেদ শিরোনামে সুরের কলিটি মনে পড়ল—'গো হোয়ার গ্লোরি ওয়েটস দী।' বিদায় হরিনাভি ! সতের জুলাই, উনিশ-শ' বাইশ।

মির্জাপুরের মেসবাড়ির সিঁড়িতেই একেবারে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মুখোমুখি। রিপনের দুই সহপাঠী। নীরদচন্দ্র বয়সে ওঁর চাইতে কয়েক বছরের ছোট। কিন্তু ওই বেঁটে মানুষটির জ্ঞানের দৈর্ঘ্যে মুগ্ধ বিভূতিভূষণ। নীরদ ইতিমধ্যেই প্রবাসীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ওঁর লেখার দারুণ প্রশংসা করলেন। কিন্তু ওই লেখার জন্য কী খেসারত দিতে হল সে কথা বিভূতিভূষণের মুখে শুনলেন। তবু বললেন,

অগ্রাহ্য করুন ও সব। চালিয়ে যান লেখা। এটাই আপনার পথ।

কিন্তু মেসের খরচা, নুটুর পড়ার ব্যবস্থা? সে ম্যাট্রিক পাস করে ডাক্তারিতে ভরতি হয়েছে। ছয় মাসের জন্য পোদ্দারদের গোরক্ষিণী সভার প্রচারকের কাজ নিয়ে গোটা পূর্ববঙ্গ ঘুরে এলেন। এবার! খবরের কাগজে একটা মোটা বেতনের প্রাইভেট ট্যুইশানির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলেন। পেয়েও গেলেন কাজটা। উনিশ-শ' তেইশ, জানুয়ারির প্রথমদিনে গৃহশিক্ষক রূপে খেলাতচন্দ্র ঘোষের পাথুরেঘাটার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন বিভূতিভূষণ।

এখানে পড়ানর ফাঁকে একটা জিনিস তাঁকে আকৃষ্ট করে। ভাগলপুরে ওঁদের বিরাট জঙ্গলমহাল। সেখান থেকে লোক আসে আরণ্য পরিবেশের গন্ধ-কাহিনী নিয়ে। গৃহস্বামী সিদ্ধেশ্বরবাবুও লক্ষ্য করেছেন জঙ্গলের প্রতি শিক্ষকের আকর্ষণটা। সুপারিনটেনডেন্ট সারদাকান্ত চক্রবর্তী কিছুদিন ধরেই একজন বিশ্বস্ত সহকারী সুপার চাইছেন। প্রস্তাবটা তিনি মাস্টারের কাছে পেশ করলেন, গেলে দেড়শ টাকা বেতন। এক বাক্যে প্রস্তাবটা লুফে নিলেন বিভূতিভূষণ। উনিশ-শ চব্বিশের শেষ জানুয়ারিতে ভাগলপুরে এসে নামলেন তিনি জঙ্গল মহালের কাজ নিয়ে।

ভাগলপুর শহরে ঘোষেদের জঙ্গলমহালের দোতলা সদর কাছাড়ি বাড়ি 'বড় বাসা'য় উঠলেন প্রথমে। সেখান থেকে তাঁকে যেতে হল শহর থেকে প্রায় পনেরো ক্রোশ দূরে ডেরা ইসমাইলপুরে, জঙ্গলের অভ্যন্তরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়ালের কাছারিতে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া, লবটুলিয়া, নাড়াবইহার, আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এই জঙ্গল মহাল। দিগ্ দেশহারা অরণ্যপ্রান্তর, দূরবিসর্পী শৈলশ্রেণী। জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী দেহাতী জনশ্রেণী। শহরের লোক দু'দিনেই দুত্তোর বলে পালায়। কিন্তু নবাগত সহকারীটির অরণ্যনেশা দেখে সুপারিনটেনডেন্ট সারদাকান্ত তাজ্জব। কাছারির রামজোড় আর ছট্টু সিং ক'দিনের মেহনতে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণকে। দিক-বিদিকে ঘোড়া ছোটান, এক নিবিড় অরণ্যমায়া ধীরে ধীরে তাঁর সামনে যেন ঘোমটা খুলতে লাগল। বিহ্বল তিনি। এ-রূপ যেমন সুন্দর শৌর্যময়, তেমনি ভয়াল, ভীষণ মনে হয়। দিনলিপিতে লেখেন, 'ঘর-দুয়ার বেঁধে যাকে সংসার করতে হবে এ রূপ তার না দেখাই ভাল। প্রকৃতির সে মোহিনী রূপের মায়া মানুষকে ঘর ছাড়া করে।' এদের নিয়ে একটা বড়কিছু লিখবার সংকল্প নেন। কিন্তু তারও আগে যে আর একটা কর্তব্যের হাতছানি তাঁকে ডাকে। রাতে কাছারিতে বসে দিনলিপি লিখতে লিখতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে 'বারাকপুরের ছায়াগহন বনকুঞ্জে এখন হয়ত কাকজঙ্ঘার থলো-থলো রাঙা ফল দুলছে। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে বনশিম তলা।' মনে পড়ে, 'দূরে আমাদের বাড়ি। মা'র সঞ্চিত হাঁড়ি-কলসিগুলো পড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মা'র হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে ফুলে ফুলে ভরতি হয়ে উঠেছে।' সুদূর ইছামতী স্পষ্ট হয়। তীরের বনঝোপের মধ্যে দেখতে পান কঞ্চি হাতে এক কিশোরকে। চমকে ওঠেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, বারাকপুরের এই সন্তানটিকে ধরতে হবে লেখায়। সবুজে ডোবা এই গ্রামটি, তার মাঝে মহানন্দ-মৃণালিনীর সুখদঃখের সংসার— সব নিয়ে সে বই করবে।

ভাবনাটা আরও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে ভাগলপুরের 'বড়বাসা'য় এলে। অদূরেই আদমপুরে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়দের প্রবাস ভবন। এখানে থেকেই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত রচিত। আজও ভাগলপুর-প্রবাসী সাহিত্যরসিকদের নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় সাহিত্য-আড্ডার শতরঞ্জি পড়ে তাদের বৈঠকখানায়। দ্বিধাগ্রস্তভাবে এক সন্ধ্যায় সেখানে হাজির হলেন। আসরটিও সানন্দে গ্রহণ করল তাঁকে। উপেন্দ্রনাথের কথায়—'একটি খাঁটি সাহিত্যানুরাগীর শিশুর মত সরল মন দেখে মুগ্ধ হলাম। এক বৈঠকেই আলাপ ঘনীভূত হল। তার ফলে অবিলম্বে তাঁকে আমাদের দলে ভরতি করে নিলাম।'

এখানে বসেই তিনি শুনতে পেলেন, উপেন্দ্রনাথ একটি সাহিত্য-মাসিক বার করার তোড়জোড় করছেন। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে নামও ঠিক হয়েছে 'বিচিত্রা'। এতে আকৃষ্ট হয়ে বিভূতিভূষণও তাঁর লেখাটা দ্রুততর করলেন। বারাকপুরের পটভূমিতে নিজের পরিবারের সকলকে রেখে লিখেছিলেন প্রথমে। পরে রিকাস্ট করে দুর্গা চরিত্রটিকে ঢোকালেন। বইটির নাম দিলেন 'পথের পাঁচালী।' মাঝেমাঝে এসে উপেন্দ্রনাথদের শোনান। তাঁদেরও ভালো লাগছে। উপেন্দ্রনাথই বিচিত্রায় ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপি চেয়ে নেন। তেরো-শ' পঁয়ত্রিশ বিচিত্রার দ্বিতীয়বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে পথের পাঁচালী প্রকাশ শুরু। পনের কিস্তিতে শেষ।

তখনকার দিনে 'বিচিত্রা'য় কিছু বেরোন মানেই বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার। বিদগ্ধমহলে তা আলোড়ন তোলে। যে-সংখ্যা থেকে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বেরোতে শুরু করে সেই সংখ্যাটির দিকে তাকালেই আমরা পত্রিকাটির মান বুঝতে পারব। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা—সুসময়। চলছে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'যোগাযোগ'। কবির রম্যরচনা 'তেল আর আলো।' আরও আছে—ভানুসিংহের পত্রাবলী। বেরোচ্ছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে।' লিখছেন ওই কাগজে শরৎচন্দ্রও। সেইখানে বিভূতিভূষণ স্থান করে নিলেন। সহজেই মননজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। আসতে লাগল অজস্র প্রশংসা।

কিন্তু হলে কী হবে? এবার এগুলিকে গুছিয়ে যে বই করা দরকার। কিন্তু প্রকাশকরা কেউ 'রা' কাড়ছেন না। কেউ নাম শুনেই বলছে, তা গাঁটের কড়ি খরচা করে কে আর পাঁচালী ছাপতে যায় বলুন। কাউকে যদি অনুরোধ করা যায়, একবার পড়ে দেখুন না। জবাব আসে, জানি অনেক গাছ-পালার খবর আছে, ওটা বটানির বই। আমরা ছাপি না। কেউ বা বলেন, প্রেম নেই, সেক্স নেই, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, খুনজখম কিস্যু নেই, দুর মশাই।

বিভূতিভূষণ ভেঙে পড়লেন। কিন্তু বন্ধু নীরদচন্দ্র সহজে মচকাবার লোক নন। তিনি বিচিত্রার কপিগুলি নিয়ে প্রবাসীর সাহিত্য-আড্ডায় হাজির। উপস্থিত সাহিত্যিকদের কথাবার্তার মধ্যে সজনীকান্ত দাস গুম মেরে সব শুনলেন, কপিগুলি সব চেয়ে নিলেন নীরদচন্দ্রের কাছ থেকে। সারা রাত ধরে পড়লেন। তিনি মুগ্ধ। পরে এ সম্পর্কে তিনি 'আত্মস্মৃতি'-তে লিখছেন—'বেশ বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে।...উত্তেজনায় সে রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র কাটিল।' পরদিন সজনীকান্ত নিজেই প্রকাশন সংস্থা করে ছাপার প্রস্তাব দিলেন। তবে কিছু অর্থের দরকার। চাঁদা তোলা যায় না?

গোপাল হালদারের বাবা তখন ফেনীতে ঋণদান অফিসের প্রধান। তিনি বললেন। চাঁদার দরকার নেই। আমি সেখান থেকেই ব্যবস্থা করব। তাই হল। ছাপা শুরু। সজনীকান্ত, নীরদচন্দ্র, বিভূতিভূষণ তিনজন মিলে প্রুফ দেখছেন। বই প্রকাশিত হল দোসরা অক্টোবর, বুধবার, উনিশ-শ' উনত্রিশ সাল, মহালয়ার দিনে।

ভাগলপুরে আর যেতে পারছেন না। সমস্যাটা সিদ্ধেশ্বরবাবুকে বলতেই তিনি বুঝলেন। তিনিও ওঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর পিতামহর নামে ধর্মতলায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা

সুবর্ণরেখার বুকে পঞ্চপাণ্ডব শিলায় বসে আছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর ডানদিকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বামে বিভূতি দত্ত *গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে*

করেছেন,—খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন। সেখানেই শিক্ষকতায় নিয়োগ করলেন তিনি বিভূতিভূষণকে।

পথের পাঁচালী এবার হয়ে উঠল সারা বঙ্গদেশের আলোচ্য। অনেকেই কিশোর নায়ক অপুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন দেখতে শুরু করেছেন। আর লেখক তো স্বয়ং অপু। কথাটা মিথ্যেও ছিল না। বিভূতিভূষণের নিজেরই স্বীকৃতি, 'অপু—অপূর্ব, সে ছিল অনেকখানিই আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো। সর্বজয়ার মধ্যেও আমার মায়ের একটা অস্পষ্ট রূপ রয়েছে।' ইন্দির ঠাকুরণের মধ্যে আছেন মেনকা পিসি। হরিহরের মধ্যে পিতা মহানন্দ। দিনলিপির সাক্ষ্য—'বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।'

পথের পাঁচালীর জনপ্রিয়তার তরঙ্গে এবার কেবল এগিয়ে চলা। প্রবাসীতে পরপর বেরোল ওই বইয়ের সম্পূরক গ্রন্থ—দুইখণ্ডে অপরাজিত।'

এর ফাঁকে 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী'-তে মেঘমল্লারের ন্যায় অনেক গল্প বের হয়। 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিক বের হয় দৃষ্টিপ্রদীপ। সরাসরি প্রকাশকরাও নিয়ে যান বই। বেরোয় 'দেবযান', ভাগলপুরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আরণ্যক', পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের কাহিনী 'অভিযাত্রিক'—চলছেই ক্লান্তিহীন।

এ সময় বেশ কিছু নারীচরিত্র তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রোমাঞ্চের বেশ স্পর্শও বুঝি লাগে। বিশেষ করে সুপ্রভা নামে একটি বিদূষী মেয়ে, পরবর্তীকালে কলকাতার এক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এবং নিজগ্রাম বারাকপুরের খুকু—অন্নপূর্ণা নামে সাধারণ একটি মেয়ে দীর্ঘকাল রঙিন করে রেখেছিল বিভূতিভূষণের চিত্তলোককে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গৌরীর স্মৃতি তাঁকে মন্থর করে বারে বারে, তিনি এগোতে পারেন না। ছোটভাই নুটুর বিয়ে দিয়েছেন। সে ডাক্তারি পাস করেছে। ঘাটশিলায় বেড়াতে গিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে ডাহিগড়ায় শালবন ঘেরা একটি কোঠাবাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেললেন। নাম দিলেন 'গৌরীকুঞ্জ।' নুটুকে প্রাকটিসের জন্য সেইখানে থিতু করলেন। চার দিকে অরণ্য পাহাড়। নিজেও মাঝে মাঝেই যান। বনকর্মীদের ট্রাকে চারদিক ঘোরেন। এখানেই বিহার সরকারের পরবর্তী চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট যোগীন্দ্রনাথ সিংহর সঙ্গে হৃদ্যতা। তাঁর সুবাদে কেবল এই অঞ্চলের অরণ্য নয়। পরে বিখ্যাত সারান্ডা ফরেস্ট পর্যন্ত ঘুরেছেন।

এদিকে বোন জাহ্নবীর স্বামী কর্ণমূল অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে মারা গেল। হতভাগ্য বোনটাকে দেখতে যান মাঝে মাঝে। একবার গিয়ে লক্ষ করলেন সে দুটি সন্তান—একটি মেয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে একেবারে উপেক্ষিত। বনগাঁয় ঘরভাড়া করে এনে রাখলেন তাদের সেখানে। প্রতি সপ্তাহে কলকাতা থেকে তাদের কাছে আসেন।

এইভাবেই চলছিল। একদিন খেলাত স্কুলে ক্লাস নিচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম। উনিশ-শ' চল্লিশ, একুশ নভেম্বর। বাংলা তিন অগ্রহায়ণ। স্কুল থেকেই বনগাঁর পথে ছুটলেন বিভূতিভূষণ। যখন পৌঁছলেন, বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। স্টেশনে নেমেই শুনলেন, ছোট্ট শহরে, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। বিভূতিভূষণের একমাত্র বর্তে থাকা বোন জাহ্নবী ইছামতীতে নাইতে গিয়েছিল। নদীর ঘাটে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ আর আঁচলের চাবির গোছা পড়ে আছে। জাহ্নবী নেই। মায়ের খোঁজে ন'বছরের উমা আর সাত বছরের

শান্ত 'মা-মা' করে নদীর পাড়ে ছুটছে আর কাঁদছে। ওদের ওই দশা দেখে দু-চার জন করে পাড়া, পরে শহর সুদ্ধ ভেঙে পড়ল ইছামতীর তীরে। বিভূতিভূষণ যখন নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালেন, পাড়ার ছেলেরা ততক্ষণে ইছামতী তোলপাড় করে তীরে উঠেছে। জেলেরা টানা জালে চষে ফেলেছে এপার-ওপার। কিন্তু নদীর নামে নাম সেই মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিল না নদী।

সারা বনগাঁ শহরে সেদিন ওই এক কথা, এক আলোচনা। 'বীণাপাণি' ভবনও তার ব্যতিক্রম নয়। একসাইজ ইনসপেক্টর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে এ বাড়িতে নতুন এসেছেন ভাড়াটে হয়ে। তাঁর বোন নির্মলা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আহা বেচারা বিভূতিবাবু! নিজের নেই চালচুলো, একলা মানুষ, তারওপরে দুটো বাচ্চা রেখে মেয়েটা চলে গেল!

ষোড়শী-কন্যা মায়া-কল্যাণীরা উৎসুক। চালচুলো নেই মানে, তুমি জানো নাকি তাঁকে পিসি?

জানবো না কেন, অতবড় লেখক, এই শহরে কে না জানে তাকে! তা মফঃস্বল শহরে কিছু কিছু ম্যাগাজিন-করা উৎসাহী যুবক থাকে বটে। বালুরঘাট থেকে সদ্য আসা ওদের পক্ষে তাদের খবর জানার কথা নয়। কল্যাণী বলে, কী লেখেন তিনি? নামটি কী বললে?

নির্মলা পিসি অবাক ভাইঝির অজ্ঞতায়। সে, কী! বিভূতি বাঁড়ুজ্যের নাম শুনিসনি! পথের পাঁচালী! বলে, কত নাটক নভেল লিখছেন।

নাটক, নভেল থাক, কিন্তু পথের পাঁচালী! অপু। সেই বিভূতিভূষণ! এই বনগাঁ শহরে, এত কাছে! বিশ্বাস হয় না যেন। কল্যাণী পিসিকে ধরে, চলো না একবার দেখে আসি তাঁকে। পিসি বলে, আজ থাক, সদ্য শোক পেয়েছে লোকটা, দু'দিন জুড়োতে দে।

পাঁচ অঘ্রাণ নির্মলা-পিসির সঙ্গে ষোল বছরের ভাইঝি কল্যাণী চলল পথের পাঁচালী-র বিভূতিভূষণ সন্দর্শনে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল একটি মেয়ে। ফুলো-ফুলো চোখ, উমনো-ঝুমনো চুল, মেয়েটি বলল, আসুন, বড়মামা শুয়ে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

ছোট শান্তকে বুকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। উমার ডাকে বাদামি রঙের একটি চাদর জড়িয়ে উঠে এলেন। দু-হাত জড়ো করে বললেন, নমস্কার, বসুন।

নির্মলাদেবীরা সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বসলেন। একটা স্তব্ধ পরিবেশ। মাতৃহারা দুটি কিশোর-কিশোরী মামার কোলঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তারা বুঝতে পারে না কতখানি সর্বনাশ তাদের ঘটে গেল। মামা ছাড়া কে আছে তাদের এই ত্রিভুবনে! দু'পাশ থেকে তাঁকে ছুঁয়ে আছে দুজনে।

কল্যাণীর কান্না পাচ্ছে এই করুণ দৃশ্যে। উমা-শান্তকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল সে।

নির্মলাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, এদেরও কি কলকাতায় নিয়ে যাবেন?

না। বিভূতিভূষণ বললেন, কলকাতাতেও কেউ নেই আমার। নিজে থাকি মেসে। আমার ছোট ভাই নুটু আছে ঘাটশিলায় বউকে নিয়ে। ভাবছি সেখানেই রেখে আসব। ছুটি পেলেই আগে আসতাম বনগাঁয়, এখন যাবো ঘাটশিলায়। বনগাঁর পাট চুকল।

আর আসবেন না! কল্যাণীর বুঝি বিচলিত প্রশ্ন। ম্লান হাসলেন বিভূতিভূষণ, কার কাছে আসব! আমি যত চাই বনগাঁ আমায় ততই যেন আঘাত দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়।

—কেন, আমরা তো আছি, আমাদের কাছে আসবেন, বলুন আসবেন? কল্যাণীর হৃদয়াবেগ সংযম মানল না।

এত আন্তরিক আহ্বান! বললেন, আসব।

দিদি মায়ার অটোগ্রাফ খাতাখানা সসংকোচে এগিয়ে ধরল ওর কাছে। বিভূতিভূষণ লিখলেন, পথের বাণী— 'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।' —নিচে নিজ স্বাক্ষর।

ঘনিষ্ঠতার সেই সূচনা। ক্রমে আসা-যাওয়ার পালা।

বিভূতি ব্যানার্জি, লেখক? নামটা শুনেই চমকে উঠলেন ষোড়শীকান্তর শ্বশুর সারদাকান্ত চক্রবর্তী। ভাগলপুর কাছারির সেই সুপারিনটেনডেন্ট সারদাকান্তই ষোড়শীকান্তর শ্বশুর। তাঁর সহকারী সুপার ছিলেন বিভূতিভূষণ। লোকটির সম্বন্ধে দারুণ সপ্রশংস সারদাকান্ত। ব্যস সম্পর্কটা অতএব ঘনিষ্ঠতর হতে আর বাধা রইল না। বিভূতিভূষণেরও বড় ছুটিতে যেমন ঘাটশিলা যাওয়া এবং সেখান থেকে যথা ইচ্ছে তথা, তেমনি ছোট ছুটিতে বনগাঁর কল্যাণীদের পান্থশালা। বিকেলটা ওঁকে বনগাঁর শহর প্রান্তের সবুজ হাতছানিতে ডাকে। একটু ঘুরে আসছি কল্যাণী।

কল্যাণী এগিয়ে আসে। এদিক-ওদিক তাকায়। কেউ নেই। হাতখানা বাড়িয়ে দেয়— গা ছুঁয়ে বলুন, ঠিক সাতটার মধ্যে ফিরে আসবেন।

সেবার পুজোর সময় গোয়ালিয়র রাজদরবার থেকে আমন্ত্রণ এল। তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, মোহিতলাল, সজনীকান্তরা যাচ্ছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ জানালেন, তাঁর যাওয়া হবে না। পূজার ছুটিটা এবার কল্যাণীর কাছে প্রতিশ্রুত।

সজনীকান্তর রোমশ ভুরু কুঞ্চিত হল। ব্যাপারটা কী, এবার তা হলে কি পথের পাঁচালী শেষ করে ঘরের পাঁচালী শুরু হল। শেষপর্যন্ত সেটাই ঘটল। তেরো-শ' সাতচল্লিশের সতের অগ্রহায়ণ, ইংরেজি তিন ডিসেম্বর, উনিশ-শ' চল্লিশ— গোধূলি লগ্নে বিভূতিভূষণের সঙ্গে কল্যাণীর শুভপরিণয় হল। এই কল্যাণীই বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী— রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার কলকাতার স্কুলের চাকরি ছেড়ে বনগাঁর বারাকপুরের নিজেদের ভদ্রাসনে কল্যাণীকে নিয়ে এসে সংসার পাতলেন বিভূতিভূষণ। কলকাতার স্কুল ছাড়লেন বটে; কিন্তু স্কুল তাঁকে ছাড়ল না। গঞ্জের গোপালনগরের হাইস্কুলে তাঁকে শিক্ষকতায় গেঁথে ফেলল গ্রামের লোক।

দু'-দু'বার সন্তান নষ্ট হওয়ার পরে তৃতীয়বার যে-পুত্র সন্তানটি এল, সে-ই বাবলু, কল্যাণী-বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্তান তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম, পনের অক্টোবর, উনিশ-শ' সাতচল্লিশ সাল। এইবার এই বাবলুকে নিয়েই এক নতুন জীবন যেন শুরু হল বিভূতিভষণের। দিনলিপিতে লিখছেন, 'বাবলুকে নিয়ে বিকেলে ইছামতীর ধারে কাটাই। কী ভাল লাগে। কী মমতা, কী ভালবাসার অনুভূতি এর মধ্যে, কেউ জানবে না তা।'

'ইছামতী' এই সময়কার রচনা। নায়ক ভবানী বাঁড়ুজ্যেও দেখছি তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে ইছামতীর ধারে বিকেলে বসে ভাবেন, 'আজ এই যে ক্ষুদ্র বালক ও তার পিতা অপরাহ্নে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ওদের মধ্যে— সে-কথা কেউ জানবে না।'

বিভূতিভূষণ যখন নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালেন, পাড়ার ছেলেরা ততক্ষণে ইছামতী তোলপাড় করে তীরে উঠেছে। জেলেরা টানা জালে চষে ফেলেছে এপার-ওপার। কিন্তু নদীর নামে নাম সেই মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিল না নদী।

ভবানীর মধ্য দিয়ে ইছামতী জুড়ে এইভাবে বাবলুর বাবার কথা বেরোতে লাগল। —'তাঁর বয়েস হয়েছে, এই ছেলেকে নাবালক রেখেই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মহাপ্রস্থানের পথে। কি জিনিস তিনি দিয়ে যাবেন একে— আজকের অবোধ বালক তার উত্তরজীবনের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে একদিন পিতৃদত্ত যে সম্পদকে মহামূল্য বলে ভাবতে শিখবে, চিনতে শিখবে, বুঝতে শিখবে ?' তার পরেই লিখছেন— 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ— এর চেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তাঁর জানা নেই।'

ইছামতীর ভবানীরও প্রার্থনা, 'খোকাকে দয়া করো, তাকে দরিদ্র কর ক্ষতি নেই, তোমাকে যেন সে জানে।'

বাবলু বলে, 'বাবাই কি ভালই লিখিস।' —কথাটি উনিশ-শ' পঞ্চাশের দশ ফেব্রুয়ারির ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। মাত্র ক'দিন আগে 'ইছামতী'র প্রকাশ, জানুয়ারির শেষে। অর্থাৎ, বাবলুর প্রশংসা-পত্রই বোধহয় প্রথম প্রাপ্তি বিভূতিভূষণের। 'ইছামতী'-র রবীন্দ্রপুরস্কার বিভূতিভূষণের মরণোত্তর প্রাপ্তি।

বাবলু বলে, 'বাবাই কি ভালই লিখিস।' —কথাটি উনিশ শ' পঞ্চাশের দশ ফেব্রুয়ারির ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। মাত্র ক'দিন আগে 'ইছামতী'-র প্রকাশ, জানুয়ারির শেষে। অর্থাৎ, বাবলুর প্রশংসা-পত্রই বোধহয় প্রথম প্রাপ্তি বিভূতিভূষণের।

সেবার স্কুলে পুজোর ছুটি পড়তেই কল্যাণী বাবলুকে নিয়ে ঘাটশিলা চলে এলেন। পনেরো সেপ্টেম্বর, উনিশ-শ' পঞ্চাশ সাল। কোজাগরী পূর্ণিমার দু'দিন পর। বিকেলের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন কাছেই এক অরণ্যঘেরা পাহাড় ধারাগিরিতে। সঙ্গে লরিবাংলোর ভক্তদা, কানুমামা প্রমুখ কয়েকজন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে গল্প চলছে। বনচূড়ায় দ্বিতীয়ার চাঁদ। শাল, পিয়াল আর আমলকির ফাঁক বেয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে ঝুর-ঝুর। পাশের কণ্টিকারির ঝোপ কেমন একটা মাতাল গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক অপার্থিব মায়ালোক যেন ঘিরে ধরেছে ধারাগিরিকে।

একটা শিলাসনে অনেকক্ষণ বসার পর বিভূতিভূষণ উঠে পড়লেন।

বেশ রাত হয়েছে। সঙ্গীরা এবার নামতে চান। কিন্তু উপরে উঠছেন বিভূতিভূষণ। ওঁরা ডাকলেন, আর উঠবেন না, চলুন ফিরে যাই।

আবিষ্টের মত উঠেই চলেছেন লোকটি। ওঁরা সঙ্গে চললেন অগত্যা। হারিয়ে যাচ্ছিলেন লোকটি। হঠাৎ এক ভয়ার্ত চিৎকার।

কী হল ? ওঁরা দ্রুত উপরে ছুটে গিয়ে দেখেন, দু' হাতে মুখ ঢেকে থর-থর করে কাঁপছেন বিভূতিভূষণ। ব্যাপার কী ?

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলার বাড়ি *গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে*

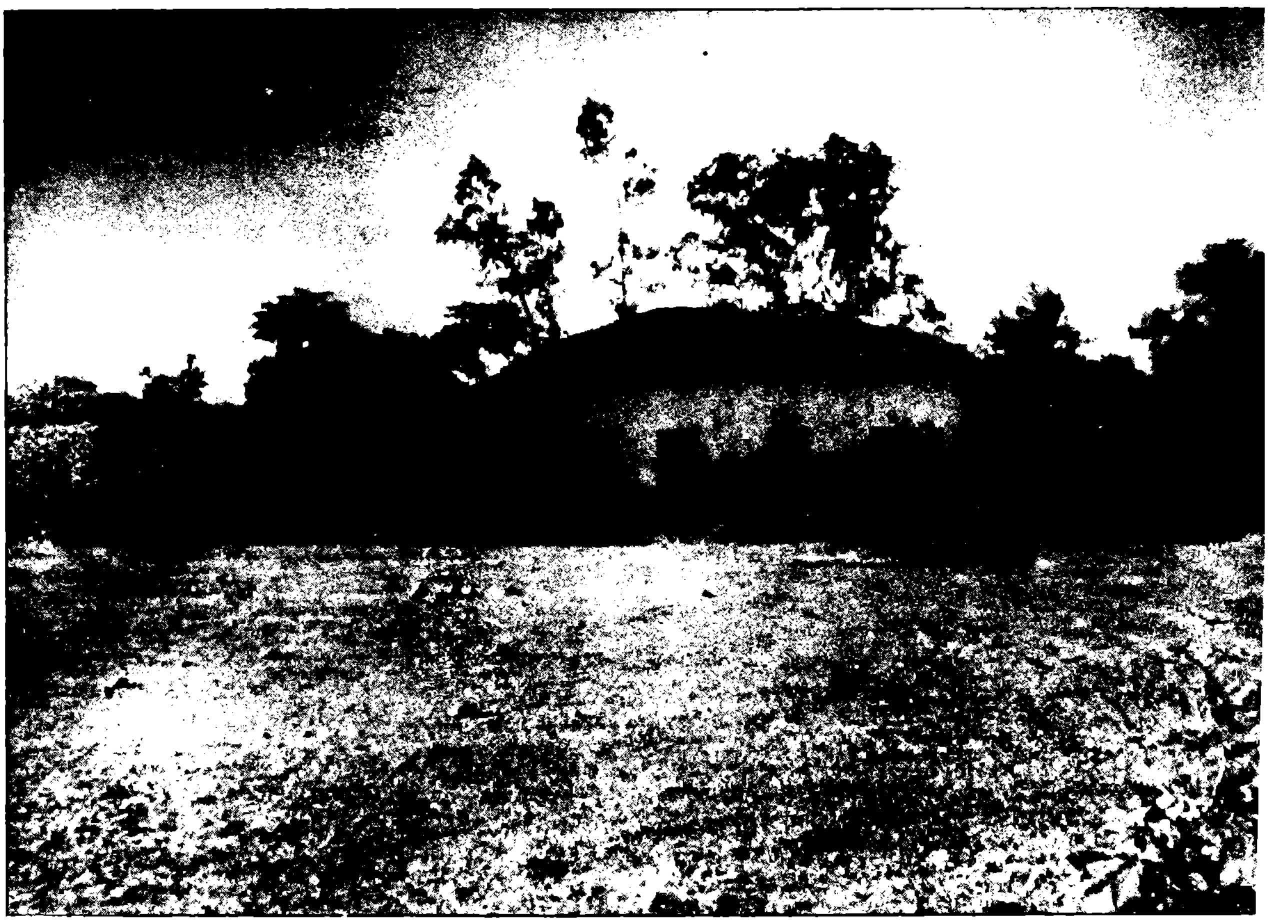

সামনে একটা খাটিয়া। কেউ একজন আপাদমস্তক ঢাকা তাতে নতুন কাপড়ে। নিচে নতুন সরায় **সিঁদুর-কলা** সাজানো।

ধারাগিরি ওঁদের সবার চেনা পাহাড়। এখানে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেননি। যদি মড়ার খাটিয়া হবে, সঙ্গের লোকজন ?

থাক ওসব ভাবনা। বিভূতিভূষণকে ওঁরা বোঝাতে লাগলেন, ও পাহাড়িদের মড়া বোধ হয়। চলুন নামি।

বিভূতিভূষণের মুখে কথা নেই। সর্বাঙ্গে ঘাম। এক সঙ্গীর কাঁধে ভর করে টলতে টলতে নিচে নামছেন। কথা যোগাচ্ছে না সঙ্গীদের মুখে। একা-একা অরণ্য-পর্বতে, নির্জন জ্যোৎস্নায়— অন্ধকারে যিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবনভর, প্রেততত্ত্ব, আত্মার রহস্য ইত্যাদি যাঁর গবেষণা, কী জিনিস তাঁকে ভয় দেখাতে পারে! সানুদেশে নেমে একটা শিলাসনে তাঁরা বসালেন বিভূতিভূষণকে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস করছেন না। একটু জিরিয়ে বিভূতিভূষণই মুখ খুললেন, কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম, আজ একেবারে প্রত্যক্ষ করলাম।

—কী ? ওঁদের গলা কেঁপে যায়।

'আমায় বোধ হয় চলে যেতে হবে শিগগির।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কে যেন আমায় হাতছানিতে নিয়ে গেল ওই খাটিয়ার কাছে। এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে ওই মড়ার কাপড় তুললাম। দেখলাম, ওই মড়ার মুখটা আমারই। ওটা আমারই মৃতদেহ।'

'কী সব বাজে চিন্তা করছেন।' বন্ধুরা ধমক দিলেন, 'ওসব ইল্যুশন।

বিভূতিভূষণের বিষণ্ণ হাসি। তিনি বললেন, 'আব্রাহাম লিঙ্কনও ঠিক এমনি তাঁর মৃতদেহ দর্শন করেছিলেন মৃত্যুর আগে। তবে তিনি দেখেন নিদ্রিতাবস্থায়। জাগ্রত দর্শন হল আমার। যাক, তবে একটা অনুরোধ, কল্যাণী যেন কিছু জানতে না পায়।'

জ্যোৎস্নালোকিত পথ বেয়ে কয়েকটি বিপন্ন প্রাণীর এক শবযাত্রা যেন নেমে এল ডাহিগড়ার দিকে।

শেষ রাত্রে কল্যাণী টের পেলেন, অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছেন বিভূতিভূষণ। কল্যাণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। —কী ব্যাপার এত সকালে উঠলে যে !

বিভূতিভূষণ বললেন, 'কাজল' শেষ করতে হবে। হাতে আর সময় বেশি নেই।'

—সময় কি ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি ? এই তো পুজোর লেখার ধকল গেল, বলেছিলে ক'দিন এখন বিশ্রাম।

সময় যে কেন নেই, সে কথা ওঁকে বলতে পারলেন না বিভূতিভূষণ, শুধু ম্লান হাসলেন।

লিখতে বসেছিলেন এমন সময় ধলভূমগড় রাজ এস্টেট থেকে ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুর লোক এল আমন্ত্রণ নিয়ে। সন্ধ্যায় প্রাসাদে সাহিত্যিকদের চায়ের নিমন্ত্রণ। পূজার ছুটিতে তখন ঘাটশিলায় বেশ সাহিত্যিক সমাবেশ হত। বিভূতিভূষণই ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। বিভূতিভূষণ যত বোঝাচ্ছেন, শরীরটা ভাল নেই, ততই তাঁরা নাছোড়। বিভূতিভূষণকে ছাড়া তো শিবহীন যজ্ঞ হবে।

অগত্যা যেতে হল। প্রমথ বিশী, সুমথ ঘোষ, বিশ্বপতি চৌধুরী, অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ সেন প্রমুখ অনেকে আসরে উপস্থিত। ভাল জলযোগের ব্যবস্থা। সবার সঙ্গে বসলেন বিভূতিভূষণ ; কিন্তু কিছু খেতে পারলেন না। অথচ একটা জিনিস খেলেন। যা সুমথ ঘোষের কথায়, 'বড়দা না খেলেই ভাল করতেন ওই সিঙারা একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। আমরা কেউ খাইনি।'

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফেরার জন্য বঙ্কিমবাবুর দেওয়া গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে প্রমথ বিশী ও সুমথ ঘোষ। গাড়ির মধ্যেই দু-বার বমি করলেন বিভূতিভূষণ। গাড়ি দাঁড়াল গৌরীকুঞ্জের সামনে। সুমথ ঘোষ ধরে তুললেন। ড্রাইভারের ডাকে কল্যাণী আর ভ্রাতৃবধূ যমুনা ছুটে এলেন। সবাই ধরাধরি করে কোনওক্রমে বারান্দাতেই বিছানা করে শুইয়ে দিলেন। ছোট ভাই ডাক্তার নুটুবিহারী তখনও চেম্বার থেকে ফেরেননি। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। রাতের মতো কিছু ওষুধ দিলেন। পরদিন দাদার চিকিৎসার জন্য ডেকে আনলেন সরকারি ডাক্তার সুবোধ বসুকে।

এদিন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন রোগী। রাতে ঘুমও হল বেশ। রাতটা কাটতেই ফের কেমন হয়ে গেল রোগী। টাটানগরে বড় ডাক্তার ব্রহ্মপদকেও ফোনে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু বিভূতিভূষণ অতি দ্রুত যেন কেমন হয়ে পড়ছেন। ব্যস্ত উদ্‌বিগ্ন নুটু কী একটা ওষুধ নিয়ে এল। বিভূতিভূষণ বললেন, ওটা থাক। তুই বরং আমার কাছে বসে গীতা পাঠ কর।

বিশ্বরূপ দর্শন, একাদশ অধ্যায়। চোখ বুজে আবার যেন ধ্যানমগ্ন হলেন বিভূতিভূষণ। একে একে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত পড়ে তাঁর মনে হল ব্যাখ্যাটাও পড়ে যাই। সপ্তদশ শ্লোক শুরু করলেন,'কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ, তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্। পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যংসমন্তাদ, দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরংনিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতোধর্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥

—কিরীটিধারী, গদাচক্রহস্ত, সর্বত্র তেজঃপুঞ্জস্বরূপ দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাময় এক অপ্রমেয় পুরুষকে সর্বদিকে অবলোকন করছি।

বিভূতিভূষণ কোনও ক্রমে চোখ খুলে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, ব্যাখ্যার দরকার নেই, ওতে সময় বেশি যাচ্ছে। তুই শুধু শ্লোকগুলি পড়ে যা।

এবার নুটু আর্দ্রকণ্ঠে পড়তে থাকলেন,—
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য নেত্রম্। পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

মর্ত্য থেকে অমর্ত্যলোক বিস্তারী এক জ্যোতির্বলয় যেন রচিত হল সে মন্ত্রে। ততক্ষণে পরমপথিকের মহাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছে গৌরীকুঞ্জে। এমন সময় ডাহিগড়ার রামকৃষ্ণ মন্দিরের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এলেন। তিনি কানের কাছে মুখ নিয়ে নির্বাণস্তোত্র পাঠ করতে থাকলেন— চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্। কিন্তু কাকে আর শোনাচ্ছেন! স্বামীজিকে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াতে দেখেই কল্যাণী হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন, এ কী হল ঠাকুর পো! আর্তনাদে স্বামীর বুকে আছড়ে পড়লেন তিনি। পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন যমুনা কাঁদতে কাঁদতে। হাউ হাউ করে জানালার গরাদে মাথা ঠুকতে লাগলেন নুটুবিহারী। বিভূতিভূষণ তখন সকল কান্নার ওপারে। সে সর্বনাশের কিছুই বুঝল না আড়াই বছরের বাবলু। রাত তখন সাড়ে আটটা। পনেরো কার্তিক, তেরো-শ' সাতান্ন। ইংরেজি উনিশ-শ' পঞ্চাশ, পয়লা নভেম্বর। ধরণীর ধূলি থেকে ছাপ্পান্ন বছরের এক পথিক বাউলের চিরবিদায়। সুবর্ণরেখার তটে, বিভূতিভূষণের প্রিয় শিলাবেষ্টিত 'পঞ্চপাণ্ডব'-এ তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হল পরদিন দুপুরে। ছিন্ন হল সব মর্ত্যবন্ধন। এক অবিনাশী আত্মার উত্তরণ হল পরম অমৃতলোকে।

হ্যাঁ, সমাপ্তি নয়, উত্তরণ। 'আলোক সারথি' তিনি। তিনি পথের কবি। শেষ নেই তাঁর চলার, শেষ নেই তাঁর জীবনের। 'অপরাজিত'-লেখক বিভূতিভূষণেরই ঘোষণা— 'সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে সুদূরে নিত্যনূতন পথহীন পথে তার গতি। সেই বিপুল নীলাকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যানড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক— এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ।'

[৩০ আগস্ট ১৯৯৪ তারিখে লেখক লোকান্তরিত হয়েছেন। অসুস্থ হবার পূর্বেই দেশ পত্রিকার জন্য এই রচনাটি তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন।]

প্র·চ্ছ·দ নি·ব·ন্ধ

‘নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে’

স রো জ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সমগ্র সাহিত্যকর্মের নিপুণ একটি বিশ্লেষণ। নিজের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কোথাও। জীবন ও সাহিত্যের এমন মসৃণ মিলন প্রকৃতই শিল্পকর্ম। সৃষ্টির এমন স্বাভাবিক আবেগই রচনা করতে পারে অকৃত্রিম সাহিত্য। সর্ব অর্থেই বিভূতিভূষণ অনন্য।

রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের মতো বিভূতিভূষণও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছেন। অথচ আজ বদলে গেছে দিগন্তরেখা, পাল্টে গেছে জীবনযাত্রার পর্ব ও মাত্রার সেদিনের অন্বয় এবং অনন্বয়। উপকরণে ও অন্তঃকরণে ঘটে গেছে কত হেরফের। তথাপি আজও শুশ্রূষা বা নিরাময়ের জন্য নয়, সান্ত্বনা খোঁজার জন্যই শুধু নয়—নয় আমাদের উচ্ছিন্ন পরবাসী সত্তার ‘মনকেমনিয়া’ ভাবের পরিচর্যার জন্য—আমরা রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বিভূতিভূষণের কাছে যাই আমাদের আধুনিকতার তাগিদে। সে জন্যই বিভূতিভূষণের শতবার্ষিকী আমাদের কাছে শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়। সত্তার অবৈকল্যকে স্বরূপত উপলব্ধির জন্য নিরুপকরণ রবীন্দ্রলিরিক আমাদের যেমন ডাক দেয়, বিভূতিভূষণের গল্পের ডাকও সেই গোত্রের গভীরতা থেকে উৎসারিত। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের প্রথম আবির্ভাবকালটিকে যদি আমরা সঠিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখব, যে-কারণে তিনি সেদিন ছিলেন সব থেকে স্বতন্ত্র, আজও এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তিনি সে কারণেই সব থেকে স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র্যের প্রতিতুলনা কিছুটা পাওয়া যাবে জীবনানন্দে। তবু বলব ‘ঝরা পালক’ থেকে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’-‘রূপসী বাংলা’-য় জীবনানন্দকে পৌঁছতে হয়েছে। বিভূতিভূষণের কোনো প্রস্তুতিপর্ব নেই। ক্ষণস্থায়ী প্রস্তুতিপর্বও নেই। তিনি যেন পৌঁছেই ছিলেন। জীবনানন্দকে হাঁটতে হয়েছে প্রথম পর্বে সত্যেন্দ্রীয় জগতে, হাঁটতে হয়েছে প্রাচীন পিরামিডের বালুকাধূসরতায়, ইতিহাসের হারানো ছায়াবীথিকায়। তবে তিনি পৌঁছেছেন খোড়ো বাংলা চালা-পুকুরঘাটের সন্ধ্যার হাঁস-কন্ধা পাড় শাড়ি-পরা স্নিগ্ধ বাঙালী মেয়ের বাস্তব প্রাত্যহিকতায়। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে এই প্রাক্ ইতিহাসটা আমরা তেমন করে জানি না। জানা জরুরি বলে মনে করি না। তথাপি বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দে একটা তুলনা আকর্ষিত হয়। তা হল, দুজনের আত্মস্বরূপের অভিজ্ঞানগত অকৃত্রিমতায়। আজ ‘দেবযান’-কল্পিত মহাব্যোমের কোনও স্তরে প্রায় সমবয়সী এই দুই জীবন ভাষ্যকারের যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাঁরা পরস্পরের হাত চেপে ধরে আজও বলবেন—‘এখনো নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল’। যেদিন তাঁরা লেখা শুরু করেছিলেন সেদিন এবং আজও ‘এখনো’ শব্দটা সমান তাৎপর্যবহ। সেদিন, তিরিশের

●

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের প্রথম আবির্ভাবকালটিকে যদি আমরা সঠিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখব, যে-কারণে তিনি সেদিন ছিলেন সব থেকে স্বতন্ত্র, আজও এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তিনি সে কারণেই সব থেকে স্বতন্ত্র।

●

গ্রেট ডিপ্রেসন যখন অনড় হয়ে চেপে বসেছে, ম্লান গ্রামীণতা, ধূসর বিবর্ণ নাগরিক অস্তিত্ব, সংখ্যাগণনার অতীত বেকার যুবকদল—যখন ‘পটলডাঙার পাঁচালী’ মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞতার তিক্ততাকে চরম দুর্বিনয়ে ঘোষণা করতে চাইছে, যখন ‘বেদে’-জাতীয় উপন্যাসে বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের সমস্ত স্মৃতিস্বপ্নের মিনারকে আক্রোশে আঘাত করা হয়েছে, যখন একদিকে শোনা যাচ্ছে নজরুলের হায়দরী হাঁক, অপর দিকে শোনা যাচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুদূরের আহ্বানে মেরুতুষারের ডাক, তখন উপনিবেশের অচরিতার্থতায় এবং জর্জরতায় বিমর্ষ যুবকেরা কেউ ফ্রয়েডে, কেউ মার্কসে, কেউ কেউ বা স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পানপাত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আসবপানে খুঁজে নিতে চেয়েছেন স্বাভিজ্ঞান। আজ বিভূতিভূষণের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দিনে আমরা যখন মনে করি জীবনানন্দের শতবার্ষিকীরও বেশি দেরি নেই, যখন আমরা আমাদের কল্পিত দেবযানে এঁদের দুজনকে মুখোমুখি আলাপচারিতায় নিমগ্ন বলে ভাবি, তখন এঁদের দুজনের ভাবনাসাযুজ্যে আমরা আজও সচকিত হই। উনিশশো সাতাশের আগস্ট মাসের ন' তারিখের সাক্ষ্যে আমরা ভাবতে পারি বিভূতিভূষণ বলছেন— ‘গভীর রাত পর্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম দীন হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতোয়া গ্রাম্য নদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—’ এরই বিনিময়ে জীবনানন্দ হয়তো জানাবেন তাঁর পুনরাবর্তনের প্রার্থনা :

হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে
লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে
ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত
ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ
ডাঙায়।

আমরা কিন্তু শুধু শুধু সাদৃশ্যবিলাসে মিল খুঁজে বেড়াচ্ছি না। ‘পথের পাঁচালী’র ভাববৃত্তে বিচরমান বিভূতিভূষণ এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি-রূপসী বাংলার ভাববৃত্তে স্থাপিত জীবনানন্দের মধ্যে আমরা এক ঐতিহাসিক সাধর্ম্য দেখতে পাচ্ছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার অনিকেত

অস্তিত্বের জন্য নীড় খুঁজতে চেয়েছিলেন এই দুই লেখক। বিদেশি কেতাবে নয়, নিজের আকাশে, নিজের মাটিতে।

কী ভাবে আমরা এঁদের পীঠভূমির এবং ঐতিহাসিক বন্ধনগ্রন্থির মীমাংসা করব? বিভূতিভূষণের ইতিহাস অবধানতা এবং জীবনানন্দের ইতিহাস সচেতনতা এক ব্যাপার নয়। উনিশশো সাতাশ-আটাশ সালে ভাবনার জগতে বিভূতিভূষণ যদিও ঘুরে বেড়িয়েছেন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে— 'সম্রাট সম্রাজ্ঞী খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি'-র ধূসরতায়, যদিও তাঁর সামনে খোলা ছিল পৃথিবীর সূর্যাস্তবিহীন এক বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শেষ দুই দশকের ভাঙনের পাঠ, তথাপি তাঁর মন অবিচল ছিল এক স্বরাজসাধনায়। ইতিহাসের ধূসর জগতে নয়, তাঁর কাছে অস্তিত্ব সত্য হয়ে উঠত তিৎপল্লার উপরে বিকালের এক ঝলক রাঙা রৌদ্রে, সজল সন্ধ্যার বাতাসে ঘেঁটকোলের উগ্র কটু গন্ধে। দিনপঞ্জিকার পাতায় তিনি যখন বলেন : 'দূরে বাংলা দেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবী লেবু ফুলের সুগন্ধ, সজনে ফুল পড়ে আছে, আমের বউল, কচি পাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়া বইছে—কোকিল ডাকতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্ত চোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাদীপ ... জানালায় ধূপগন্ধ ... দেবতার মন্দিরে আরতি।' তখন ইতিহাসের দূরবিসর্পিত রাজপথ অপেক্ষা অনেক বেশি 'রিয়েল' হয়ে ওঠে এই চিত্র। আবার আমরা স্মরণ করতে পারি জীবনানন্দকে :

কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস, লহনার খুল্লনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলোমাখা পথে আমি যে বিকায়ে দিছি মন
বাঙালি নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়—ডাঁশা আম, কামরাঙা, কুল।

কোথাও নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হচ্ছে। দামামা থেমে যাচ্ছে। সম্রাট হয়ে উঠছে ভাঁড়। পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ। আমাদের কাছে কেউ কেউ বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' প্রসঙ্গে হাডসনের প্রকৃতিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের কথা ভাবতে গিয়ে হাডসনের স্মৃতি আকর্ষণ খুব প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয় না। জন গলস্‌ওয়ার্দি হাডসনের 'গ্রিন্ ম্যান্‌সন'-এর (কার্লটন হাউস/ ন্যু ইয়র্ক) ফোরওয়ার্ডে বলেছিলেন— All Hudson's books breathe this spirit of revolt against our new enslavement by towns and machinary, and are true oases in an age so dreadfully resigned to the 'pale mechanician'. আমার মনে হয়েছে ঘনিয়ে ধরা নাগরিকতা ও যন্ত্রায়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিপ্রায় থেকে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রয়াণ নয়। আবার 'পার্পল্ ল্যান্ড' প্রভৃতি রচনায় হাডসন যেমন মেলে ধরেছিলেন একটি romantic piece of realism, বিভূতিভূষণ সেই অর্থেও প্রকৃতি অভিপ্রায়ী ছিলেন না। বলতে কী গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকের ইংলন্ড অথবা য়ুরোপীয় পরিস্থিতি আর এই শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের ভারতীয় পরিস্থিতি এক নয়। উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো বত্রিশ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ষীয় ভারতীয় অভিজ্ঞতা নানা ঘটনায় বিক্ষত। জালিয়ানওয়ালাবাগ, অসহযোগ আন্দোলন, রাজনৈতিক চরমপন্থীদের চ্যালেঞ্জ, গ্রেট ডিপ্রেশনের ঢেউ, শ্রমিক অসন্তোষ, ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবেশ—এই সব ঘটনার সামগ্রিক উত্তাপের আঁচ বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের মুখপত্র হিসাবে 'কল্লোল' দেখা দিয়েছে। একটা বিদ্রোহের ভাব সর্বত্র স্পষ্ট। কিন্তু বিভূতিভূষণকে বা জীবনানন্দকে এসবের কিছুই স্পর্শ করেনি। অথচ তাঁরা কন্‌ফর্মিস্ট ছিলেন না। তাঁরা খুঁজে নিতে চেয়েছেন এবং খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের রোহভূমি। তথাকথিত স্বদেশ প্রেম নয়, এঁদের দুজনের কাছে যেটা বড়ো হয়ে উঠেছিল তা হল ভূমি-ভূমিকার অন্বয় জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি লেখকের ক্ষেত্রে সেই অন্বয় জ্ঞান এমন ঐতিহ্যঋদ্ধ এবং সেইসঙ্গে আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।

দুই

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রথম বিস্ময়কর দুঃসাহস এর প্রকৃতিপট নির্মাণে নয়। প্রকৃতিপট নির্মাণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেননি—করার চেষ্টাও করেননি। তিনি শুধু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে অধিকতর সানুপুঙ্খ হয়েছেন। তা নইলে 'ছিন্নপত্রাবলী'-র চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অস্তিত্বের সজীব সম্পর্কের কথা বলেন, প্রকৃতির যে টান তিনি তাঁর রক্তধারায় অনুভব করেছেন, হাডসন সম্বন্ধে যে কথা উনিশশো ষোল সালে গলস্‌ওয়ার্দি বলেছেন—তা এখানে স্মরণীয়। Hampshire Days থেকে গলসওয়ার্দি উদ্ধৃত করেছেন এই অংশ— 'The blue sky, the brown soil beneath, the grass, the trees, the animals, the wind and rain, the stars are never strange to me ; for I am in and am one with them ; and my flesh and the soil are one, and the heat in my blood and in the sunshine are one, and the winds, and the tempests and my passions are one.' আমরা মিলিয়ে নিতে চাইব না, কিন্তু মনে করতে পারি 'উর্মিমুখর'- এর এই অংশ : 'আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর। এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে—ভাদ্র মাসের এই রোদভরা দুপুরে কেন যে আমায় পাগল করে তোলে। বনে বনে মটর লতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখীর ডাক— মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়।' 'পথের পাঁচালী' কিন্তু এসবের জন্য বিশিষ্টমাত্র একথা বললে সবটা বলা হল না। 'পথের পাঁচালী'-র একমাত্রতা এবং অনন্যতা তার কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্বাচনে। নীরেন্দ্রনাথ রায়ের এবং সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত মনে রেখেই একথা আমি বললাম। যখন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত, সমস্যা তাড়িত, উৎক্রান্তির জন্য উন্মুখ যুবককুলের নানা মুখের রেখা নানা পটে ফুটে উঠছিল, তখন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে আমরা অপু আর দুর্গাকে পেলাম, যারা তাদের শিশুত্বের জন্য, বালক বালিকার বয়ঃক্রমের জন্য প্রত্যক্ষত সেই সময়ের উল্লিখিত সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতের দ্বারা অস্পৃষ্ট। এখানেই বিভূতিভূষণের শক্তি। যে মহাজাগতিক চেতনায় এই লেখক সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর কল্পনাকে, যে-কল্পনায় স্পেস এবং টাইম একইসঙ্গে সংগ্রথিত ছিল এক অভিজ্ঞতাসূত্রে, একটা cosmic বিস্ময়কে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে তিনি তখন বলেন— 'দূরের ঐ তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এরকম হাসি-আশা ভরা জীবনস্রোত হয়তো ওখানেও চলেছে—কে জানে? বিশাল Globular cluster- এর দেশ, বড় বড় star clouds, ছায়াপথ, কী অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। Sagittarius অঞ্চলের নক্ষত্রঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে ওঠে—পুলকে অনির্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।' তিনি এই কথাটা ভাবতে পেরেছিলেন বলেই আরো একটা কথা সহজেই ভাবতে বুঝতে পেরেছিলেন। বাস্তববাদ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। তাঁর বিষয় ছিল জীবনসত্য, তাঁর বিষয় ছিল জীবনসত্যের অশেষত্বকে অনুধাবন। সে

পরিমল গোস্বামী

অশেষত্বের প্রেক্ষাপটে—সেই স্থান এবং কালের অসীমত্বের প্রেক্ষাপটে রোম বার্লিন লন্ডন এবং চিংড়িপোতার খাল, নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ ঘাট সমান সত্য হয়ে ওঠে। যে কোনো নতুন শিল্পার্থে সার্থক উপন্যাস পুরাতন ফর্ম বা স্টাকচারকে প্রশ্রয় দেয় না। এখানেই উপন্যাসের-শিল্পের নিজস্ব অভিজ্ঞানের অঙ্গীকার। এই শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বিভূতিভূষণ উপন্যাসকে নাটকীয় বা মহাকাব্যিক বা লিরিক্যাল করার জন্য ব্যস্ত হলেন। প্রকৃতির অনুপুঙ্খ এবং অপু-দুর্গার সমগ্রতাকে ধরে রেখে তিনি নতুন ফর্ম সৃষ্টি করেন। তাদের পারস্পরিকতায় যে অনন্যতা, সেটাই 'পথের পাঁচালী'-র আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের সাধর্ম্যটুকু লক্ষণীয়—নীলমণি লতা, তিৎপল্লার ফুল এবং পশমের মতো লাল বট ফল, কাল এবং স্থানের পটভূমিতে সত্য। এই সত্যকে প্রতিফলিত করতে গেলে বাস্তব সমস্যার দ্বারা অস্পৃষ্ট এক শিশুর স্বাধীন উন্মোচনকে দরকার—দরকার দুর্গার মতো এক বালিকাকে যার অন্বিত হবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল ভারতীয় রেলগাড়ির এনে দেওয়া দূরের স্বপ্ন। আমরা লক্ষ করি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রারম্ভে কালকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' খণ্ডের শেষ অনুচ্ছেদে প্রাধান্য পেয়েছে 'ওয়াইড স্পেস' (যার কথা বিভূতিভূষণ বারে বারে বলেছেন দিনলিপিতে)- এর জন্য আকুতি। 'বল্লালী বালাই' শুরু হতে না হতেই বলা হয়েছে: 'শাখারীপুকুরের নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টমসন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!' দীর্ঘ উপন্যাস শেষ হয়েছে যখন তখন সুর-স্বর পালটে গেল। অপুর সামনে তখন দীর্ঘ পথ—'ওয়াইড স্পেস' অপুকে এনে দেয় এক অন্যনিরপেক্ষ মুক্তির হদিস। সে বলে না—'ছাদে যেও নাক সেখানে আকাশ অনেক বড়/ সীমানাহীন/ তারাদের চোখে বহু জিজ্ঞাসা স্বপন সব হবে বিলীন'। এই মধ্যবিত্ত সুলভ নাগরিক অচরিতার্থতাবিলাস থেকে মুক্ত এক নায়ক এই বালক। সে ব্রিটিশ সাবজেক্ট নয়,

বিভূতিভূষণ : এক স্বতন্ত্র স্রষ্টা *হিমানীশ গোস্বামীর সৌজন্যে*

কলোনির ক্লান্ত, গঞ্জনাক্ষুব্ধ যুবক নয়। সে আপন পটভূমিকায় স্বস্থ। তাকেই: 'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন, মুর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে ...' এমনভাবে পথের কথা বাংলা সাহিত্যে কি এর আগে আমরা পড়িনি? অবশ্যই পড়েছি। 'ডাকঘর'-এর রূপকীয় বাতাবরণে পথের ডাক, দূরের ডাক অমলের কাছে ধ্বনিত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'-র ভাবঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভাষাতেও পড়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলীর ছায়া। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' দাঁড়িয়ে আছে তার অন্য নিরপেক্ষ বাস্তবতার উপর। লেখক যেভাবে ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়ার বৈপরীত্যকে সহাবস্থিত করেন, তা অভূতপূর্ব। বিনা ঘোষণায় তিনি সর্বজয়াকে অব্যবহিত পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় ফ্রেম থেকে বার করে আনেন। কোনো আদর্শীকরণের ধার তিনি ধারেন না। সর্বজয়ার অন্তর্লোকের জটিল ত্রিস্তর অভিব্যক্তি—সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুণ, সর্বজয়া-দুর্গা, সর্বজয়া-অপু এমন করে এর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি। সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুণ কাহিনীবৃত্ত যেভাবে পূর্ণতা পেল তা প্রমাণ করে বিভূতিভূষণের কাঠামো জ্ঞান এবং চরিত্রবাস্তবতার চেতনা কত গভীর! দুর্গার মৃত্যুর শোকাবহ অভিঘাতে যখন হরিহরের সংসার বিমূঢ়, তখন সর্বজয়ার মনে ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি তার আচরণের জন্য কোনো অনুশোচনা জাগেনি। আরো সুনির্দিষ্ট সময়ে তা জেগেছিল। হরিহরের মৃত্যুর পরে সর্বজয়া তখন এক ধনী গৃহস্থ বাড়িতে পাচিকা বৃত্তি নিয়েছে। সেখানে জীবনের নিষ্ঠুরতা,

আচরণের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে সর্বজয়ার অভিজ্ঞতা সর্বজয়ার স্মৃতিসত্তাকে আলোড়িত করেছে। সেদিন সকাল থেকে সবজয়ার রান্নাঘরে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না। ঘি চুরি করে পালাচ্ছিল এক ঠিকে ঠাকুর। তার শারীরিক লাঞ্ছনা সর্বজয়া প্রত্যক্ষ করল। ঠিক তারপরেই সে বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছেন কোথাকার রানী মা। তাঁকে প্রণাম, আদর আপ্যায়নের অন্ত নেই। 'পয়সারই আদর' বললেন এক মাসিমা। কিন্তু সর্বজয়ার তখন মনে পড়ে গেছে অনেক দিন আগের কথা—'অনেকটা এইরকম চেহারার ও এই রকম বয়সের—সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ জানে না, দুপুরবেলায়, সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু।

'সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

'মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কি না সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।' এতটা ব্যবধানে এসে সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুণ বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

উপন্যাসটির দ্বিস্তর গঠনে একটা নান্দনিক উপভোগ্যতার উপাদান আছে। বাইরের দিক থেকে এ গল্পে আছে ইন্দির ঠাকরুণের শোচনীয়তা, গোকুলের বৌয়ের লাঞ্ছনা, দুর্গার মৃত্যু, হরিহরের বিপন্ন সংসারচিত্র—এরকম আরো কত কিছু। কিন্তু এ গল্প দরিদ্রের গল্প নয়, দারিদ্র্যের গল্পও নয়। এ গল্প অপুর জীবন-বিস্ময়ের গল্প। এটা আমাদের কখনো কখনো মনে হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের শরৎচন্দ্রীয় করুণা-কৃতার্থতায় মেদুর বুঝি অপুর জীবন। যেমন মহামন্দার যুগে হরিহরের মতো মানুষেরা এ বিশ্বাস না রেখে পারেনি যে 'কিছু একটা হয়ে যাবে', ঠিক সেই গোত্রের এক আশাবাদ অপুতেও সঞ্চারিত। অতটুকু ছেলে দুর্গার চুরি-করা সোনার কৌটা খুঁজে পাওয়ার মুহূর্তে জটিল সিদ্ধান্তটি নিল—একথা কাউকে বলা চলবে না—মা-কেও না। সে বিশ্বাস রেখেছে জীবনে—জীবনের জটিলতায় নয়। মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় আছে—'কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকাইলে শশীর আর আকাশের চাঁদের দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করে না।' অপুর ব্যাপারটা উল্টো। বনচ্ছায়ালীন দিগন্ত প্রান্তর, বর্ষাসিতেজ নাটা কাঁটার হলুদ রঙের শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালির লঘুগতির আসাযাওয়া, শীতসন্ধ্যার কুয়াশা, মৌসুমী মেঘের সমারোহ, বাংলার বসন্ত—এসব কিছুর দিকে তাকালে অপুর মনে থাকে না জীবনের দৈন্যের কথা। 'তুমি কে?' 'আমি অপু'। 'তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?' অপু কোনো বর চায় না। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সে শোনে 'শরৎ মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা নীল নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।' অপু কোনো বর চায় না—এখানেই তার স্বাধীনতা, তার স্বাতন্ত্র্য, এখানেই কলোনির কেরানি-রক্তের গঞ্জনা থেকে তার মুক্তি। এ মাপের চরিত্র বাংলা উপন্যাসে এর আগেও নেই। পরেও নেই। 'অতিথি'-র তারাপদয় শুধু এর আভাসটুকু আছে। এ সেই সময় যখন প্রখ্যাত সাপ্তাহিকে উপন্যাস বেরুবে, যার নাম 'বেকার', যার নায়ক কুড়ি মাইল রাস্তা হেঁটে পাড়ি দিচ্ছে চটকলে একটা চাকরির খোঁজে। এই সময়ে বিভূতিভূষণ ইতিহাস-নিয়তি-নিরপেক্ষ প্রোটাগনিস্টের কথা ভেবেছেন। সেই ভাবনাকে দৃঢ়ভিত্তি দেবার জন্য খসড়া পাণ্ডুলিপিতে যে হরিহরের আদরা তিনি করেছিলেন, পরিণামী পাণ্ডুলিপিতে তিনি তা পালটে ফেলেন। খসড়া পাণ্ডুলিপির অপুর জেলেপাড়ায় কড়ি খেলতে যাওয়া উপলক্ষ্যে 'খোঁড়া হরিহরের' উল্লেখ যে পরিণামী পাণ্ডুলিপিতে নেই, সেটাই প্রমাণ করে বিভূতিভূষণ তাঁর নায়ককে করুণাসাপেক্ষ করে তুলতে চাননি।

তিন

'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ বিভূতিভূষণের সমীক্ষা অন্যতর। 'পথের পাঁচালি'-তে ছিল প্রকৃতি এবং প্রাকৃতে মেলবন্ধন; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' হতে চেয়েছে লৌকিক এবং অলৌকিকে গ্রন্থিবদ্ধ। জিতুর অলৌকিক দর্শন, ভবিষ্য দর্শন এবং জিতুর সংসার অভিজ্ঞতার তাৎপর্যহীন দরিদ্র ছবি আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনভাষ্যে পৌঁছে দেয় না। 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ লেখক যেন জোর করে 'পথের পাঁচালী'-র বিপরীত পথে হাঁটতে চেয়েছেন। অপু নয় জিতু, দুর্গা নয় সীতা, হরিহর নয় অপুর দাদা—সমস্ত ব্যাপারটাই যান্ত্রিক মনে হয়। প্রকৃতিবিকল্পে প্রেমকে বসাতে গিয়ে লেখকের ভুল হল। অপ্রাকৃতের ক্ষতিপূরণ ঘটাতে চাইলেন তিনি প্রেমকে দিয়ে—শুধু যদি সে প্রেম সঠিক পটভূমি পেত! প্রাকৃত বিবর্ণতার কতটুকু বিমোচন হল ওই প্রেমের শুঁড়িপথে!

'আরণ্যক'-এর প্রোটাগনিস্টের বেদনা রোমান্টিক পিস অফ রিয়্যালিজম থাকল না। বহু সর্বনাশা অভিজ্ঞতায় প্রহত স্বাধীন ভারতের সজাগ অংশে সে বেদনার শাশ্বত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'আরণ্যক'-এর প্রস্তুতি যখন চলছিল সেই সময়ের নানা ছাপ রয়েছে 'অভিযাত্রিক'-এ।

'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর অকৃতার্থতা ঘুচে গেল 'আরণ্যক'-এ। 'আরণ্যক'-এর প্রোটাগনিস্টের বেদনা রোমান্টিক পিস অফ রিয়্যালিজম থাকল না। বহু সর্বনাশা অভিজ্ঞতায় প্রহত স্বাধীন ভারতের সজাগ অংশে সে বেদনার শাশ্বত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'আরণ্যক'-এর প্রস্তুতি যখন চলছিল সেই সময়ের নানা ছাপ রয়েছে 'অভিযাত্রিক' রচনায়। রচনাটির প্রকাশকাল অবশ্য 'আরণ্যক' পরবর্তী। কিন্তু 'অভিযাত্রিক'-এর ডায়েরি রেজিস্টার একথা মনে করিয়ে দেয়, 'প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে থাকাকালীন বিহার রাজ্যের দুএক জায়গায় বেড়ানোর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। "অভিযাত্রিক" রচনায় দিনলিপির সাহায্য নিলেও তিনি রোজনামচার আকারে এই সুন্দর বইটি রচনা করেন নি।' রোজনামচার অভিজ্ঞতা বলছে: 'বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমার ভালো লাগে না। অর্থের জন্য প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্যভূমি বিনষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু অরণ্য সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে?' বিপন্ন সৌন্দর্যের জন্য উদ্বেগের মধ্যেই নিহিত থাকে বিপন্ন বিস্ময়ের জন্য উৎকণ্ঠা। কিন্তু শুধু সে কারণেই উদ্ধৃত অংশের গুরুত্ব নির্দেশ আমরা করছি না। 'আরণ্যক' উপন্যাসে এক জায়গায় একথা বলা হয়েছে, দুমুঠো গমের জন্য এই বিশাল অরণ্যভূমি কাটা পড়ছে। স্বাধীন দেশ হলে এ অরণ্যভূমি রক্ষণের একটা পরিকল্পনা থাকত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নেই বলেই আমেরিকা বা য়ুরোপের মতো বনসংরক্ষণবাদীদের কোনো ভূমিকা এখানে নেই—পরোক্ষে এমন একটা তীক্ষ্ণ অভিমত এ উপন্যাসে অর্ধোচ্চারিত থেকেছে। সুতরাং বলতে পারি একটা ন্যূনতম

রাজনৈতিক ওভারটোন, যা 'পথের পাঁচালী' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ থাকার কথা নয়, তা 'আরণ্যক'-এ আছে। আছে বলে টাঁড়বারোকে দিয়ে লেখকের মিথ রচনা এ উপন্যাসে এত লাগসই হয়েছে। সে যেন এই বনের প্রাণকে ধ্বংসের খাদ থেকে রক্ষা করার অতন্দ্র প্রহরী। অপরদিকে আরণ্যক অবক্ষয়ের প্রতিমুখে কল্পনা করা হয়েছে যুগলপ্রসাদকে। সে চরিত্র সত্যচরণের অনুশোচনার আগাম সান্ত্বনা। মৌলিক চরিত্র উদভাবনার ক্ষেত্রে যুগলপ্রসাদ অবিস্মরণীয়। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া এবং যুগলপ্রসাদের ইউটোপিয়ায় কোনো মিল নেই। কিন্তু এদের স্বসমুখ স্বাধীনতায় একথা প্রমাণিত হয়,ইংরাজ শাসনের শেষ প্রহরে ভারতীয় লেখকেরা স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে কী ভাবে অনুভব করেছিলেন। হোসেন মিয়া এবং যুগলপ্রসাদের মধ্যে মেরু বৈপরীত্য সত্ত্বেও কর্মের স্বাধীনতার বিচিত্র পিপাসা লক্ষণীয়।

আরো লক্ষণীয় 'আরণ্যক' যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবীয় বাস্তবতার কাহিনী। ক্ষীণ আর্থসামাজিক পটে ধৃত এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যতই আপাত বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সব মিলিয়ে তারা কিন্তু একটা বিষয়গত সমগ্রতার আভাস এনে দেয়। কোনো চরিত্রই বাহুল্য নয়। রাজুপাঁড়ে এবং যুগলপ্রসাদ এই অরণ্যভূমির দুই বিপরীত অংশের প্রতিনিধি। রাজুপাঁড়ে আরণ্য জীবনসম্ভব মিথের অনড়ত্বে অটল বিশ্বাসের মানুষ। সে অরণ্যের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। যুগলপ্রসাদ চায়। সে অরণ্যের ভাবী ইতিহাসকে ভবিতব্যের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না। রাজু পাঁড়ের অদৃষ্টবাদ আর যুগলপ্রসাদের নতুন প্রকৃতির পুরুষকার সমকালীন ভারতীয় জীবনকথার ইতিহাসপ্রদত্ত নবাগত জটিলতা। দোবরু পান্না এবং কুন্তা এই দুটি চরিত্রের সাহায্যে লেখক আজকের পাঠকের কাছে কথাবস্তুর নেপথ্য স্তরের গল্পটিকে স্পষ্টতা দিলেন। ক্ষীণ আর্থ-সামাজিক পটে পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষগুলির কোনো সামাজিক পারিবারিক ইতিহাস এখানে ছিল না। বিচ্ছিন্নতার অবসান সূচিত হল কুন্তার প্রতি সত্যচরণের করুণায়। অর্থাৎ সমাজ ছিল না বলেই সামাজিক কর্তব্যও ছিল না। জমিভিত্তিক সমাজের প্রথম এলিটিজ্‌ম ভূদান। তা সম্পন্ন হল। দোবরু পান্নার ভূমিকায় ভিন্ন তাৎপর্য। এই অরণ্যভূমির আদি বাসিন্দাদের জীবনকথার সূত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিকতার ছিন্নগ্রন্থির অন্বেষা প্রাধান্য পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতিচারণে, যে রাজনৈতিক ওভারটোনের কথা আমি একটু আগে বলেছি, তা আরেকটু স্পষ্টতা পেয়েছে। দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থল পরিদর্শনে সত্যচরণের অনুভূতির বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে অদ্যাপি বিলুপ্ত যথার্থ ভারতীয়ত্বের এক প্রথম অকৃত্রিম প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করা গেল, যা কেতাবলব্ধ নয়। উপন্যাসটির শেষাংশে— দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর থেকে, লবটুলিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্ব পর্যন্ত, সত্যচরণের বিষাদ একজন পরাস্ত বেদনাহত কনজারভেশনিস্টের বিষাদ মাত্র নয়। স্বাধীন অরণ্যভূমি জমিদারী ভূমিব্যবস্থার ফাঁস গলায় দিল। সত্যচরণ তার কবি অনুভূতির উচ্চাসন থেকে নিক্ষিপ্ত হল অনুপস্থিত জমিদারের কুশলী আমলায়। তার 'ক্ষমা কোরো' এই আর্তির তাৎপর্য এটাই।

বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সব থেকে একক ও অননুকরণীয় বিভূতিভূষণ

'আরণ্যক' যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবীয় বাস্তবতার কাহিনী। ক্ষীণ আর্থসামাজিক পটে ধৃত এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যতই আপাত বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সব মিলিয়ে তারা কিন্তু একটা বিষয়গত সমগ্রতার আভাস এনে দেয়।

চার

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা স্মরণ করব। টাইপ এবং ইনডিভিজুয়ালের যে সমন্বয়ী মিশ্রণে গড়ে ওঠে ব্যক্তিস্বরূপ, স্রষ্টা বিভূতিভূষণের লেখায় সেখানে যেন টাইপের দ্বিমাত্রিকতাকে ছাড়িয়ে যায় ইনডিভিজুয়ালের ত্রিমাত্রিকতার অভিজ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ তিনটি চরিত্রের

উল্লেখ করি। একটি হল 'আরণ্যক' উপন্যাসের ধাওতাল সাহু। লেখক যেন ধাওতাল সাহুকে আর্থ সামাজিক প্রতিবেদনের পাতা থেকে মুহূর্তে মুক্তি দিয়ে দেন— তার তামাদি হয়ে যাওয়া খাতকদের হ্যান্ডনোটের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে। অন্যথায় যেখানে ধাওতাল সাহুকে মনে হতে পারত চিপপুস কঞ্জুস, সেখানে তার অপরূপ জীবনভাষ্যের জন্য তাকে মনে হয় এই উপন্যাসের অভিনব পটপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত এক স্বাভাবিক ব্যক্তিচরিত্র। এ ব্যাপার আবারও ঘটেছে 'ইছামতী' উপন্যাসে নীলকর সাহেব শিপটন চরিত্রকল্পনায়। রোগ এবং উড় সাহেবেরই জাতভাই শিপটন ও কোল্ডওয়েল। কিন্তু শ্রেণিমাত্রকতা রোগ এবং উড় সাহেবের একমাত্র কুশীলব পরিচিতি। বিভূতিভূষণ শিপটনকে শ্রেণিমাত্রকতায় আবদ্ধ রাখেননি। যেমন ধাওতাল সাহুকেও রাখেননি। শিপটনের নীলকরত্বে লেখক কোনো চুনকাম করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু শিপটনের নীল রঙের পাশে এমন একটি রঙের হদিস তিনি কল্পনা করেছেন, যার একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। শিপটনের মৃত্যুমুহূর্তটি স্মরণীয়—'কিন্তু শিপটন সায়েবের কষ্ট হয়নি। কেউ জানতো না সে তখন বহুদূরে স্বদেশের ওয়েস্টমোর ল্যান্ডের অ্যাল্ডসি গ্রামের ওপরকার পার্বত্যপথ রাইনোজ পাস্ দিয়ে ওক আর এল্‌ম্‌ গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার দশ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোস শিকার করতে, কখনো বা পার্বত্য হ্রদ এল্‌টার ওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকায় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা কিংবা কখনো মস্ত বড় পাইক আর কার্প মাছ বর্শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলতে ব্যস্ত ছিল ...আর সব সময়েই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘণ্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্ গাছের আন্দোলিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে...' এটি বিভূতিভূষণের প্রিয়কৌশল। 'অন্তর্জলী' বা 'ঝগড়া' গল্পেও তিনি চরিত্রপাত্রের মৃত্যুমুহূর্ত অঙ্কনে এই কৌশল ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায় প্রবেশের আগে নির্দিষ্ট চরিত্রটি মধ্যবর্তী সকল চরিতার্থতা অচরিতার্থতা মুছে ফেলে ফিরে যেতে চায় নির্দ্বন্দ্ব উপক্রমণিকায়—উপসংহারের ক্লান্তি সেখানে নেই। আলোচ্য উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য একটু আলাদা। আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে বাংলার কৃষিজ নীল মান হারালো য়ুরোপীয় শিল্পবিপ্লবেরই আরেক ধাক্কায়। ল্যাব-নীল বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির মহাপতন। শিপটন সাহেব বিশ্বম্ভর রায় নন। সুতরাং তার মহাপতনে কোনো ট্র্যাজিক মহিমা নেই। তার মৃত্যুশয্যার চারপাশে সমবেত আমলাবর্গের সঙ্গে তার কোনো নাড়ির যোগ নেই। উদ্ধৃত শৈশব দৃশ্যটি শুধু একথা জানাচ্ছে, কালের ঘুরচাকায় ছিটকে পড়া ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত ওই মানুষটির প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছিল শিশুর নিশ্চিতি। লাভ এবং লোভের পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অধিকতর শক্তিমান প্রতিযোগীর কাছে তার হার হল। তার মরণাহত স্বপ্নে সে অধ্যায়ের কোনো ছায়া নেই। লাভ এবং লোভের নৃশংস অধ্যায়টি নিজের পরাজিত প্রহরে তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় চরিত্রপাতের শ্রেণীস্বরূপ সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ উদাসীন ছিলেন। সময় আর সমাজের পটে ধৃত চরিত্রপাত্রের শ্রেণীস্বরূপকে তিনি কীভাবে অনুধাবন করেছিলেন— কীভাবে ব্যক্তি আর শ্রেণীরূপের সংগ্রথিত চরিত্রের বেড়ে ওঠা ও হয়ে ওঠাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তার আশ্চর্য নিদর্শন নালু পাল।

তা বলে একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় চরিত্রপাতের শ্রেণীস্বরূপ সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ উদাসীন ছিলেন। সময় আর সমাজের পটে ধৃত চরিত্রপাত্রের শ্রেণীস্বরূপকে তিনি কীভাবে অনুধাবন করেছিলেন— কীভাবে ব্যক্তি আর শ্রেণীরূপের সংগ্রথিত চরিত্রের বেড়ে ওঠা ও হয়ে ওঠাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তার আশ্চর্য নিদর্শন 'ইছামতী' উপন্যাসের নালু পাল। নালু পাল ইতিহাসের পটে নতুন মানুষ। মহাকাশ রহস্য কুতূহলী বিভূতিভূষণ আমাদের অর্থে সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না। সাগরময় ঘোষের 'হীরের নাকছাবি'-কাহিনীর তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ আলাপচারিতা আমাদের মনে আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ কতখানি সুতীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, 'ইছামতী'র নালু পাল তার প্রমাণ। গ্রামীণ এলিটের আড়ষ্ট তিন ভাগের অনড় পাঁচিল মুক্ত-সমাজের লক্ষণ নয়। নালু পালের লড়াই শুধু ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার লড়াই নয়। তার লড়াই গ্রামীণ এলিটিস্ট-মধ্যে পরিগণিত হবার লড়াইও বটে। 'গণদেবতা'-র ছিরু-পালের চেষ্টাও ছিল গ্রামীণ ভদ্রলোক স্তরে উন্নীত হবার প্রয়াস। তথাপি নালু পাল ও ছিরু পালের মধ্যে যে পার্থক্য শতাব্দীর ব্যবধানে সুনিশ্চিত, সে ব্যবধান সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। গ্রামীণ মধ্যবিত্তের— (মধ্যস্বত্বভোগীদের মাঝখানে)—উদীয়মান প্রতিনিধি নালু পাল। ধীরে ধীরে সে উঠেছে—গ্রামের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ সূত্র রচনা করেছে। বউকে নিয়ে রেলগাড়ি চড়ে কলকাতা গেছে, গ্রামের ভোজ্য সামগ্রীতে সে নতুন নতুন উপাদান সরবরাহ করেছে। কড়ি থেকে সে গ্রামকে পৌঁছে দিল মুদ্রামানে। কিন্তু ইংরাজের কলোনিতে সে শিল্পপতি হতে পারে না। নীলকুঠি কিনে নিয়ে সে গ্রামীণ জমিদার হবার পথে পা বাড়ায়। এ ভবিতব্য সেদিন ছিল একাধিক বড়ো মাপের নাগরিক বাঙালি ব্যবসায়ীর।

পাঁচ

'ইছামতী' উপন্যাসের দুর্বলতা তার কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিকল্পনায়। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের দুর্বলতায় ডুবেছে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'; ডুবেছে 'দেবযান'; এর অভাবে একটি তথ্যদৃঢ় উৎকৃষ্ট বিষয় হাতে নিয়েও 'অনুবর্তন' থেকে গেল একটি কালখণ্ডের একাংশের বিশ্বস্ত আলেখ্যমাত্র। এতখানি না হলেও অনেকাংশে এ সীমাবদ্ধতায় ভুগেছে 'ইছামতী'। ভবানীর চোখের সামনে খুব ধীরে ধীরে গ্রামপট পালটে যাচ্ছে। ভবানী কিছুর অংশভাক্ নয়, সে কিছুতে বিজড়িতও নয়। সে শুধু খবরগুলি শুনছে। মাঝে মাঝে বলছে উত্তর কালে কী হবে। জীবন দ্বন্দ্ববিমুক্ত নয়— দ্বন্দ্ববিমুক্ত শুধু ভবানীর জীবন। তিন পত্নীর সম্ভাব্য সঙ্কট থেকেও সে বেঁচে গেল। ছেলে হয়েছিল তার প্রিয়তমা পত্নী তিলুর। বাকি দুজন বিলু নীলু যথাক্রমে মরে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ত্রিপত্নী সমন্বিত ব্রজেশ্বরের সংসারে প্রফুল্লকে প্রধানা করেছিলেন, বিভূতিভূষণ তেমন তিলুকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিসাবে প্রধানা করে তুলেই ক্ষান্ত থাকেননি, শেষ পর্যন্ত তাকে একমাত্র করে তুলেছেন। ভবানীকে প্রত্যক্ষ ভূমিকা দিতেও পারেননি বিভূতিভূষণ। আমি বলছি না ভবানী কেন বিষ্ণুচরণ দিগম্বর হয়ে ওঠেনি। আমার বক্তব্য ভবানী কি শুধু নিমন্ত্রণ বাড়ির কুলীন শ্রোত্রিয়ের গ্রাম্য ঘোঁট ভঞ্জনেই নিঃশেষিত হবে? নালু পালের বাড়ির ঘৃতপক্ব লুচি ভক্ষণেই সব সামাজিক সমস্যার নিরসন হবে? ভবানী এক শাশ্বত জীবনধারার সন্ধানী। লোকায়ত ধর্মসাধনায়, ভক্তি স্রোতে

আপ্লুতা খেপীর আশ্রমে দ্বারিক কর্মকার আর হাফেজ মণ্ডল পাশাপাশি বসে সত্যধর্মের কথা শোনে। ভবানী কি এর তাৎপর্য বুঝেছিলেন ? তিনি তো জানবেন ব্রাহ্মণ্য অধিকারবাদ অপেক্ষা খেপীর লোকায়ত ভক্তিসাধনার জোর কোথায় ? ওদিকে রাজারামের লাস বিদ্রোহী প্রজাদের বল্লমের আঘাতে মাঠে লুটিয়ে পড়ে। ডেভিড সাহেব উদ্বিগ্ন হন পাঁচটা শবদেহ লুকোবেন কোথায় ! হলা পেকে তাঁর কাছে অন্য বার্তা বয়ে আনে। এসবের মধ্যে ভবানী প্রবহমানা ইছামতীর তীরস্থ গাছের মতো স্থির এবং অপরিবর্তিত —এ কেমন কথা !

ছয়

কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না 'অশনি সঙ্কেত'-এর গঙ্গাচরণ সম্বন্ধে। হরিহর আর সর্বজয়ার জগৎ থেকে অনেকখানি দূরে গঙ্গাচরণ আর অনঙ্গবৌয়ের জগৎ। এ কাহিনী যে-পটভূমিকায় লেখা হয়েছে সে সময়ে বাস্তব অত্যন্ত প্রবল। এ কাহিনীতে কোনো অপু নেই, নেই গ্রাম্য মধ্যাহ্নের ঝিমঝিমে কল্পনায় উধাও, অসীমে ধাবমান এক বন্ধনহীন বালকের দর্পণ। হরিহরের সঙ্গে গঙ্গাচরণের মিল-অমিলটুকুও লক্ষণীয়। হরিহরের আশাবাদ গঙ্গাচরণে আছে বটে, কিন্তু গঙ্গাচরণ হরিহরের ভগ্নাংশে নির্মিত নয়। 'ইছামতী' উপন্যাসের নীলমণি সমাদ্দারের মধ্যে গঙ্গাচরণ-পরিকল্পনার বীজ রয়েছে একথাও ঠিক নয়। গঙ্গাচরণ একমাত্র তার পটভূমিকাতেই সত্য। 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন এমন এক জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে ভাত যাদের কাছে বিলাস। মকাই দানা সিদ্ধ, বাথুয়া শাক, বুনো কুল যাদের প্রধান খাদ্য, শীতের রাতে টাল করে রাখা ভূষির মধ্যে বাচ্চা ছেলেগুলোকে আকণ্ঠ গুঁজে রেখে যাদের শীতের প্রকোপ থেকে শিশুকে বাঁচাতে হয়, তাদের নিয়ে দুর্ভিক্ষের গল্প হবে কী করে, তারা তো নিত্যদুর্ভিক্ষের মানুষ। অন্যদিকে 'অশনিসঙ্কেত' সেই 'পরজীবী' ব্রাহ্মণের গল্প। দারিদ্র্যসীমার নিচে যাতে না নেমে যেতে হয় তার জন্য সে নানাভাবে সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে গঙ্গাচরণের অভিজ্ঞতায় এসে হানা দিয়েছে মন্বন্তরী দুর্ভিক্ষ। মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ এক একটা করে অক্টোপাসের মতো শহর থেকে দূরে গ্রাম বাংলাকে জড়িয়ে ধরেছে। দুর্ভিক্ষের সেই এগিয়ে আসা, ঘনিয়ে ধরা, তার শ্বাসরোধ করা চাপ এবং তার প্রাণান্তক ছোবল স্তরে স্তরে গঙ্গাচরণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ত্রিমাত্রিক হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর, যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে তাঁদের বাস্তবধর্মিতার জন্য সুখ্যাত, তাঁদের সকলেরই হার হয়েছে বিভূতিভূষণের এই তথাকথিত 'অসমাপ্ত' উপন্যাসের কাছে। আমাদের নজরে না পড়ে যায় না হরিহরের সঙ্গে গঙ্গাচরণের প্রভেদ। হরিহর শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করেছে। 'অক্রুর সংবাদ'-এর তাৎপর্যই তো এই যে, আর সে গানের পরে প্রত্যাবর্তন নেই। গঙ্গাচরণ তার স্বভূমিতে দাঁড়িয়েই লড়ে গেল। সে হরিহরের মতো স্থানান্তরী হয়নি। সর্বজয়ার সঙ্গে অনঙ্গবৌয়ের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য। সর্বজয়ার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল অনঙ্গবৌকে। সে অনেক পুরানো সংস্কার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মতির সঙ্গে তার সখ্য আমাদের আড়ষ্ট অনড় বর্ণীয় বিভেদবিদীর্ণ সমাজজীবনে একটা অন্য উদাহরণ। অনঙ্গবৌ সম্বন্ধে আমরা একটু পরে যথা প্রসঙ্গে আবার আলোচনা করব এখন আমরা বিভূতিভূষণ রচনামালায় 'অশনিসঙ্কেত'-এর গুরুত্বের দিকে আরো একটু বেশি মনোনিবেশ করব। প্রথম কথা, 'পথের পাঁচালী'র ছায়ামেদুরতায় 'অশনিসঙ্কেত'-এর বজ্রবিদ্যুৎ ভেঙে পড়ল—এটা শুধু লেখকের লেখক জীবনের বিবর্তনের ঘটনাই নয়, বাঙালির সমাজজীবনের ভাঙচুরের ঘটনার দলিলও বটে। প্রকৃতিবাদ থেকে লেখক এবার বেরিয়ে এলেন চলিষ্ণু মানববাদে যখন দুর্গা ভট্চাজ, গঙ্গাচরণ আর কাপালিদের ছোট বউ মিলে মতির শবসৎকারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় তখন বোঝা যায় মন্বন্তর একটা স্থিতাবস্থার উপসংহার মাত্র নয়, একটা নতুন বিশ্বাসের উন্মেষপর্বও বটে। অবশ্য এ ঘটনা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে আগেও আছে। 'বিপিনের সংসার'-এ পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর প্রেমিকা মতি বাগদীর শবসৎকারে পণ্ডিত তো বটেই বিপিনও হাত লাগিয়েছিল। কিন্তু 'অশনিসঙ্কেত'-এ ব্যাপারটা এসেছে এক আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যে। এটা এ প্রসঙ্গে আসল কথা। গঙ্গাচরণের পক্ষে নিয়তিবাদী হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এমনভাবে বিভূতিভূষণ গঙ্গাচরণ চরিত্রের গোড়া বেঁধেছেন যে চরিত্রটির পক্ষে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ অকল্পনীয়। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে শেষ অবধি লড়ে গেল। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'মন্বন্তরের উপন্যাস : অশনিসঙ্কেত' (অনুষ্টুপ)/ ২৩শ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা) নামক আলোচনায় ঠিকই বলা হয়েছে 'এই উপন্যাসে : স্বভাববাদের গণ্ডী পেরিয়ে বিভূতিভূষণ চলে আসেন বাস্তববাদের ধারায়। ডকুমেন্টেশনের ও খুঁটিনাটি বিবরণের ওপরে উঠে আরো বড়ো এক সত্যকে তুলে ধরতে চান। মনুষ্যত্বের শেষ পরাভবকে তিনি কিছুতেই মানতে পারেন না। পরিস্থিতির অনিবার্যতার উর্ধ্বে ওঠার এই প্রবল প্রয়াস কি আঙ্গিকবাদীদের নজরেই পড়ে না ?'

সাত

অনঙ্গবৌ চরিত্রটি আলোচনার আগে একবার সাধারণভাবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের নারী-চরিত্রের প্রেক্ষাপটে অনঙ্গবৌকে স্থাপন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমরা বিভূতিভূষণের দুটি অপেক্ষাকৃত গৌণ উপন্যাসের উল্লেখ করি। একটি 'বিপিনের সংসার' অপরটি 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। দুটি উপন্যাসেই পুরুষের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে মর্যাদা পেয়েছে। কোনো পুরুষের দিশাহারা জীবনে দিশারি হওয়া অথবা কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার পথে সহায়িকা হওয়াকে আধুনিক নারীবাদীরা কতখানি নারীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নেবেন তা জানি না। আধুনিক নারীর যে সঙ্কটের চেহারা দিব্যেন্দু পালিত বা আবুল বাশারের গল্পে ত্রিমাত্রিকতা পায় অথবা, যে-সঙ্কটের অগ্নিপরীক্ষা উত্তাপ মেলে দেয় শীর্ষেন্দুর 'দূরবীন'-এর রেমির মধ্যে বিভূতিভূষণের নারীরা সে অর্থে আধুনিক নয়। আজকের মেয়েরা— তা সে নাগরিকাই হোন অথবা গ্রামীণাই হোন, তাঁরা কেউ পুরুষের আশ্রয় বা প্রেরণামাত্র বলে নিজেকে ভাবতে রাজি নন কিন্তু বিষয়টিকে অন্যদিক থেকেও ভাবা চলে। 'বিপিনের সংসার'-এর জমিদার কন্যা মানীর চরিত্র অথবা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর কন্যাপ্রতিমা কুসুম চরিত্র সমাজ বা পরিবার প্রদত্ত সম্পর্কসূত্রের বাইরের ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ প্রীতি সহানুভূতির স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেক্ষেত্রে তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার ব্যাপারটির গুরুত্ব 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এ পরোক্ষে স্বীকৃত।

কিন্তু এ সব রোম্যান্টিক স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্য অনঙ্গবৌয়ের দাম নয়, তার অনন্যতার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সে সহ্য করেছে, সে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও ভারতীয় নারীর বহুকালাগত আতিথেয়তার ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছে। সে সত্যই অবমাননার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সে ভেঙে পড়েনি। সে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। সমষ্টিজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সে দৈনিক লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। নারীর দেহাধীন ভবিতব্যকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, তাকে অঙ্গীকৃত করেই তার সংগ্রাম। নিজেকে

মহাকবি মাইকেলের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে বিভূতিভূষণ। যশোহর ১৯৪৭ *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

বাঁচানোর লড়াই, অন্যকে বাঁচানোর লড়াই। স্নিগ্ধ মায়াবী নারীপ্রকৃতি এবং মেদুর নৈসর্গিকতা থেকে অনঙ্গবৌয়ে বিভূতিভূষণ পৌঁছে গেলেন এক বজ্রংসহ বৃক্ষপ্রতিমায়। এ বড়ো কম উত্তরণ নয়। একদিকে গঙ্গাচরণ সম্পূর্ণভাবে নীলমণি সমাদ্দারের জট ছিঁড়ে, দুর্গা ভটচাজের প্রাগমাটিজম ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে— একবার সুযোগ পেলে সে এবার নিজের হাতে লাঙল ধরবে—ধরে দেখবে কী হয়। দৈববাণী বিতরণের ব্যবসায়ে সে থাকবে না। অন্যদিকে অনঙ্গবৌয়ের সংকল্প এবং পরীক্ষা কঠিনতর। তার চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে মন্বন্তর—আবহমান কালের বাঙালি মেয়ে তথাপি হারিয়ে যায় না। সেই যে জীবনানন্দের যে মেয়েটি সন্ধ্যা হলে ঘরে ডেকে নিয়ে যায় হাঁসটিকে, আগলে রাখতে চায় সবাইকে, অনঙ্গবৌ সেই বাঙালিনী যাদের সে আশ্রয় দিয়েছে তাদের কাউকে সে 'যাও' বলতে পারবে না। জন্ম দানের যন্ত্রণায় কাতরা বউটি তার স্নেহার্দ্র দৃষ্টি মেলে রাখে স্বামীর দিকে, অভুক্ত, অস্নাত গঙ্গাচরণ কোথায় টো-টো করে ঘুরছে। 'আরণ্যক'-এ কোনো জন্ম নেই। 'অশনি সঙ্কেতে' মৃত্যুর আগেই জন্ম আছে। অনঙ্গবৌই প্রথম বলেছিল মতির শবসৎকার দরকার হলে, আমরা সবাই মিলে করবো। এও এক নবজন্ম বই কি।

আট

'বংশলতিকার সন্ধানে' নামে বিভূতিভূষণের একটি গল্প আছে। গল্পটির কথা পাড়ছি এই জন্য যে এই গল্পের সাহায্যে বিভূতিভূষণের আন্তর স্বরূপের এক দিকের পরিচয় পাবো। এ গল্প আজকে আর লেখা হবে না। আজ আর কোনো পরবাসী তার হৃদয়ে এ ডাক শুনতে পাবে না, পরবাসী চলে এসো ঘরে। জীবনানন্দের নায়কের মতো আলোচ্য গল্পের নায়ক নীরেন দূরদূরান্তর দেশান্তরের হাতছানি উপেক্ষা করে এসে দাঁড়িয়েছে মেটিরি রামচন্দ্রপুর গ্রামে। এর আগে সে বাংলা দেশে আসেনি। যেটুকু এসেছে তা মাত্র কলকাতায়। এখানকার গাছপালা, সোঁদা মাটির গন্ধ, সোনামুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, লেপা পোঁছা মাটির ঘরের দাওয়া— এই সকল কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে নীরেন থেকে গেল। তার যাবার কথা ছিল আলমোড়া থেকে ধারচুলা, ধারচুলা থেকে লিপুলেক পাস। সেখান থেকে মানসসরোবর। তাদের গ্রামের বড়োনিমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে তার যা মনে হল তা অন্য এক কবির লেখার মধ্যে স্বগতোক্তি হয়ে উঠেছে ভাষান্তরে—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর মুখ খুঁজিতে যাই না আর।' আমরা একাধিক গল্পের—অন্তত ছয়টি গল্পের কথা এখানে ভাবতে পারি। যার বিষয় প্রত্যাবর্তন বা ফেরা। আমরা তাঁর দিনলিপি থেকে এজাতীয় উক্তি কতবার পেয়েছি: 'এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মতো বৈকাল আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না....এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সবচেয়ে বেশি গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্ছি শুধু এখানে—' উৎসভূমির জন্য এই আকুলতা 'অপরাজিত' উপন্যাস খণ্ডের অপুর মধ্যেও মেলে। 'মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচমাস'—নির্জন অপরাহ্ণে ইংরাজি

কবিতায় মুমূর্ষু প্রবাসী সৈনিকের গৃহবিধুরতার কথা পড়তে পড়তে অপুর মনে জেগে ওঠে নিশ্চিন্দিপুরের কথা। যখন তিরিশের গ্রেট ডিপ্রেশনের কালে দিশাহারা অনাশ্রয়, শিকড়হারা অস্তিত্বের অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে প্রবল, যখন 'বেদে', 'যাযাবর', 'বেনামীবন্দর' 'মহানগর' 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি রচনায় নাগরিক অ্যানোনিমিটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানাভাবে তখন এই সময়ের প্রেক্ষিতে বিভূতিভূষণ ঘরে ফেরার গল্পগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মনে পড়তেই পারে 'যাচাই' গল্পের কথা। ন মাসের ছেলেকে নিয়ে ননীবালা গ্রাম ছেড়েছিলেন। আজ সেই ছেলে কৃতী যুবক। তাকে সঙ্গে নিয়ে ননীবালা এসেছেন স্বগ্রামে, একুশ বছরের ধুলোর স্তর সরিয়ে ঠিক ঠিকানা খুঁজে নেবেন বলে। যথাযথ মিলবে না, তবু উল্লেখ করছি 'পৈতৃক ভিটা' গল্পটির কথা। একটি অতিপ্রাকৃতের কুহেলি গল্পটিতে ছড়িয়ে আছে বটে, তবু গল্পটির যথাযথ মূলকথা—পরবাসী ফিরে এসো। বিখ্যাত গল্প 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'। কাশীতে তাঁর মন টিকল না। সাধুসঙ্গ অভিলাষিণী সঙ্গিনীটির জীবনাচরণ ও জীবনার্থ —কিছুর সঙ্গেই দ্রবময়ী মিলতে পারলেন না। তিনি গ্রামে ফিরে এলেন। ছুটে এলেন ন'ঠাকরুন। ছুটে এল কনক। দ্রবময়ীর প্রথম জিজ্ঞাসা, মুংলি গরুটা ভাল আছে কিনা। কনক জিজ্ঞাসা করল, এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম। আমাদের কথা মনে ছিল ? ওদিকে তখন বেলা পড়ন্ত। আষাঢ়ের দীর্ঘ দিন বাঁশ বনের আড়ালে হারাতে চলেছে। ঘেঁটকোল ফুলের উগ্র কটুগন্ধ বাতাসে ভাসছে। দ্রবঠাকরুনের মন শান্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্বস্থানে পুনর্বাসিত হয়েছেন। আজ যখন আমরা সকল দিক দিয়েই উদ্বাস্তু, ঘরছাড়ার বেদনা যখন ছিন্নমূল মানুষের স্মৃতিতে এখনো রক্তক্ষরা, তখন এসব গল্পের এক আলাদা তাৎপর্য সীমান্তের এপারে ওপারে ঘন হয়ে ওঠে। এমন কি 'বুধির বাড়ি ফেরা' গল্পে এক অবোধ মূক প্রাণীর বহু কুটিল ভয়াল অভিজ্ঞতার শেষে আবাল্য পরিচিত গোহালে ফিরে আসার গল্পেও প্রত্যাবর্তনের আকৃতি ও আনন্দ প্রধান হয়ে ওঠে।

এখন ঘরে ফেরার গল্প অবান্তর। এ গল্প আর কেউ লেখেন না। যে-নাগরিক অ্যানোনিমিটির কথা একটু আগে বলছিলাম তা আমাদের ফেরার আবেগকে কবে যেন মুছে দিয়েছে। বিমল করের যদুবংশের নায়কেরা, রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই'-এর চরিত্রপাত্রেরা সমরেশের 'বিজন বিভুঁই'য়ের মানবী কোথায় ফিরবে। তবু বিভূতিভূষণের 'প্রত্যাবর্তন'

গল্প-উপন্যাসে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে তাঁর চরিত্রপাত্রেরা কেউ ট্র্যাজেডির টানটান নাটকে জড়িয়ে পড়ে না। কোনো মহৎ পরাজয় অথবা মহত্তর ব্যর্থতায় তারা চিহ্নিত নয়। ব্যক্তির ব্যক্তস্তর ও নিহিত স্তরের টানাপোড়েনের কাহিনী তিনি লেখেননি।

গল্পটি রূপকার্থে যেন আমাদের সকলের গল্প। ব্যধিবিজীর্ণ বালকটি ফিরতে ফিরতে পথে শুয়ে পড়ে—'হঠাৎ আমার মনে হল ওই জামতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন। আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন। মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে। আমি মা-র কোলে শুয়ে পড়ি।' মৃত্যুর মধ্যে সব জ্বরের উপশম—সব অপ্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ। মায়ের কাছে ফিরে আসার সঙ্গে তা তুলনীয়। সেই মা কোনো হিসাব চান না, কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। শুধু কোলে তুলে নেন। সিঁদুরচরণের গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। সিঁদুরচরণ তার গ্রামটুকু ছাড়িয়ে কৃষ্ণনগর পেরিয়ে বাহাদুরপুর গিয়েছিল। এই পর্যটন যে বিস্ময় তার মধ্যে সঞ্চারিত করে, তার সঙ্গে অপুর বিস্ময়ের খুব বেশি ব্যবধান নেই। সে বিস্ময়ের মূল কথা হল পিরথিমিটার কি সীমে মুড়ো নেই। এ গল্প আর লেখা হবে না। আজকের সাম্প্রত প্রজন্মের পাঠক এ গল্প পড়তে গেলেই ভাববে, কত সিঁদুরচরণ যে ভিটেমাটি ছেড়ে নদী জঙ্গল পার হয়ে চিরকালের মতো প্রবাসী হয়ে গেল তার গল্প কি এই সুরে লেখা যাবে।

ফিরে যাওয়া আর ফিরে পাওয়া কী ভাবে বিভূতিভূষণের রচনায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে তা বোঝা যায় 'পিদিমের নিচে' গল্পটি পড়লে। গল্পটি লেখকের সমাজজ্ঞানের এক বিশিষ্ট নিদর্শনও বটে। গ্রাম বাংলার বর্ণীয় এলিট যারা তারা কর্নওয়ালিসের খাতায় জাতে ওঠা শ্রেণীগত এলিটও বটে, তাদের বাধা ও নিষেধ কাটিয়ে গল্পের কথক চরিত্র পৌঁছে গিয়েছিল সরাটির চরে, সেখানে ঝিঙে ফুল ফোটে। সেখানে পাগল ঠাকুর বহুকালাগত লোকায়ত ভক্তি সাধনার ধারার প্রতিনিধি। গল্পটি পড়লে এও বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের বৈরাগী বাউলেরা কোন্ বাস্তব ভূমি থেকে সংগৃহীত। বর্ণনায় বিভূতিভূষণ বলছেন—'সরাটির চরে ঝিঙে ফুল ফুটেছিল সেবার, আর পাগল ঠাকুরের গানের ক্ষ্যাপাটে সুর এক তারে বাঁধা'। এক অকৃত্রিম তৃষ্ণাবারি, প্রকৃতি ও সাধকের অনুভূতির সমগ্রতার পটভূমিতে এই রূপ নেয় :

> ও আমার হৃৎকমলের পরমগুরু সাঁই
> রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
>
> তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
> অরূপ রূপের পাথার পারে
> বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।

—এটাকেই বলা যায় ফিরে পাওয়া, ফিরে যাওয়া। প্রকৃতি অকৃত্রিম, মানুষ অকৃত্রিম, ফিরে যেতে হবে সেখানে। তিনি যখন 'ভুবন বোষ্টমী'র গল্প বলেন তখন ভুবন বোষ্টমীর শান্ত স্নিগ্ধমুখচ্ছবি যেন অনেককালের বাংলার মুখচ্ছবি। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের লেখকের অনুভূতি। বোষ্টমীর মুখচ্ছবি আর বর্ষার ধূসর বিকালের শান্ত প্রকৃতির অন্বয়ে গড়ে ওঠে এক চিরকালের বাংলা।

গল্পে-উপন্যাসে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে তাঁর চরিত্রপাত্রেরা কেউ ট্র্যাজেডির টানটান নাটকে জড়িয়ে পড়ে না। কোনো মহৎ পরাজয় অথবা মহত্তর ব্যর্থতায় তারা চিহ্নিত নয়। ব্যক্তির ব্যক্তস্তর ও নিহিত স্তরের টানাপোড়েনের কাহিনী তিনি লেখেন নি। শ্রেণী পরিচয় দিয়ে তিনি মানুষ চেনাতে চাইতেন না। তাঁর গল্পে তিনি যখন দেহজীবিনী মেয়েদের এনেছেন তখন তিনি তাদের টাইপরূপে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটাননি। অথচ তারা সত্য হয়ে ওঠে— সত্য হয়ে ওঠে জীবনের নিয়মে। ইন্দির ঠাকরুন আর বড়ো বাগদিনী—অনুকম্পাই মৃত্যু ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে বীর্যবতী—বিপরীত সন্নিপাতে এরা দুজন আজও বিস্ময়কর। ওই মৃত্যু আর এই প্রতিরোধের শ্রেণীচরিত্র নিয়ে লেখক অযথা মাথা ঘামাননি। এটার বিস্ময়ও কম নয়। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' অথবা 'হিঙের কচুরি' গল্প মনে পড়ে। কত বিচিত্র মানুষ এসেছে তাঁর গল্পে— যাত্রার অভিনেতা, পুরানো দিনের কবিয়াল, কাঠকাটা বুড়ো, অপেরা পার্টির অধিকারী, খেত মজুর, রাঁধুনি বামুন— এসেছে বুধোর মা-য়ের মতো বা নিস্তারিণীর মতো চরিত্র। তাঁর একাধিক গল্পের বিষয় চলিষ্ণু সময়ের অতিপাত। এ প্রসঙ্গে তাঁর সেরা গল্প 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ'। আমরা কেউ কালকে ধরে রাখতে পারি না। কালের কাছে সব হারানো যদু হাজরা যখন শেষবারের মতো

শিখিধ্বজ ভূমিকা অভিনয় করে দেখায় তখন 'ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধনট তার জীবনের সমস্ত ট্রাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যিই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুছন্দা ওকে উপেক্ষা করে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে গেল।' 'হা-হা' করে উদভ্রান্তের মতো ছুটে যাওয়া যেন কালের কাছে প্রত্যাখ্যাত যদু হাজরার ছুটে যাওয়া। 'হাট' গল্পে গল্পকথা বা স্টোরি বলতে কিছু নেই। এ হচ্ছে সেই জাতীয় গল্প যা বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কেউ লেখেননি। একদিনের হাট ও হাটুরেরা এই গল্পের বিষয়। কিন্তু তার মধ্যে পঞ্চাশ বছর আগের ঝিটকিপোতার হাটের হারানো দিনের তুলনা ঘরে ফেরার মুখে হাটুরেদের আকুল করে তোলে। 'দুইদিন' (পরমেশ রায়ের কাহিনী) গল্পে একটি কাঁঠালগাছ আছে। সে প্রবহমান কালের পরিমাপক। গল্পটি শেষ হচ্ছে এইভাবে— 'একটু দূরে সেই কাঁঠালগাছটা। যখন এটা অল্প কয়েক বছরের চারা তখন এরই তলায় দুধে আলতায় গোলা পাথরের খোরায় পরমেশ রায়ের নববধূ এসে দাঁড়িয়েছিল বরণের সময়। পাশেই আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন নব যুবক পরমেশ রায়। আটষট্টি বছর আগের এ খবর সভাস্থ কোনো লোক জানত না, জানবার কথাও না।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাল কালান্তরের প্রতীক হয়ে ওঠে গাছটি। সময়— বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ এই অত্যন্ত স্বতন্ত্র দুজন লেখকের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তের মুখরতা নয়— চির প্রবহমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ধরা জীবনের স্থির রহস্য—যে প্রেক্ষাপটের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আমাদের সকল প্রয়াস, এই দুই সম্পূর্ণ আলাদা লেখকের কাছে তা ইতিহাস-নিরপেক্ষ ভাবে আভাসিত হয়েছে। 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি' গল্পটিতে গল্প কোথায়? কিমাশ্চর্যমতঃপরম, চরিত্রই বা কোথায়? অথচ সবটা শুনতে শুনতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সময়ের হাতে প্রহত জীবনের তথা মানুষের অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা। তিনি কোনো তত্ত্ব প্রচার করলেন না। কোনো দার্শনিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। গল্পের কথক দেখল ভণ্ডুল মামার বাড়ি তৈরি কোনো কালে শেষ হয় না। খানিক খানিক গাঁথা হয়, আগাছা আর শ্যাওলায় আবার তা আক্রান্ত হয়। 'যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভণ্ডুল মামার বাড়ির ইঁট একখানির পর আরেকখানি উঠছে....শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলাম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুল মামার বাড়ি হয়েই চলেছে....ওর বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।' মনে পড়ে যায় জীবনানন্দীয় অস্তিত্ববিস্ময়—'মানুষের ইচ্ছা চিন্তা সংকল্পের আঁধার আলোর সেতু ঘিরে/ ক্লান্তি ব্যথা কুজ্ঝটিকা ঢের/ সত্যের ও মৃত সত্যের।' 'ভণ্ডুল' নামটি খুব লাগসই। বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে তাঁর পাত্রপাত্রীদের নাম রাখতেন। সংসারে যাকে নানা দুঃখের অভিঘাত সহ্য করতে হল তার নাম সর্বজয়া। যার সন্তান-সন্ততির ঘর-গেরস্থালিতে ক্ষুধা মিটানোর আয়োজন অপ্রতুল তার নাম অন্নপূর্ণা। ভণ্ডুল নামটির মধ্যেই রয়েছে মানুষটির সারা জীবনব্যাপী অচরিতার্থ প্রয়াসের ইঙ্গিত। গল্পের কথক দু'পাঁচ বছর অন্তর দেখেছে বাড়িটি একটু একটু গড়ে উঠতে যায়— যেতে গিয়ে থেমে যায়। বিভূতিভূষণ যদি দুর্বল লেখক হতেন, তাহলে বলে ফেলতেন, আমরা সবাই এক অর্থে ভণ্ডুল মামা। আমাদের কোন ইচ্ছাই সঠিক পূর্ণতা পায় না। হয়ে উঠতে থাকা আর 'হওয়া'-র মধ্যে ব্যবধান ঘোচে না শেষ পর্যন্ত। 'হয়ে উঠতে থাকা' তার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে। গল্পের কথকের কল্পনায় 'এক গলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুল মামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয়।' আমি আর ভণ্ডুল মামা তখন অভিন্ন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেছিলেন পরিবেশ নিয়তিকে। তারাশঙ্কর জেনেছিলেন সমাজনিয়তিকে। জ্যেষ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো নিয়তির রণাহ্বান গ্রহণ করেননি। তাঁর গল্প কোনো সময় মৃত্যুর গল্প নয়, জীবনের গল্প। যে কোনো আলোচকেরই বিভূতিভূষণ-আলোচনা অতৃপ্ত থেকে যাবে যদি 'পুঁইমাচা' গল্পটিকে না ধরা হয়। আমি গল্পটির কাঠামোর দিকে বেশি আকৃষ্ট। প্রথমেই লক্ষণীয় ক্ষেন্তির মৃত্যুর প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা গল্পটিতে নেই। সেই জীবনাগ্রহে অদম্য মেয়েটির বাপের বাড়ি থেকে

রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের মতো বিভূতিভূষণও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছেন

বিদায়ের দৃশ্যটি এই—'অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারে নীলরঙের মেদি ফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কমদামের বালুচরের রাঙা চেলির আঁচলখানা পালকির বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।' এই অনুপুঙ্খ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজাগ করেন সত্যজিৎ রায়। এরপরে একটি ছোট অনুচ্ছেদে ক্ষেন্তির জন্য অন্নপূর্ণার 'মন-কেমন' করার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একবছর পরে—যে বছরটির মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে ক্ষেন্তির শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে— সে প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিক আলাপের ছাঁদে। সহায়হরি ও বিষ্ণুরাম মাছ ধরতে যাবে। চার এবং টোপের সঙ্গতি ও যৌক্তিকতা আলোচনা হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে আমরা জানলাম শ্বশুরবাড়িতে অবহেলায় ক্ষেন্তির মৃত্যু ঘটেছে। আজ আর শোকের সেই পুরানো ধার নেই। সময় সব সইয়ে নেয়। মাছ ধরার আলোচনার মাঝখানে যখন ক্ষেন্তির কথা উঠল তখন সার কথাটি যেন সহজে বলে দেওয়া হয়েছে—'ও তুমি ধরে রাখো, ওরকম হবেই দাদা'। এই অংশে সহায়হরি যখন বলেন— 'যাক, তা চলো যাওয়া যাক বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে?'— তখন ক্ষণকালের জন্য আমাদের মনে হয়, আমরা যেন পরাভূত —আমাদের আঁকড়ে ধরার কিছু নেই। প্রবহমান কাল আমাদের কোনও কিছুর তোয়াক্কা করে না। কিন্তু গল্পটি তো ক্ষেন্তির মরণের গল্প নয়। এ গল্প ক্ষেন্তির জীবনের গল্প। অন্নপূর্ণা যখন আবার পৌষের রাত্রে কাচ্চা-বাচ্চাগুলিকে পিঠে গড়ে খাওয়াতে বসেছে তখন একটি শিশু সরল অনিবার্যতায় দিদির পিঠে-ভালবাসার কথা বলে ফেলল। সেই মুহূর্তে সত্য হয়ে উঠল ক্ষেন্তির পুঁতে রেখে যাওয়া পুঁইমাচা। বর্ষার জল পেয়ে শরতের শিশির পেয়ে সেই পল্লবিত লতায়িত পুঁইমাচা হয়ে উঠেছে প্রবর্ধমান জীবনের স্মারক। 'প্রতীক টতিক' এ সব কোন কথাই তাঁকে বলতে হল না। মাচার উপর একটা পুঁইঝাড় চড়িয়ে দিয়েই তিনি যা বলার সব বললেন

'কিন্নর দল' গল্পটির কথা এই সূত্রে আমরা স্মরণ করছি এই জন্য যে, সেখানেও শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে জীবন। শ্রীপতির বউ ছোট মাপের গ্রাম্য ডোবায় জীবনার্থের যে হদিশ দিয়ে গেল সেও আবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রাণের জয়। অলক্ষ্যে বিভূতিভূষণ এখানে রবীন্দ্রনাথের ছায়ানুসারী। তাঁর গল্প-নির্মাণের মৌলিকতায় সে ছায়া অবশ্যই দুর্লক্ষ্য। আবার পটভূমি নির্মাণে শরৎচন্দ্রী উপাদানের প্রয়োগও আমাদের নজর এড়ায় না। আলাদা করে উল্লেখ্য তাঁর 'ডাক গাড়ি' গল্প। গল্পের নায়িকা রাধা। বিধবা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে বাপের ঘরে। বৈমুখ্য তার চারিদিকে। যে ডোবায় সে বাসন মাজতে নামে, সেই ডোবার চেয়েও ঝুপসি অন্ধকারে ঢাকা তার জীবন। এক বিবর্ণ পৌনঃপৌনিকতায় সে আবদ্ধ। লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চনা, অবমাননা জট পাকিয়ে রয়েছে তার জীবনে। অহঙ্কৃতা পড়শিনীর রবীন্দ্রসংগীত তবু তাকে উতলা করে। তবু সে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চায়, ভালবাসতে চায়। দুর্মর তার সেই জিজীবিষা, ক্ষেন্তি দুর্গা রাধা—বিভূতিভূষণের একই মানসকন্যার নানা নামরূপ। বিধবা রাধা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল তার হারছড়া আদায় করতে। ফিরে আসতে হল তাকে রিক্ত হাতে। প্রায় তার ঝাঁটা খেতে বাকি ছিল। ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুৎপীড়িত রাধা আর তার সঙ্গের ছোটভাই ফেরবার পথে রানাঘাট স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সেখানে সে

মানবীয় সম্বন্ধের যে-বেদনা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, বিভূতিভূষণ তাকে অনবগুণ্ঠিত করেছেন এইসব গল্পে। এবং তিনি একাজ করেছেন কোনো তত্ত্বপ্রণোদনা বা বৌদ্ধিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে নয়। তাঁর একান্ত মানবীয় বিশ্বাস, ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তাঁর এই আবিষ্কারের মূলে।

প্রথম দেখল ডাকগাড়ি— আপ দার্জিলিং মেলের রাজকীয় বর্ণোজ্জ্বল সমারোহ। উদ্ধৃতি এখানে অপরিহার্য: 'সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীত—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল, এই ভালো কাপড়-চোপড় পরা সুন্দর চেহারার মেয়েপুরুষ বালক বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ'আনা পয়সা খরচ করিয়া রানাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুবি-র হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার—সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ'ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়।' রাধার বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে যখন সময়ে দার্জিলিং মেল ছেড়ে গেল রানাঘাট স্টেশন। 'সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে।' —রাধার জগৎ যেন পালটে গেল। দরিদ্র রাধা মনের সেই বৈভবের সন্ধান পেয়ে গেল, যার জোরে সে চার-চারটে পয়সাই চা খেয়ে খরচ করে ফেলল। রাধার মানসিক পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রকৃতিপ্রেমের সাধুবাদে খ্যাত বিভূতিভূষণ কোনো প্রাকৃতিক চিত্রকে সামনে আনলেন না। অসামান্য বিষয়জ্ঞানে তিনি বুঝে নিলেন অন্ধকার ডোবা থেকে উঠে আসা রাধার চিদগত হতাশা ভঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দরকার। রেলগাড়ি শিল্পবিপ্লবের দান। জীবনকে তা একটানে নিয়ে যায় সঙ্কীর্ণতা থেকে বিশালতায়। মধ্যযুগীয় ঘেরাটোপ থেকে তা জীবনকে নিয়ে যেতে চায় চলিষ্ণু গতিছন্দে। পয়সা আধলার হিসাব থেকে সে মুক্ত হল— অন্তত এক লহমার জন্য হলেও হল। এর মধ্যে যাঁরা রাধার পেটি বুর্জোয়া মানসিকতার পরিচয় পাবেন, তাঁদের সমাজতত্ত্ব গরহজম হয়েছে রাধা অনুভব করতে পারল জীবনের অশেষত্ব, অনুভব করতে পারল তার চাপাপড়া ব্যক্তিসত্তার জাগরণ। এও সেই প্রবর্ধমান জীবনের কথা। এই সূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়। কোনো এক অনুষ্ঠানে এক সন্ধ্যায় একদা রমা দেবী ও তারাদাসের সৌজন্যে বিভূতিভূষণের একজোড়া পরিত্যক্ত জুতো দেখার সুযোগ হয়েছিল। ক্লাসিক স্থিরচিত্রের মতো সেই পথরেখা-লাঞ্ছিত জুতো জোড়া যেন পথিকের ক্লান্তিবিহীন পথচলার খবর দিচ্ছে। কিশলয় ঠাকুরের অনবদ্য বইখানির সহযোগে আমার মনে পড়ে পথিক বিভূতিভূষণের মানুষ খুঁজে ফেরা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের নতুন মাত্রা এই পথের মানুষটির আবিষ্কারে ধরা পড়েছে। 'নসুমামা ও আমি', 'বেনীগীর ফুলবাড়ি', 'হিঙের কচুরি' প্রভৃতি গল্প এবং পৃথকভাবে 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্প এখানে উল্লেখ করি। সম্পর্কের একরৈখিক প্যাটার্নকে পাশ কাটিয়ে, প্রথাগত সীমার বাইরে মানবীয় সম্বন্ধের যে-বেদনা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, বিভূতিভূষণ তাকে অনবগুণ্ঠিত করেছেন এইসব গল্পে। এবং তিনি একাজ করেছেন কোনো তত্ত্বপ্রণোদনা বা বৌদ্ধিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে নয়। তাঁর একান্ত মানবীয় বিশ্বাস, ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তাঁর এই আবিষ্কারের মূলে।

নয়

ত্রিশের দিনগুলিতে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় আজও বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন তাঁদের নিজ নিজ

স্বাতন্ত্র্যের জন্য। যে-স্বাতন্ত্র্যের তারতম্য নির্ণয় আজ আমাদের কাজ নয়। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় বলা চলে। এঁদের মধ্যে সব থেকে একক ও অননুকরণীয় বোধ হয় বিভূতিভূষণ। যখন ভাবা যায় 'আরণ্যক'-এ একটা জন্ম নেই, একটি মৃত্যু নেই, যখন ভাবা যায় 'অশনিসঙ্কেত'-এ জন্মের কাহিনী আছে মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে, যখন ভাবা যায় 'বেনীগীর ফুলবাড়ি'র মতো সমাজনীতি নিরপেক্ষ গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু তাঁর গল্পে চুম্বন বা আলিঙ্গনের দরকার হয় না প্রেমের গল্পের জন্য, তখন অসংশয়িত হয়ে উঠি তাঁর স্বাতন্ত্র্যে। বৃদ্ধের গল্প রবীন্দ্রনাথে নেই, 'কল্লোলী'দের মধ্যে খুব কম, তারাশঙ্করে বিরল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে আছে—কিন্তু বিভূতিভূষণে যেমন আছে তেমন নেই। শিশু ও বালক রবীন্দ্রনাথের গল্পে আছে। তারাশঙ্করে 'ট্যারা'য় আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেই। বিভূতিভূষণে অবশ্যই আছে। চেখভের 'ভান্‌কা' যেমন শিশুর প্রতি অবিচারের এক দারুণ দুঃসহ গল্প, শিশুর প্রতি অবজ্ঞার এক অতীব মর্মস্পর্শী গল্প তেমনই বিভূতিভূষণের 'তালনবমী'। কিন্তু বৃদ্ধদের নিয়ে লেখা গল্পে বোধহয় বিভূতিভূষণ সবাইকে ছাড়িয়ে যান। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লেখকের অভিজ্ঞতায় একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র দখল করে রেখেছে। দ্রবময়ী, নিস্তারিণী, দাদু, অথর রামরতন, 'ঝগড়া' গল্পের কেশব, কবি কুণ্ডুমশাই নানা চরিত্রে বিচিত্রভাবে বৃদ্ধের হতাশা বিষয়ীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শতাবধি গল্পে বৃদ্ধের বিপর্যয় কখনো বিষয় মর্যাদা পায়নি। অথচ বিভূতিভূষণের গল্পে এটা একটা পুনরাবৃত্ত বিষয়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ইন্দির ঠাকরুণ থেকে ব্যাপারটি শুরু হয়েছে। 'বিপিনের সংসার'-এ কামিনী চরিত্রে তা অন্য স্তরে গাঢ়তা পেয়েছে। যে মানুষটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে ছিলেন সানুপুঙ্খ, তিনিই তো দেখতে পাবেন প্রথম কিশলয়ের পাশাপাশি শুকিয়ে যাওয়া বিবর্ণ বাতিল পাতার অবস্থানের রহস্য। সময়—সময়ের দ্বারা স্পৃষ্ট জীবন তাঁর সমস্ত রচনার শেষ ভাষ্য রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এত কথার পরে একটা ব্যাপারে আমার বিস্ময় জাগে। উনিশশো বিরাশি সালের সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ'-এ এক প্রজন্মের প্রায় আধ ডজন লেখক তাঁদের সাহিত্যজীবনের কথা লিখেছেন—এক আধজন এক আধবারের জন্য ছাড়া 'মিষ্টি লেখক' বিভূতিভূষণের কথা উল্লেখই করেননি। তা হলে কি চারের দশকে যখন এঁদের লেখক-জীবনের যৌবন সন্ধি রচিত হচ্ছে, তখনকার বাস্তবতার ধাক্কায়

কোনো এক অনুষ্ঠানে এক সন্ধ্যায় বিভূতিভূষণের একজোড়া পরিত্যক্ত জুতো দেখার সুযোগ হয়েছিল। ক্লাসিক স্থিরচিত্রের মতো সেই পথরেখা-লাঞ্ছিত জুতো জোড়া যেন পথিকের ক্লান্তিবিহীন পথচলার খবর দিচ্ছে।

বিভূতিভূষণের পথ অনেক দূরে গেছে বেঁকে! বুঝলাম মার্কসবাদের ভুল তাত্ত্বিক প্রয়োগে জীবনানন্দকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে—'তাঁর কল্পনার স্বাধীনতা মানুষের হাতের শৃঙ্খলকে চিরস্থায়ী করে।' এটা উনিশশো বাহান্ন সালের কথা। তার প্রায় এক দশকেরও বেশি আগে নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেছিলেন—অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও দৃষ্টির অগভীরতার জন্য অপুর জীবনবোধ প্রগাঢ় হয়নি। বলেছিলেন—'গভীরতা ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা।' স্বাধীনতার অথবা কেন্দ্রীয় চরিত্রের দুর্বলতা-সবলতা বিচারের মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু আমাদের ভাবিত করে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য—'অপু চরিত্র সম্বন্ধে নীরেন্দ্রনাথের যে-অভিযোগ তা যথার্থ। চরিত্র হিসাবে অপু যে একেবারেই জটিল নয় এবং সে অর্থে অপরাজিত নয়, অপরিণত এ কথা ঠিক।' মনে হয় সে কথা ঠিক নয়। 'ধাত্রী দেবতা'র শিবনাথের পরিণতি অপুতে আশা করা অসঙ্গত। তবে এ সমস্ত তাত্ত্বিক বাদ-প্রতিবাদ দূরে রেখে পূর্বোক্ত লেখকদের বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অথবা বিস্মৃতি আমাদের পীড়িত করে।

ঠিক পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের ব্যাপারটি কিন্তু একটু অন্য রকম। চমৎকার বললেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—'শৈশব যার পকেটে নেই তার পক্ষে প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে যাওয়া অর্থহীন। আবার এই শৈশবই যদি শুধুই নস্টালজিয়া হয়ে ওঠে—তবে তা সাহিত্যের পক্ষে বিড়ম্বনা।' বলেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—'অপু শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের অখণ্ড অভিজ্ঞতা পেয়েও শুধু তীব্র আকুতিটাই থেকে গেছে। জীবনের যা কিছু শিক্ষা, তার বেশিটাই হয়তো শিখিয়েছিল সেই প্রাকৃতিক পাঠশালা।' বলেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—'শৈশবের দিকের জানালাটা খুলে মাঝেমাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকি। বেঁচে থাকার অনন্ত পিপাসা জেগে ওঠে, বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। অপুকেও ছাড়েনি তার নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। বহু দেশ ঘুরেও সেই প্রকৃতিমুগ্ধ শৈশবপ্রেমিক অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুরই হয়ে রইল মায়ের কোল। কতবার মনে হয়েছে, আমিই অপু।' 'শেষপর্যন্ত আমি অপু নই'—সে তো ঠিক কথাই, কিন্তু 'আমিই অপু'। এক কথার অনুষঙ্গে মনে পড়ে যায় শীর্ষেন্দুর 'পারাপার'-এর ললিতের আবার মায়ের কোলে ফিরে আসার বাসনা। 'আমি অপু নই'। তাই অপুর দেখা আর 'উজান' উপন্যাসে কথকের দেখা এক নয়। সে যখন বলে : 'এই মাঠ, ঘাট, নদী, আকাশ—এ সবই পৃথিবীর শেষ কথা নয়। এর অদৃশ্যে আরো এক জগৎ রয়েছে। সেখানেও আছে গাছপালা, মায়াবী আলো আর ছায়া, ক্ষেত, পরিশ্রমী মানুষেরা। কোথাও একটা দরজা আছে, যেটা খুললেই সেই অন্য জগতের মধ্যে পা দেবো।' তখন আমরা বুঝি অপুর ভাবনার সঙ্গে এই ভাবনার মিলের থেকে অমিলটাই বেশি। 'যাও পাখি' উপন্যাসে প্রকৃতির বুকে ফিরে যাবার যে প্রস্তাব তা কিন্তু বিভূতিভূষণের 'নদীর ধারে বাড়ী' গল্পের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাগরিকতা-পীড়িত দূষিত অস্তিত্বে বিভূতিভূষণের গল্পটি একটি ইউটোপিয়ার সন্ধান দেয়। শীর্ষেন্দু তাকে যৌক্তিকতায় যথেষ্ট আধুনিক করে তোলেন। শীর্ষেন্দু ছাড়া গ্রামবাংলার পরিবর্তনমুখী প্রকৃতিপট যাঁরা তাঁদের উপন্যাসে গল্পে ব্যবহার করেছেন,

তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এঁরা সকলে নিজ নিজ পদ্ধতি প্রকরণে দেখালেন, প্রকৃতি ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়। সমরেশ বসু এবং মহাশ্বেতা দেবী যে-অরণ্য ও আরণ্যকের কথা বলেছেন তাও ইতিহাসস্পৃষ্ট। 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ অন্তত তার আভাসটুকু দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের পরে যিনি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট অর্থে প্রকৃতিসজাগ লেখক, তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। একটি আপাততুচ্ছ প্রসঙ্গ তুলে কথাটি শুরু করছি। সাধারণত বাঙালি লেখকদের গল্পে উপন্যাসে রসনাসম্ভোগের কথা কম থাকে। খাওয়াদাওয়ায় বাঙালির আগ্রহ কিছু কম নয়। কিন্তু সে কথা বলবার বেলায় বড়ই কৃপণ। ব্যতিক্রম দুজন বিভূতিভূষণ আর লীলা মজুমদার। এঁরা দুজন ছাড়া তৃতীয় যে-লেখক রসনেন্দ্রিয়কে উপেক্ষণীয় ভাবেননি তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এই অবধানতা তাঁর এসেছে বৃহত্তর সমগ্র অস্তিত্ব-অবধানতা থেকে—বিভূতিভূষণের মতোই প্রকৃতি সচেতনতা যার একটা বড় অংশ। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি সচেতনতায় প্রকৃতিকে কখনো বাইরে থেকে দেখা হয়নি। ধরা যাক অপুর কথা। অপুর সমগ্র অস্তিত্বের অংশই হচ্ছে প্রকৃতি। সেক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতিচেতনা জটিল জীবনের প্রতিস্পর্ধী। 'বনের রাজা' গল্পের মতি অবশ্যই অপু নয়। সারদা যেখানে বলেন, 'শহরের পুরনো পচা আকাশের নিচে থেকে ওদের ইমারতের স্বপ্ন দেখতে দে, কল ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতা গুটিয়ে নিতে দে' তখন মতির যে-দৃষ্টি খুলে যায় তা অপুর ধীরে ধীরে ক্রমার্জিত চেতনা থেকে আলাদা। আদিম প্রাকৃতিকতার যে প্রতীকে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় মতির দাদু, তা অপুর অর্জন নয়। মতির দাদুর গায়ের গন্ধ আর সমস্ত প্রাকৃতিক গন্ধ এক হয়ে যায়। তার ছটফটানির মধ্যে রয়েছে যে জটিল আকুলতা, সে আকুলতা অপুর ছিল না। প্রকৃতির উপাদানে প্রতীক নির্মাণের যে-পারদর্শিতা তা একান্তভাবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর। 'গিরগিটি' গল্পের গিরগিটি ও জোনাকি মায়ার কাছে দুভাবে নিয়ে আসে জীবনের সহজ স্বভাবে আমন্ত্রণ। লক্ষ করেছি আমরা প্রকৃতিসজাগ মানুষ মাত্রেই কালসচেতন। এখানে আবার বিভূতিভূষণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাধর্ম্য। 'গাছ' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র প্রকৃতির যে স্বচ্ছন্দের কথা বলেন, বিভূতিভূষণের [illegible] গল্পেও তা আমরা পেয়েছি।

[illegible] আমরা বুঝে নিতে পারছি, বিভূতিভূষণ মানে নয় শুধুই প্রকৃতি-ব্যাকুলতা। এটা তো কোনোমতেই ঠিক কথা নয় যে তিনি আমাদের মধ্যে একটা বিধুরতা জাগিয়ে তোলেন মাত্র। তাঁর আসল ক্ষমতা চরিত্র এবং জীবনের নতুন নতুন মাত্রা নির্ণয়ে। তিনি কোনো অনুগামী রেখে যাননি—সেটা তাঁর ত্রুটি নয়। এটা খুব দুঃখের বিষয় এখন তাঁর প্রধান পরিচয় হয়ে রয়েছে সত্যজিৎ রায় তাঁর বই নিয়ে ফিল্ম্ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় তাঁর চরিত্রকল্পনায়। আমাদের গ্রামীণ পটভূমিতে কত যে অভিনব চরিত্র সম্ভাবনা নিহিত হয়েছিল তা তাঁর আগে কেউ উদ্ঘাটিত করেননি। জীবনের জটিলতা অপেক্ষা জীবনের বৈচিত্র্য তাঁকে টেনেছিল বেশি। আমরা একটু আগে তাঁর লেখা 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি' গল্পের উল্লেখ করেছি। সে গল্পটি ছিল বাড়ি না-হয়ে ওঠার গল্প। এই সঙ্গে এখন উল্লেখ করছি 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' গল্প। এ গল্পটি বাড়ি হয়ে ওঠার গল্প। বাড়ি হয়, কিন্তু সে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কেউ থাকে না। যিনি প্রথম বাড়ি ফেঁদেছিলেন তাঁর সমস্ত শ্রম ও স্বপ্ন শেষপর্যন্ত কালের হাতে ন্যস্ত। কেউ সেখানে থাকে না। 'স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর তৈরি প্রথম আমলের সেই একতলা বাড়ির ছাদ কয়েক বৎসর বর্ষার জল খাইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সাপের ভয়ে আজকাল ডাক্তারের ভিটার ত্রিসীমানা কেহ মাড়ায় না।' দুটো গল্প মেলালে আমরা এক অপরূপ জীবনদ্রষ্টা বিভূতিভূষণকে পাই। মহাকালের প্রেক্ষাপটে আমাদের সব আয়োজন, উদ্যম জয় পরাজয়ের উল্লাস ও বেদনা শেষ অবধি সমান নিরর্থক। দুটি গল্প যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে একথাই বলছে— অনিবার্য কাল-নিয়তি বার বার আমাদের টেনে নেবে বটে, তবু হারায় না আমাদের উদ্যম। হলুদ বনে নাকছাবিটি হারিয়ে যায়—থামে না তাকে খুঁজে ফেরা। শেষ রোগশয্যায় শুয়ে বিলীয়মান দুর্গা অপুর কাছে জানিয়েছিল তার শেষ সাধ—তার একবার রেলগাড়ি দেখার সাধ। এ কি শুধু বালিকার কৌতূহল! নীরেনের সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠলে অপু তাকে বলেছিল—'তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাস্টারমশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে—রেলে যেতে হয়—দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।' অনেকক্ষণ বাদে রেলগাড়ির ছবি মনের মধ্যে বইয়ে দেখা ছবির আদলে গড়ে তুলতে তুলতে সে অপুকে বলে—'তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।' নীরেনের সঙ্গে তার বিয়ের কথা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু রেলগাড়ির স্বপ্ন এই বালিকার মনে গাঁথা থাকে। সোনার সিঁদুরকৌটোর ঘটনায় যেদিন দুর্গা নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হল সেটা এর পরের ঘটনা। তারও পরের ঘটনা দুর্গার মৃত্যু। এই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সে অপুকে বলেছে—আমাকে একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি? জীবন করুণাময় একথা কখনো বিভূতিভূষণ বলেননি। জীবন এবং প্রকৃতি সমান্তরাল বয়ে চলেছে। সময় বা ইতিহাস দুইভাবে উভয়কেই স্পর্শ করে। দুর্গা এবং অপুর জীবনে রেলগাড়ি এইভাবে হয়ে উঠেছে দূরের ডাকের প্রতীক।

বর্ষার অঝোর ধারায় ভিজে যাওয়া গ্রামপথে ঘেঁটকোল ফুলের গন্ধ পেলে আজও থমকে যেতে হয়। তখনই মনে হয় তিনি আজও কত সত্য! প্রকৃতি বিশাল! সংসার দরিদ্র! কিন্তু দুয়ে মিলে জীবনের অনুভূতি তো দরিদ্র নয়। বিভূতিভূষণ তা বারে বারে মনে করিয়ে দেবেন।

শাবলতলার মাঠে সৌন্দর্য এবং নির্জনতা কতদিন হল হারিয়ে গেছে। জমির করাতীর বুড়ি বিধবা মাটি মুড়ি দিয়েছে কতদিন হল। শেষ এক কোদাল মাটি দিয়েছিলেন সেখানে লেখক। দিতে দিতে তাঁর মনে হয়েছিল এই বুঝি বুড়ি ডেকে উঠবে 'অ-মোর গোপাল'। অন্ধকার বিজনে ব্যর্থকাম মনি ডাক্তার একা বসে থাকে। ফাগুনে বনে ফুল ফোটে, কোকিলের ডাক পথে পথে, মুচকুন্দ চাঁপার গন্ধে ঘাটের রানা ভুর ভুর করে। পাঁচী যায় জ্যাঠামশায়ের কাছে যোগবাশিষ্ঠ শুনতে—সম্পূর্ণ রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছতে হয়। এ সব গল্প এমন করে আর লেখা হবে না। কিন্তু বর্ষার অঝোর ধারায় ভিজে যাওয়া গ্রামপথে ঘেঁটকোল ফুলের গন্ধ পেলে আজও থমকে যেতে হয়। তখনই মনে হয় তিনি আজও কত সত্য! প্রকৃতি বিশাল! সংসার দরিদ্র! কিন্তু দুয়ে মিলে জীবনের অনুভূতি তো দরিদ্র নয়। সেই অফুরন্ত জীবনের বাগানে আমাদের সকলের হয়ে সেই বালিকা, সেই প্রাণোচ্ছলা প্রতিমা আজও হারানো নাকছাবিটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিভূতিভূষণ তা বারে বারে মনে করিয়ে দেবেন।

আরণ্যক : লোকায়ত-পাঠ

সু ধী র চ ক্র ব র্তী

অরণ্য আদিম। মাটির কাছাকাছি কিছু সহজ সরল মানুষ। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। প্রকৃতির লেখা নিসর্গের কবিতা। ঘোড়সওয়ার বিভূতিভূষণ। উপলব্ধির সেই সঞ্চয় থেকেই নিঃসৃত হয়েছিল অনেক পরে আরণ্যকের মতো মহৎ উপন্যাস।

'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।'

'স্মৃতির রেখা', ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

উনিশ শ আটাশ সালে নির্জন ডায়েরির এই অঙ্গীকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করেন আরও প্রায় এক দশক পরে, ১৯৩৭ সালে, যখন 'প্রবাসী'-তে বেরোতে থাকে ধারাবাহিক রচনা 'আরণ্যক'। জঙ্গলবাসের স্মৃতির রেখা তখন কি মুছে গেছে, নাকি তখনও জীবন্ত? সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায় যখন দেখি আরণ্যকের বিস্ময়কর বর্ণনাবহুল বর্ণময় ডকুমেনটেশন। কেবল সজীব গতিশীল প্রকৃতির নয়, ব্রাত্য মানুষেরও। কেমন করে পারলেন এমনভাবে স্মৃতিকে তরতাজা রাখতে, সে-প্রশ্ন আনত হয় শতবর্ষের বিগ্রহ বিভূতিভূষণের সৃজনপ্রতিভার স্মরণে। নাকি নিসর্গ ও মানুষকে নিয়ে কৌতূহল তাঁর আশৈশবের লালিত এক অন্তঃশীল ধারাবাহিকতা, যাতে একটা ব্যাপক ও গভীর মাত্রা আনে পূর্ণিয়ার জঙ্গলমহালের যাপনগত প্রত্যক্ষতা? এক দশক পরে লিখতে বসেও তাই টলে না স্মৃতির রেখা, ধূসর হয় না পরিপার্শ্বের টান।

এবারে মূল কথাটা বোঝাতে, কয়েকটা জীবনতথ্য উঠে আসবে। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতে করতে ওই খেলাত ঘোষেদেরই বিস্তৃত জঙ্গলমহাল এস্টেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে বিভূতিভূষণ গিয়েছিলেন ভাগলপুরে ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে। তখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত। পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে মাত্র গোটাচারেক গল্প। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ তাঁর জঙ্গলবাসের পর্ব। ১৯২৮ সালে নিবিড় অরণ্যানীতে বসেই তাঁর 'পথের পাঁচালী' রচনা শুরু হয়। 'আরণ্যক' লেখার সঙ্কল্প ওই ১৯২৮ সালেই। কিন্তু ১৯২৯ সালে অরণ্যের প্রত্যক্ষতা থেকে তিনি চলে এসেছেন কলকাতায়, চাকরি করতে শুরু করেছেন খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশনে, শিক্ষকতায়। আরও আট বছর পরে কলকাতায় বসে শুরু করবেন 'আরণ্যক', বেরোবে দু বছর ধরে 'প্রবাসী'-তে। ততদিনে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'-র বিখ্যাত লেখক। কিন্তু এ কথা ভাবতে অবাক লাগে যে, নিবিড় জঙ্গলের মায়াময় নিঃসঙ্গতায় বসে তিনি লিখেছিলেন নিশ্চিন্দিপুরের পাঁচালি, আর কলকাতার কলকোলাহলময় ঘনবসতির মধ্যে বসে লিখেছিলেন অরণ্যজীবনের শান্ত ঔদাসীন্য। বীজ নিষেকের কাল থেকে চারা গজানো পর্যন্ত একটা সময় ও জলমাটির শুশ্রূষা লাগে। তাঁর সৃজনস্বভাবে কোনও ত্বরা ছিল না।

> **'আরণ্যক পড়লে বোঝা কঠিন, তার কতটা উপাদান স্মৃতিজারিত অভিজ্ঞতা আর কতটা কল্পনা। লিখনশৈলীর সংবেদন এবং বিষয়বর্ণনার প্রত্যক্ষতা আরণ্যকে এত অমোঘ যে পাঠক কখনওই প্রশ্ন তোলেন না, এমন জায়গা কি আছে আর এমনতর মানুষজন!**

স্মৃতিসঞ্চয়ী অন্তর স্বভাবের এই মানুষটির রচনা 'আরণ্যক' পড়লে বোঝা কঠিন, তার কতটা উপাদান স্মৃতিজারিত অভিজ্ঞতা আর কতটা কল্পনা। কিন্তু সে সংশয় ছাপিয়ে আধুনিক পাঠকের কাছে যেটা প্রাসঙ্গিক মনে হয় সেটা এর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন। লিখনশৈলীর সংবেদন এবং বিষয়বর্ণনার প্রত্যক্ষতা আরণ্যকে এত অপরূপ ও অমোঘ যে পাঠক কখনওই প্রশ্ন তোলেন না, এমন জায়গা কি আছে আর এমনতর সব মানুষজন! হিসেব করে দেখছি, 'আরণ্যক' আমি উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে পড়েছি, পাঠক্রমের বাধ্যতায়, প্রশ্নোত্তরের কালিমা মিশিয়ে, কলেজে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের অধ্যাপকীয় ব্যবচ্ছেদের বাইরেও তো একটা স্বচ্ছ জগৎ ছিল আমার, সেই জগতে 'আরণ্যক' একটা পাকা জায়গা করে নিয়েছিল। সেই বয়সে অন্তত পনের-কুড়িবার যে 'আরণ্যক' পড়ে ফেলেছিলাম সে নিশ্চয়ই লেখার গুণে আর বিন্যাসের টানে। তারপর কত বছর কেটে গেল। কত রকমের দেশি-বিদেশি কথাসাহিত্য পড়লাম। বিভূতিভূষণ আমাদের কৈশোর যৌবনেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত কথাকার। তাঁর রচনার আরেকটি সমান্তরাল পাঠ, চলচ্চিত্র-পাঠ, আমাদেরই জীবনে ফুটে উঠল সত্যজিৎ রায়ের সৃজনে মননে। আজ শতবর্ষের আলো এসে পড়েছে এই মহান কথাকারের জীবন ও সাহিত্যে। সেই স্বতন্ত্র উদ্‌ভাসন ও বীক্ষণ থেকে আর একবার 'আরণ্যক' পড়তে গিয়ে মনে হল, আরণ্যকের আরেকটা পাঠ জরুরি, তার লোকায়ত-পাঠ। কথাটা বোঝা দরকার।

১৯২৪ থেকে ২৮ সাল পর্যন্ত বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুরের গহন জঙ্গলমহালে যে-জীবন বিভূতিভূষণ দেখেছিলেন, তাঁর ভাষায় 'গতিশীল' ও 'ব্রাত্য', তাতে নিম্নবর্গের সম্পর্কে এক অনুকম্পায়ী ভালবাসা আছে। দেহাতি মানুষ মুনেশ্বর সম্পর্কে সত্যচরণের

গুণগ্রাহীদের সঙ্গে বিভূতিভূষণ। কৃষ্ণনগর   তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

অজিত পালচৌধুরী

উপলব্ধি : 'আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো। বড় কষ্ট তো এদের!' প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের এই ধরতাই থেকে বোঝা যায় লেখকের ঝোঁক কোনদিকে। তারপরে বহুদিন ভাত-খেতে-না-পাওয়া রবাহূত মানুষজন যখন আট-দশ মাইল হেঁটে সত্যচরণের কাছারিতে ভাত খেতে আসে, তাদের দিকে চেয়ে (লেখক) অর্থাৎ সত্যচরণ লক্ষ্য করেন : 'যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়' এবং 'কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবনসংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে।' এ সব মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় একজন অন্যবর্গের লেখক এসেছেন বাংলা সাহিত্যে।

নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে উৎসাহী বিভূতিভূষণ নিরহঙ্কার ও নিরলঙ্কার মানুষ আর নিসর্গ সম্পর্কে সমান আগ্রহী। তাই তাঁর সত্যচরণ জঙ্গলমহালের পূর্ব দক্ষিণ সীমানা থেকে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি থেকে চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে এক গ্রাম্য মেলায় যান, কারণ 'এ দেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল'। গড়পড়তা শহুরে কৌতূহল একে বলা যাবে না, কারণ অনিশ্চিত প্রাকৃত অরণ্যপথে ত্রিশ মাইল ব্যবধান ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তাঁর মনের অন্য একটা টানকে শনাক্ত করে। এ টান লোক-লৌকিকের। সে মেলায় গিয়ে যে গভীরতর লাভ হল সেটা বোঝা যায় দুটি বর্ণনায়। প্রথম বর্ণনা একজন মানুষের। মেলার এক পাশে যেখানে ইজারাদারের তাঁবু সেখানে পুরনো বেন্টউড চেয়ারে সত্যচরণকে খাতির করে বসাল ব্রহ্ম মাহাতো। কিন্তু সেখানে বসে সত্যচরণ কী দেখেন? 'সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধহয় পৃথিবীতে আর দেখিব না।'

কী দেখেছিলেন সেই 'বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো' মানুষটির মধ্যে? সত্যচরণের উপলব্ধি : 'মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র-ভাব দেখিয়া।...লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশি চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven, এমনধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।'

একেই হয়ত বলে সৎ মানুষের স্বচ্ছ চোখে অনাবিল লৌকিক জগতের উদ্‌ভাসন, যা ব্রাত্য ও নিরুপকরণ। এই চোখেই মূল্য পেয়ে যায় অজানা কুসুম, অশনাক্ত বনজ লতা এবং অনাদৃত গুল্ম। একজন অপরিচিত ব্রাত্য মানুষের দীনার্ত দৃষ্টি লেখককে কেন টানে তার জবাব এলিটিস্টদের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। আরণ্যক সম্পর্কিত আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনের বহুতর নিবন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু মেলার বহু মানুষের সমাগমে ওই 'দীন-বিনম্র মুখ'-টি সম্পর্কে লেখকের আলাদা উল্লেখ ও অনুকম্পায়ী মন বিষয়ে কেউ লেখেননি। লেখেননি তার কারণ বিভূতি-সাহিত্যের যথার্থ লোকায়ত-পাঠ আজও অপেক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু সতর্ক পাঠে বারেবারে ব্রাত্য মানুষের অস্তিত্ব ও আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা বিষয়ে বিভূতিভূষণের সজাগ চোখ নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।

গ্রামে গম-কাটানোর সময় যে মেলা হয় তাতে এক আনা দামের বাজে একখানা সাবান যখন পাঁচ সের সর্ষের বিনিময়ে 'সরলা বন্য মেয়েরা' কেনে এবং ঠকে, তখন লেখক ব্যথিত হন কিন্তু তাদের সম্পর্কে এক ধরনের আর্দ্রতা জাগে। মঞ্চী সতের সের সর্ষের বদলে একছড়া সামান্য হিংলাজের মালা কেনে এবং তার 'গর্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের' আননখানি লেখক দেখতে ভুল করেন না। বিশ্লেষণ করে লেখেন : 'সত্যি, কি খুশী ও গর্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্য জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড় একটা ঘটে না।' লেখক তাই মঞ্চী-নক্‌ছেদীকে বলেন না যে গ্রাম্য ব্যাপারীর কাছে তারা কতটা ঠকেছে, কারণ 'ওর মনের এই অপূর্ব আহ্লাদ' নষ্ট করতে চান না তিনি। এই হল লোকজীবনের প্রতি যথার্থ দরদের নমুনা। এই সূত্রে শিল্পী ও অন্তর্দ্রষ্টা বিভূতিভূষণের স্বরূপ ফুটে ওঠে যখন এক বছরের ব্যবধানে মঞ্চী আর আসে না কাটুনিদের সঙ্গে, আসে তার স্বামী, সতীন ও সতীন কন্যারা। মঞ্চী নাকি কোথায় পালিয়ে গেছে। লেখকের কৌতূহল জাগে—'মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?' দেখা গেল, মঞ্চীর ফেলে-রেখে-যাওয়া ছোট বাক্সে চিরুনি, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল সবই আছে। 'সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই।' এক আঁচড়ে গ্রাম্য বালিকাবধূর অন্তর্গোপন রহস্যময় মনোজগৎ উন্মুক্ত হয়।

হোলির মেলায় অন্য এক বর্ণনা লেখকের পর্যুৎসুক কৌতূহলের অমোঘ প্রমাণ ধরে রেখেছে। মেলার নানা প্রান্তে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে : 'হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-খুশী গল্প-গুজব আদর আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল ? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এ দেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মরাকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামিগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।' জঙ্গলবাসের প্রায় এক দশক পরে আরণ্যক কাহিনী লিখতে গিয়ে বিভূতিভূষণের এই যে বিশেষ এক মেয়েলি রিচুয়াল মনে পড়া, এ তাঁর লোকায়ত জীবন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও মমতার পরিচয় বহন করে। পরিবেশ পরিস্থিতির নিখুঁত অনুধাবন এবং তার সরাসরি ডকুমেনটেশন আরণ্যকে বহুবার আসে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 'আরণ্যক' কোনও স্থায়ী জনপদ বা সমাজবদ্ধ স্থির ব্যবস্থার মানুষকে আঁকেনি। যদিও ব্রাহ্মণ-গাঙ্গোতা-দোষাদ-সাঁওতাল ও রাজগোঁড় এই সব নানা থাকের মানুষ ও তাদের বর্ণস্বভাব অরণ্যপরিবেশেও অটুট থাকে, অন্তঃশীল হয়ে থাকে বিহার অঞ্চলের সংস্কারময় আচরণবিধি তবু আরণ্যকে একটা ভ্রমণশীল লোকসংস্কৃতি বিশেষ পাঠে চোখে পড়ে। লোক-লোকায়তের স্থায়ী জনপদে বারব্রত, পার্বণ ও উৎসবে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় নাচ-গান, মেয়েলি ছড়া ও ধাঁধা, আরণ্যকে তার অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষের বয়ে-আনা সংস্কৃতি, যাকে বলে parambulating culture, তার নানা চিত্তাকর্ষক নমুনা আছে, ছাত্রজীবনের পাঠে যার তাৎপর্য পাইনি, এবারে নতুন পাঠে তা স্পষ্ট হল।

এই ভ্রামণিক সংস্কৃতি যারা বয়ে বেড়ায় তারা গরীব কাটুনি, অর্থাৎ ফসল-কেটে-বেড়ানো নারী পুরুষের সংসার। 'আরণ্যক' উপন্যাসে দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে একদল কাটুনি এসেছে ফুলকিয়া বইহারে সর্ষে কাটতে। ফসল কাটার শ্রম ও অর্থাগমের অল্প কটা দিনে জমে ওঠে অরণ্য। গাড়ি-গাড়োয়ান-মারোয়াড়ি-মহাজন এবং হালুইকর-মেঠাইঅলা-ফিরিঅলার ভিড় হয়। তারা আসে ভিন্ দেশ থেকে। রং তামাশা দেখিয়ে দু পয়সা রোজগার করতেও কেউ কেউ আসে, সত্যচরণ সেটাও লক্ষ্য করেন। নাচ দেখানো,

এক শীতের দিনে ট্রেনের কামরায় ভ্রাম্যমাণ বিভূতিভূষণ, নীরদচন্দ্র, সজনীকান্ত, বনফুল ও ব্রজেন্দ্রনাথ *হিমানীশ গোস্বামীর সৌজন্যে*

রাম-সীতা সেজে ভক্তের পূজা আদায়, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর—অরণ্যপটে যেন চলমান জীবনের নানা কুশীলবের ক্ষণ অভিনয়। সবই পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে। এই দীনতা বিভূতিভূষণের চোখে না-পড়ে পারে না, ক্ষমাশীল তাঁর অন্তঃকরণ কোন এক প্রসন্নতায় মেনে নেয় মানুষের বাঁচার সমূহ চেষ্টাকে।

ফুলকিয়া বইহারে পনের দিনের উৎসবে গরিব মানুষ সব খুইয়ে ফেলে কিন্তু খুব আনন্দ পায়। জমিদার ও মহাজনের পাইক পেয়াদারাও এ সময় এসে জোটে এবং জোর করে খাজনা আদায় করে। সত্যচরণের কাছারিতে একদিন খবর এল, একটা লোক খাজনা ফাঁকি দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছে। তাকে ধরে আনলে দেখা গেল, 'মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।' এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ব্রাত্য মানুষের কাহিনী লিখছেন বলেই বিভূতিভূষণ পলাতক অপরাধীর মধ্যে প্রথমেই দেখতে পান বুভুক্ষু মানুষটাকে। প্রশ্নোত্তরে সে জানায় তার নাম দশরথ, মুঙ্গেরের সাহেবপুর কামালে তার সাকিন, জাতে 'ভুঁইহার বাভন'। সিপাইরা জানায় মেলার এ কদিন সে 'ননীচোর নাটুয়া' সেজে নাচ দেখিয়ে ভাল রোজগার করেছে, আজ তার খাজনা দেবার কথা, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান দশরথ 'হনুমানজীর কিরিয়া' খেয়ে জানায়, 'কিছুই পাইনি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি।' শেষ পর্যন্ত জোর করে অনুসন্ধানে তার লুকানো গেঁজে থেকে বেরোয় তের আনা পয়সা। এতেই নাকি সে আগামী গম কাটার মরশুম অর্থাৎ সামনের তিন মাস চালাবে। আট আনা খাজনা দিলে হাতে থাকে তার পাঁচ আনা। তাতে কি করে চলতে পারে তিন মাস?

গ্রামীণ লোকশিল্পীদের আর্থিক দুঃসহতা আমাদের দেশে চিরকালই একরকম রয়ে গেছে। শোষণের চেহারাও একই। ননীচোর নাটুয়া সেজে দু-এক পয়সা রোজগার, তাতেও খাজনার আবশ্যিকতা বিভূতিভূষণের নরম মনকে ব্যথিত করেছে এমন আমরা ভাবতে পারি। লোকায়ত পাঠে যা ধরা পড়ে তা হল এই দৃশ্যটির অবতারণার চমৎকারিত্ব। যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেইখানে বিভূতিভূষণের পদক্রমা। আরণ্যকের সত্যচরণ অবশ্য খাজনা সমস্যার সহজ মীমাংসা করেন। দশরথকে বলেন, 'বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও খাজনার বদলে।'

নাচের বিষয় ও মান অবশ্য হাস্যোদ্রেককারী। 'গালে মুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ওই বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল' সে এক অনর্থ। সত্যচরণ নাচের শেষে হাততালি দিলেন, প্রশংসা করলেন, খাজনা মকুব হল, এমনকি দু টাকা বখসিসও দিলেন।

'আরণ্যক' পড়তে পড়তে এক-একসময় মনে হয় সত্যচরণের কাছারির সামনের বনপথ যেন রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের চিরপ্রবাহী পথের মতো। পথ বেয়ে সেখানে কুশীলবদের আসা-যাওয়া যেমন, আরণ্যকেও তেমন বহু মানুষের গমনাগমন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থিক মন্দা ও সামাজিক সংহতির ভেঙে-পড়া গ্রামের পর গ্রাম, বিহারের কুশী নদী ও কারো নদীর আশপাশের মানুষদের এক অনিশ্চিত ভ্রামণিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অনেকেই হারিয়েছিল তার জাতবৃত্তি। নানা উঞ্ছজীবী অস্তিত্ব তাদের জনপদজীবনে কোনও আশ্বাস ও স্বস্তি দেয়নি বলে তারা জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে ধরমপুর, সেখান থেকে পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ তাদের জীবনজীবিকার মরীচিকা পথ। মাঝখানে কাটুনিরা ক'দিনের গ্রাম্যসংস্কৃতির বয়ে-নিয়ে-আসা শাখাপ্রশাখায় স্নাত হয়। মঞ্চী বলে সত্যচরণকে, 'বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী।'

সত্যিই চমৎকার কিনা, বিভূতিভূষণ সে মন্তব্য সত্যচরণকে দিয়ে করাননি, কিন্তু দেখিয়েছেন গ্রাম্যসংস্কৃতির চলমানতা এবং ব্রাত্যজনের তাতে আনন্দ পাওয়ার সহজ উচ্ছ্বাসকে। পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্নরিক্ত অসহায় অরণ্যজীবী পূরণচাঁদের টিণ্ডেল বনঝাউ-বনের প্রান্তে বসে একমনে গায়: 'দয়া হোই জী'। ঔপনিবেশিক দেশে, শাসন শোষণে ত্রস্ত, বর্ণব্যবস্থায় বিপর্যস্ত গ্রাম্যমানুষ শেষ পর্যন্ত কার দয়া চাইবে? বিভূতিভূষণ সে-প্রশ্ন না-তুলে অন্য একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন তাঁর কথকের মুখে: 'আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ওই গানই গাহিবে—দয়া হোই জী'। এইভাবে গেঁথে তোলেন লেখক আবহমানের চিরচেনা অপরিবর্তনীয় লোকায়তকে।

গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির চলমানতার অন্য এক ধরন দেখি 'আরণ্যক'-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায়। কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনে সত্যচরণ বেরিয়ে আসেন। জমাদার মুক্তিনাথ সিং বলে, 'হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।' দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলে,—'হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্করবাজি নাচ'।

আরণ্যকে এই প্রথম দুটি লোকায়ত নাচের ধরন সম্পর্কে পাঠকরা জানতে পারলেন।

ক্ষুধার জ্বালায় পথে-বেরোনো এই নাচের দল সম্পর্কে সত্যচরণের মন্তব্য বেশ দ্যোতক; 'দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক আর না-জানুক পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরনের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।' অনেকক্ষণ ধরে তাদের নাচ গান শেষ হলে সত্যচরণের মনে হয়: 'অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই খাপ খায়।' এই মনে হওয়াটুকু ভারি সত্য উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। নিঃসীম নিসর্গ এবং নিভৃত বন্যতার সঙ্গে মানানসই এই ক্ষুৎপীড়িত নাচের দল একটা অন্য বিন্যাসে বিভূতিভূষণ গেঁথে তোলেন তাঁর মায়াময় রচনাসৌকর্যে। গানের ভাষা না-বোঝার জন্যই বোধহয় গানগুলি অদ্ভুত মনে হয়েছিল এমন বিশ্লেষণের সান্ত্বনা পান সত্যচরণ। কিন্তু 'এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভালো লাগিবে' এ কথা আবার তাঁর মন মেনে নেয়।

সতের-আঠারজন লোক নিয়ে নাচের দল অথচ তাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা। আমলারা একবাক্যে বলে, 'হুজুর, তা-ই অনেক জায়গায় পায় না, বেশী দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তাছাড়া বাজার নষ্ট হবে। যা রেট তার বেশী দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়ীতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।' লোকশিল্পীদের সম্পর্কে এই সীমাহীন অনুদারতা ও নির্মমতা সত্যচরণকে ব্যথিত করে। তিনি তাদের রাতে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন সকালে নাচের দলের সর্দারকে ডেকে দু টাকা দিলে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

এই নাচের দলের একটা বার-তের বছরের

ভাগলপুরে খেলাত ঘোষের বাড়ির সামনে অন্য কর্মচারিদের সঙ্গে বিভূতিভূষণ *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

যাত্রাদলের কেষ্টঠাকুরের মতো চেহারার ছেলে ধাতুরিয়া আলাদা করে সত্যচরণকে টানে। তার নাচের ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। 'একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারি শান্ত, সুন্দর চোখমুখ, কুচকুচে কালো'। তার গলার গানটি সত্যচরণের মনে গেঁথে যায় : 'রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যায় পরদেশিয়াঁ।' সত্যচরণ তাকে কাছে রাখতে চান। সর্দার তাকে নিয়ে যায় পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বেশ কিছুকাল পরে যখন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে আবার ধাতুরিয়া ও সত্যচরণের সাক্ষাৎ ঘটান বিভূতিভূষণ তখন বোঝা যায় তাঁর এই চরিত্র সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ধাতুরিয়া অনেকটা বড় হয়ে গেছে, নাচেও অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন সে একক নর্তক। হোলিতে তাকে বায়না করে আনা হয়েছে।

স্বাবলম্বী লোকশিল্পী ধাতুরিয়া 'আরণ্যক' উপন্যাসে একটা অন্য রকমের বাতাসের ঝলক এনে দেয়। রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে একক নাচগানের বিনিময়ে সে পাবে চার আনা এবং পেট পুরে মাড়া, দই, চিনি ও লাডডু। সত্যচরণ লক্ষ্য করেন, 'আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।' প্রশ্নোত্তরে জানতে পারেন, গাঙ্গোতাদের বাড়িতে নাচ গান করলে ধাতুরিয়া পায় দু আনা, খেতে পায় না কিন্তু আধ সের মকাইয়ের ছাতু মেলে। এই তা হলে তার জীবিকা। কী করে চলে তার ? সে জানায়, 'বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে ?'

লোকশিল্পীর এই অবমান ও আত্মপীড়ন কি বিভূতিভূষণকে মনে পড়িয়ে দেয় তাঁর কথক পিতা মহানন্দকে ? 'পথের পাঁচালী'-র হরিহর গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের পথে পথে, সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে আবেদন জানান : 'আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট করি—তা ছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও।' মহানন্দের আদলে গড়া হরিহর দাশু রায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের কথা ভাবেন। 'পথের পাঁচালী'-র হরিহরের স্বপ্ন : 'ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

'বাঃ ! চমৎকার তো ! কার বাঁধা ছড়া ?—"কবির গুরুঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের ?

'—না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।' পথের পাঁচালীর হরিহরের এই স্বপ্ন বাস্তবের প্রহারে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার রচনা, খাতাপত্রের বাণ্ডিল, বাক্সের অনাদৃত গুপ্ত কোণে লুকিয়ে থেকে হারিয়ে যায়।

আরণ্যকের ধাতুরিয়ার মরমী চিত্রণে বিভূতিভূষণ কি তাই হরিহরের স্বপ্নের জগৎকে আরেকবার টানতে চান ? সত্যচরণকে ধাতুরিয়া বলে, 'যখন নাচের বায়না থাকে না, ক্ষেত-খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশী

রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ি থেকে পূর্ণিমা রাতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘোড়সওয়ার সত্যচরণের পিছনে ধাতুরিয়া ছুটে আসে। তার রুদ্ধশ্বাস আবেদন : 'হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন ?'

কেন কলকাতা যাবার এত আকুলতা ? ধাতুরিয়া বলে, 'কখনও কলকাতায় যাইনি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলতে বসেছি। উঃ কি করেই ওই নাচটা শিখি ! সে কথা শোনার জিনিস।'

লোকশিল্পীর এই অনাদর ও অন্তর্বেদনা বিভূতিভূষণ আরণ্যকে ইচ্ছে করেই সংযোজন করেছেন। মটুকনাথের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ, যুগলপ্রসাদের অনন্য পুষ্পপ্রীতি, সুসম্মত কুন্তার আত্মসম্ভ্রমবোধ, দোবরু পান্নার জাতিগত অহঙ্কারের পাশে ধাতুরিয়ার শিল্পপিপাসার বিপন্নতা অন্য এক দ্বন্দ্ব জাগায়। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বিভূতিভূষণ ধাতুরিয়ার মুখে তার নাচ শেখার দুরূহ অন্বেষার বিবরণ দেন এইভাবে : 'সবাই বলত গয়া জেলার এক গ্রামে ভিটলদাস বলে এক গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ।...গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।... যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। কি খুশীই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব ! যেন একটা তালুক পেয়ে গিয়েছি ! ...ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ী।' তরুণ গ্রাম্যশিল্পীর শিল্প-এষণার কাহিনী, তার আবেগ ও আকুলতাসহ, হাজির করেন : 'হেঁটে গেলাম সেখানে। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমি বললাম, আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম, আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন, আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই নাচের চর্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায়নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব।'

ধাতুরিয়াকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে যে কোনও সুরাহা হবে না সত্যচরণ তা বুঝে তাকে শুধু বলেন একদিন কাছারিতে আসতে। তাঁর মনে বোধহয় ইচ্ছা জেগেছিল ধাতুরিয়ার অনিশ্চিত এবং ভবিষ্যৎহীন ভবঘুরে জীবনের বদলে জমি দিয়ে পুনর্বাসন। একদিক থেকে 'আরণ্যক' উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের নানা মাত্রার উপাখ্যান। অবজ্ঞাত বনকুসুম থেকে নিরুপাধি প্রাকৃত মানুষকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠাদান এ-রচনার মূল লক্ষ্য। দেবী সিংহের বিধবা পত্নী কুন্তার ভিক্ষাজীবী জীবনের অবসান ঘটে সত্যচরণের সদিচ্ছায় জমি পেয়ে। রাজু পাঁড়ের মতো দার্শনিক স্বভাবের কিন্তু পরোপকারী সমাজসেবক তাঁর প্রশ্রয়ে জমি পায় প্রায় বিনামূল্যেই। প্রকৃতিপ্রেমিক যুগলপ্রসাদের সাহায্যে অরণ্যে পুনর্বাসিত করেন কত রকমের ফুল ও লতা। তিন বছর পরে এক বর্ষামুখর শ্রাবণদিনে ধাতুরিয়া কাছারিতে এসে বলে : 'বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখেনি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি বাবুজী।'

ক্ষুৎকাতর শিল্পীর অদম্য কলাসৃষ্টির চেষ্টাকে বিভূতিভূষণ এভাবে সম্মান দেন। কেউ যার নাচ দেখে না তার স্পৃহা কিন্তু মেটে না, সে আরও ভাল ভাল নাচ শেখে। আস্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি এমন আকুলতা, জাতিবৃত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার মরীয়া চেষ্টাকে সত্যচরণ আগে আরেকবার সম্মান দিয়েছিলেন সংস্কৃত টোল খুলে, জমি দিয়ে, ব্রাহ্মণ মটুকনাথকে। এ হয়ত মহানন্দ বা হরিহরের অন্য এক ধরনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ভ্রাম্যমাণ নর্তকজীবনের উৎকণ্ঠা ধাতুরিয়াকে আরও শীর্ণ করে দিয়েছে, সত্যচরণের বৎসল চোখে পড়ে। তাকে খেতে দেওয়া হয় দুধ চিঁড়ে। তার খাওয়া দেখে মনে হয় সে অন্তত দু দিন খায়নি। খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত ধাতুরিয়া সন্ধ্যার আগে নাচ দেখায়। বন্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে থাকে বিনোদনস্পৃহা। থাকে লোকনৃত্যের সমজদার। তারা ভিড় করে নাচ দেখে, পয়সা দেয়। সত্যচরণের মনে হয় 'ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে।' পরদিন সকালে সে বিদায় নিতে এসে আবার তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার অভিলাষ জানায়। সত্যচরণ তাকে জমি দিয়ে স্থিতু করতে চান। ধাতুরিয়া বলে, 'আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে ? ওদিকে আমার মন নেই যে। নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা বেশ খুশী থাকে।' আপাতত সে তাই আট ক্রোশ রাস্তা হেঁটে ঝল্লুটোলায় এক ভুঁইহার বাভনের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নাচ দেখাবার সম্ভাবনার পথে পা বাড়ায়। ঝল্লুটোলা থেকে ফিরে এসে জমির ব্যাপারটা ভাববে এমন কথা দিয়ে তবু বলে, 'এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না ? ওখানে নাচের আদর আছে।'

ধাতুরিয়াকে বিভূতিভূষণ এই দৃশ্যের পর তাঁর উপাখ্যান থেকে বিদায় দেন। মাস দুই পর কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে রেললাইনে ধাতুরিয়ার ছিন্ন মৃতদেহের সংবাদ আসে। সেটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা সে প্রশ্নের নিরাকরণ হয় না। কিন্তু লেখক ফুটিয়ে তোলেন একজন শিল্পীর অভিমানী আত্মনিষ্ক্রমণের ব্যথাবেদনার নির্বেদ। সত্যচরণের স্মৃতিতে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা পায় যে ধাতুরিয়ার মধ্যে 'যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।' সম্ভবত আরণ্যক আখ্যানে এই মন্তব্য ব্রাত্য শিল্পজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে অদৃশ্য কিন্তু সমুজ্জ্বল এপিটাফ।

দেখতে দেখতে সত্যচরণের উদ্যমে নাঢ়া লবটুলিয়া তার শান্ত বনশ্রীর গায়ে গায়ে গড়ে তোলে কলকোলাহলময় ছোট জনপদ। সেখান থেকে চিরবিদায় নেবার সময় সত্যচরণ দেখতে পান : 'বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চিৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা।' এত রকমের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মকর্ম, সংস্কার ও বর্ণব্যবস্থা কিছুই চোখ এড়ায় না লেখকের। ছটপরবের আয়োজন, তার জন্য পিঠে বানানো, সেই পিঠে খাবার জন্য লালায়িত মানুষের অপরিমিত বদভ্যাস সবই আসে লেখার টানে। সত্যচরণ উপলব্ধি করেন এলাকার সব মানুষই যদিও হিন্দু কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার জায়গায় তারা একতম আসনটি ধার্য করেছে হনুমানজীর। 'প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা কচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে।'

এরপরে সত্যচরণ বলেন নিঃসঙ্গ শিবভক্ত দ্রোণ মাহাতোর কাহিনী এবং তার মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয় যেন কোনও লোকদেবতার জন্মবৃত্তান্ত। কাছারির কাছে বহুকাল আগে কে নাকি এক খণ্ড শিলা এনে রেখেছিল। দশ-বারো বছর সেটি প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়েই

ছিল। নতুন-আসা নিম্নবর্ণ দ্রোণ মাহাতো জাতে গাঙ্গোতা। সে কাছারিতে সেই অনাদৃত শিলাখণ্ডটি একদিন লক্ষ্য করে তার পরদিন থেকে কলবলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান সেরে এক ঘটি জল এনে শিলাখণ্ডে ঢেলে সাতবার ভক্তিভরে সেটিকে প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুরু করল। এইভাবে প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম হল লোকদেবতা মহাদেওর। এক ক্রোশ দূরের নদী থেকে কষ্ট করে জল আনা কেন? সত্যচরণের এমন প্রশ্নের জবাবে দ্রোণ বলে, 'মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন বাবুজী।'

এক খণ্ড উপেক্ষিত শিলা এভাবেই লোকদেবতার আকার নেয় লোকায়ত মানুষের একান্ত বিশ্বাসের ছোট্ট জগতে। ব্রাত্য দ্রোণ মাহাতোর পূজিত শিব পল্লবিত কাহিনীতে নানা বস্তিতে ছড়িয়ে পড়েন, আরম্ভ হয় দু-পাঁচজন ভক্তসমাগম। ব্রাহ্মণ মটুকনাথ শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক শিবের এমন সহজ লোকায়ন মেনে নিতে পারে না, বিশেষত দ্রোণের নিরুপকরণ সেবাপূজা। সে সত্যচরণকে বলে, 'একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?' সত্যচরণ উত্তর দেন: 'পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোকসমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখিনি তোমায়।' রাগের মাথায় খেই হারিয়ে মটুকনাথ বলে বসল, 'ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পুজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।' সত্যচরণ বলেন, 'তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?'

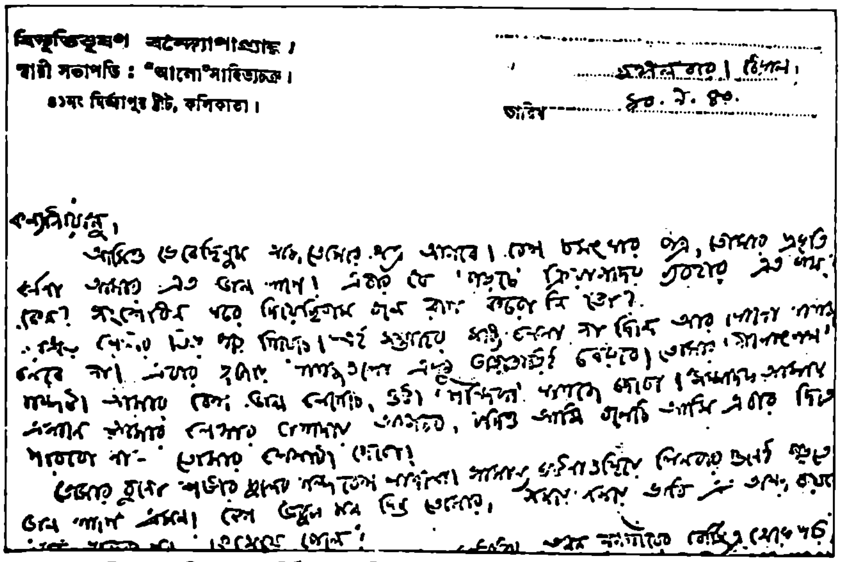
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্থায়ী সভাপতি: "আলো" সাহিত্যচক্র।
৪১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
তারিখ ২০.৯.৪০.

কল্যাণীয়াসু,

ভাবী সহধর্মিণী রমা দেবীকে লেখা চিঠির অংশ বিশেষ

সত্যিই উচ্চবর্ণের অস্বস্তি ও অসন্তোষ জয় করে মহাদেও পৌঁছে যান ব্রাত্যজনের সহজিয়া উপাসনায়। বিভূতিভূষণ সত্যচরণের জবানীতে কেবল একটি ক্ষিপ্র বাচন বুনে দেন: 'ভক্তও ভগবানকে গড়ে।'

'একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি' তাদের 'দারিদ্র্য সরলতা' সমেত আঁকতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে। লোকায়ত পাঠে সেই শৌর্যময় সহিষ্ণু একদল মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা, তাদের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই, বন্যজন্তুর সঙ্গে যুযুধান সম্পর্ক সবই পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু সে সব অস্তিত্ব অরণ্যের বিশালতার পাশে, সর্বগ্রাসী বন-জঙ্গলের তুলনায় আর কতটুকু? তবুও মানুষের জিজীবিষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। বন কেটে বসত গড়ে ওঠে, যূথবদ্ধ মানুষ বানিয়ে নেয় কান্নাহাসির সমুচ্ছল জনপদ। সত্যচরণই সেই অরণ্য নিধন ও জনপদ উৎসের প্রধান স্থপতি। তাই উপন্যাসের শেষে সত্যচরণকে অনুতাপ মিশিয়ে বলতেই হয়: 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়।'

এই ক্ষমাভিক্ষা আসলে মানুষের জীবন থেকে মিথ ও লোকপুরাণের বিনাশের জন্য। আরণ্যকে নরনারীর যাপনগত যে-বিশিষ্টতা তা জনপদজীবন ভবিষ্যতে কেবলই ধ্বংস করবে। কে আর বিশ্বাস রাখবে মটুকনাথের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে? কে আর মানবে মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর প্রতাপকে? বিলীন হবে দোবরু পান্নার বীরত্বের শৌর্যের ইতিকথা।

'আরণ্যক' উপন্যাসে গোঁড় সাঁওতালদের একটা উপকাহিনী, দোবরু পান্না-জগরু ও ভানুমতীর, মূল আরণ্য প্রতিবেশে অতীত ইতিহাসের ছায়াময় নিবিড়তা এনেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে আরণ্যক-বনাঞ্চলে একটা দুটো মানুষের মকাইয়ের ভুট্টা আর চীনা ঘাসের দানা খেয়ে দারুণ কষ্টে, তীব্র শীতে বেঁচে থাকা, বড়জোর একটা দুটো মহিষ চরানো—এ কোনও ইতিহাস নয়। এ হল আবহমান ভারতীয় দারিদ্র্যের উপলব্যথিত জীবনস্রোতের আখ্যায়িকা। বংশধারা, বহুদিনের বাস্তু এবং পারিবারিক শাখাপ্রশাখা মানুষের পরিবারে যেমন অহঙ্কার ও আত্মপ্রত্যয় আনে, আনে অতীত-বর্তমানের তুলনামূলকতা, লবটুলিয়া নাড়া-বইহারে কোনও মানুষের সেটা ছিল না। থাকা সম্ভবও কি? কোনওরকমে একটা-দুটো বিদেশাগত লোক, গহন জঙ্গলে একাকী বেঁচে আছে, ভাগ্যান্বেষণে লড়ছে এমনই দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই পরিবারছুট, বাঁচার তাগিদে এসে-পড়া। তাই সত্যচরণ তাদের ব্যক্তিকাহিনী ও ব্যক্তিস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথা যত শুনিয়েছেন তাদের সামূহিক বা পরিবার পরম্পরার স্রোতকে তত ধরেননি। রাজু পাঁড়ে, বনয়ারীলাল, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, গণু মাহাতো, মটুকনাথ পণ্ডিত, জয়পাল কুমার, সুজন সিং, যুগলপ্রসাদ, গিরধারীলাল এরা সব যেন বিচ্ছিন্ন মানবস্বভাবের এক-একটা আলাদা অস্তিত্ব। সকলের সঙ্গে সকলের মিলমিশ নেই, লেনদেনও নেই। আছে কেবল জাতিবর্ণগত পরিচয় ও সংস্কার যা জন্মসূত্রে পাওয়া। সেই বিচারে কেউ রাজপুত, কেউ গাঙ্গোতা বা দোষাদ এবং ব্রাহ্মণ। আসলে তাদের একটাই মূল পরিচয়—তারা দরিদ্র, ক্ষুৎকাতর ও জীবনপিয়াসী।

এদের জীবনকেই কি ব্রাত্য জীবন বলা যাবে? বলা গেলেও সেই ব্রাত্য মানসের অন্ধিসন্ধি কি বিভূতিভূষণ ততটা বিস্তারে জানতেন? পরিবার ও সমাজের শিকড় থেকে অর্জিত ধ্যানধারণা আর প্রতিপালন, নানা সংস্কার ও রিচুয়াল তাদের কতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কী তাদের বারব্রত ও পালুনী সত্যচরণ সেই গভীরে যেতে পারেননি। নক্ছেদীর তরুণী পত্নী মঞ্চীর ছেলে বসন্ত রোগে মারা গেছে এবং সেই দুঃখে মঞ্চী গৃহত্যাগ করে চলে গেছে জেনে সত্যচরণ রাগ করেন কেন তাকে টিকা দেওয়া হয়নি। রাগটা স্বামী নক্ছেদীর ওপর। কিন্তু 'সত্যচরণ জানে না, বসন্তের দেবী জগদম্বা গাঙ্গোতাদের আরাধ্য, মাসে দুই থেকে তিনবার জগদম্বার পূজা করে গাঙ্গোতারা (Risley, 1981: 269)। কেমন ভাবে বুঝবে নক্ছেদী, সরকারের টিকার জোর জগদম্বার শক্তির চেয়ে বেশি? নক্ছেদী

ভাগলপুরে তোলা বিভূতিভূষণের আর একটি ছবি অন্যদের সঙ্গে — *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

যে গাঙ্গোতা, এ কথা সত্যচরণ জানে। যেমন সে জানে, বিশুয়া, গণু, গিরধারীলালও গাঙ্গোতা। ম্যানেজারের সেই জানা, অচেনার বিস্ময় পেরিয়ে, বেশি দূর যায়নি। গাঙ্গোতাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিত অবধি সেই পরিচিতি পৌঁছয়নি।' (বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস—রুশতী সেন। ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৩০)

লক্ষণীয় যে বিভূতিভূষণের এ ধরনের অজ্ঞতা অনেকটা ঢাকা পড়ে যায় রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর পারিবারিক উপস্থাপনে। আরণ্যক কাহিনীতে একমাত্র এই গল্প, স্থিতু একটা সমাজ পরিবারের যারা কোনও বয়ে-আনা সংস্কৃতি নিয়ে আসেনি। যাদের সঙ্গে অরণ্যের আদি শিকড়ের যোগ আছে। আছে বংশধারা, নিজস্ব লৌকিক বিশ্বাসের দেবতা, সমাধিক্ষেত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মিথ। উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের দূরে বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গলের সন্ধানে এসে সত্যচরণ নিতান্ত আকস্মিকভাবে পেয়ে যান ওই সাঁওতাল পরম্পরার দিশা। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা দুটো বিকট খোদাই করা মুখ, অর্থাৎ টোটেমচিহ্ন দেখে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে জানা যায় ওটি অসভ্য এক বুনো জাতির রাজ্যসীমার নিশানদিহি খাম্বা। 'আরণ্যক'-এ এই প্রথম পাঠকরা আদিবাসী জীবনের, এ দেশের ভূমিপুত্রদের মুখোমুখি হবেন এবং বিভূতিভূষণ তার ধরতাই দেন তাদের তৈরি লোকশিল্পের বিকট টোটেম মূর্তি দেখিয়ে। এই প্রথম এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠিবিশ্বাসবদ্ধ আদি জনস্রোতের সম্মুখীন হবে 'আরণ্যক'-এর পাঠকসমাজ, বিস্ময় ও অপূর্বকল্পিত বাস্তবের রেশ নিয়ে। এদের, এই কৌম রাজপরিবারের বিবরণ দিয়েই লেখক আনবেন অরণ্যের প্রাক্ ইতিহাস এবং ভুলে যাওয়া ভারতীয় জীবনের কম্পন। সত্যচরণকে স্থানীয় মানুষটি বলে : 'রাজার বংশধর এখনও বর্তমান। ...এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড়, আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।'

●

'একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি' তাদের 'দারিদ্র্য সরলতা' সমেত আঁকতে চেয়েছিলেন তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে। লোকায়ত পাঠে সেই শৌর্যময় সহিষ্ণু একদল মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা, তাদের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই, সবই পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

ক্রমে সত্যচরণ এবং পাঠকের জানা হয়ে যায় এই জাতি এককালে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে লড়েছে। বীরের বংশ এদের—এখন অবশ্য হীনবল। ১৮৬২ (১৮৬২ তারিখটি সঠিক

নয়। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস—রুশতী সেন। ১৯৯৩। পৃ ৪৩) সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে এদের সব পরাক্রম ও যোদ্ধৃত্ব অবসিত, তবে এখনও বেঁচে আছেন সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা, বর্তমানে যিনি এদের রাজা, দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত গরীব। 'কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।'

ব্রাত্য ভূমিপুত্রদের সম্পর্কে কতটা সম্ভ্রমবোধ ও মানবিক উচ্চ ধারণা ছিল বিভূতিভূষণের তার প্রমাণ মেলে যখন দোবরু পান্নার কাছে প্রথম সাক্ষাতের সময় সত্যচরণ সঙ্গে নেন রাজার জন্য নজরানা—কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগি। পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং কিন্তু সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'আপনি সেখানে কী যাবেন !...পাহাড়ী অসভ্য জাতের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী ! সে তেমন কিছু নয়।'

বুদ্ধু সিং-জাতীয় সভ্যতার অর্ধেক-মুখ-দেখা মানুষের মনে রাজকীয়তার অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে বৈভব ও প্রতাপ মিশে। বিভূতিভূষণের মতো যথার্থ সংবেদী মানুষের মনে দোবরু পান্না উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন শিকড়ের গভীর ঐতিহ্যে, দেশীয়তার গূঢ় সম্পর্কে। সত্যচরণের চোখে তাই দোবরুর নাতনি ভানুমতী তার নিটোল স্বাস্থ্য ও লাবণ্যমাখা মুখে ধরা পড়ে। তাকে দেখে সত্যচরণের একই সঙ্গে মনে হয়—'পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়' কিন্তু 'সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্ব পুরুষেরা এই আরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।' সে হয়ে যায় ভানুমতী।

সভ্য ইংরাজি শিক্ষিত জগতের প্রতিনিধি সত্যচরণের সঙ্গে আদি ভারতীয় জীবনের আবহমান মানুষ দোবরু পান্নার প্রথম সাক্ষাৎ দ্বন্দ্বে-দোলাচলে-বিস্ময়ে চমকপ্রদ। বৃদ্ধ রাজা বকাইন্ গাছের তলায় বসে গরু চরাচ্ছিলেন। সত্যচরণ মর্মান্তিক চমকে ভাবেন, 'এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন !' এরপরে পরতে-পরতে বিভূতিভূষণ খুলে দেন রাজার সৌজাত্য ও সম্মানবোধ, তাঁর আতিথেয়তা ও শৌর্যময়তা। চাষবাস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে দোবরু খুব উন্নাসিকতার সঙ্গে উত্তর দেন : 'এসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করব না [illegible] চেয়ে বড়, তাও একসময়ে ছিল [illegible] গৌরবের। তীর-ধনুকে [illegible] কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে; আমি কখনও ছুঁইনি।'

হীনবল কিন্তু অহঙ্কৃত এই মানুষটি আরণ্যকের বৃক্ষজগতে একমাত্র বনস্পতি, যাঁর বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের জগৎ মাটির অনেকটা ভিতর পর্যন্ত বিস্তারিত। আহারপর্ব শেষ হলে রাজা জানান বনের মধ্যে পাহাড়ের ওপরে আছে তাঁদের রাজবংশের প্রকাণ্ড বাড়ির চিহ্ন এবং পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা লোকদেবতা, সেখানেই আছে রাজবংশের সমাধি। প্রতি পূর্ণিমায় সেখানে রাজার যাওয়া একটা প্রচল। কৌতূহলী সত্যচরণ দোবরু পান্নাকে অনুসরণ করে পৌঁছন সেখানে, প্রাকৃতিক গুহায়, সেই গুহাপথ পেরিয়ে আসেন এক সমতলে যার চারিদিক ব্যেপে এক বিশাল বটগাছ এক বিঘা জমিতে তার বিস্তার। চারপাশে তার বাটনাবাটা শিলের আকারে অনেক সমাধি-স্মারক। 'সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই' সত্যচরণের মনে হল। বটের দ্যোতনা অনবদ্য।

দোবরু পান্নার কাছে সত্যচরণ জানতে পারেন অরণ্যের লোকদেবতা টাঁড়বারোর মহিমা। এই দেবতা আরণ্যমানুষের লৌকিক বিশ্বাসের মর্মমূলে নিজের অদৃশ্য পূজাবেদী প্রস্তুত করে নিয়েছেন। তিনি না থাকলে নাকি শিকারীরা চামড়া ও শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন, এটাই সার্বজনিক ধারণা—সেই অরণ্য অধ্যুষিত বন্য জন্তুদের তিমিরপ্রদেশে। সত্যচরণের মনে হয় টাঁড়বারোকে সভ্য জগতে কেউ জানে না, মানেও না কিন্তু রাজগোঁড়দের জীবনপ্রণালীর পক্ষে এই দেবতা কল্পনা নয়, 'এই দেবতা সত্যই আছেন।'

দোবরু-জগরু-ভানুমতীর পর্ব উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে আনেন বিভূতিভূষণ—এতে তাঁর এক উদ্দেশ্য প্রবণতার পরিচয় আছে। এখনকার বিচারে হয়ত 'History from below' তিনি উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন, তাই প্রথম পরিচিতির পর সত্যচরণকে সদলবলে বিভূতিভূষণ আবার আনেন সেই কৌমসমাজে, ঝুলন উৎসবে সম্মেলক নাচের প্রাকৃত বর্ণোজ্জ্বলতায়। ভানুমতী ও তার সখীদের সঙ্গে গড়ে ওঠে সুন্দর সরস বাচন বিনিময়ের স্নিগ্ধ সম্পর্ক। তিন বছর পরে চিরতরে নাড়া-বইহার ত্যাগ করে চলে যাবার আগে সত্যচরণ দেখা করতে চান ভানুমতীর সঙ্গে ইতিমধ্যে দোবরু পান্না মারা গেছেন। [illegible] এসেছিলেন। সারা দিন নানা গল্পে ভ্রমণে আলাপে এবারে কেটে যায় সত্যচরণের। বিকালে ভানুমতীর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সত্যচরণের মনে হয় : 'এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার সামনে ফুটিয়া ওঠে।'

এমনতর আত্মসমীক্ষা সত্যচরণের ভাবনায় আরেকবার করেছিলেন বিভূতিভূষণ সাঁওতালদের সেই সমাধি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। মনে হয়েছিল : 'ভারতের যা কিছু ইতিহাস—এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। ...আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি।'

তাৎপর্যপূর্ণ অর্ধপরিচয়ের এই সন্ধ্যা শেষ পর্যন্ত কোনও মিলনরাত্রিতে পরিণত হয় না 'আরণ্যক' উপন্যাসে। অনুতাপ থাকে উচ্চবর্গের তরফে কিন্তু নিম্নবর্গকে আলিঙ্গনে বাঁধতে পারেন না বিভূতিভূষণ। বোধহয় শিক্ষিত ও লোকায়তে মেলানো অসম্ভব। সত্যচরণ তাই আরণ্যভূমিতে বসেই কেবল ভাবতে পারেন 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম ! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।' 'যদি থাকিতে পারিতাম' উচ্চারণে সাধ আছে কিন্তু যতটা আকুলতার আত্যন্তিক আবেগ থাকলে চিরতরে থেকে যাওয়া যায় ভালবেসে অরণ্যকে ও অরণ্যদুহিতাকে, ততটা নেই সত্যচরণের মানসে। শান্ত স্তব্ধ অরণ্যকে মানুষের কোলাহলতপ্ত জনপদে পরিণত করার পাপের ক্ষমা চেয়েছেন তিনি অরণ্যানীর আদিম দেবতাদের কাছে। কিন্তু অনেক বড় ঋণের অপরাধ সত্যচরণের থেকে যায় ভানুমতীর কাছে। শহর তাঁকে টানে, শাহরিক জীবনের মসৃণতা, তার বিত্তবৈভবপ্রতাপ তাঁকে ছিন্ন করে ভানুমতীর কাছ থেকে। ভানুমতী তাঁর কাছে প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত চিরন্তন নারী হয়ে উঠতে পারে না কেন? আরণ্যকের লোকায়ত-পাঠ সাঙ্গ করার পর এই বেদনা বুক থেকে বুঝি যাবার নয়।

প্র·চ্ছ·দ নি·ব·ন্ধ

অন্য বিভূতিভূষণ

সু ত পা ভ ট্টা চা র্য

মহাকাশে, মহাবিশ্বে থেকে থেকেই অন্তর্হিত হয়েছে তাঁর মন। সৃষ্টির অন্তর্লীন তত্ত্বে অহরহ অন্বেষণ, জীবনের পরপারে কে তুমি স্রষ্টা। কবি, বিজ্ঞানী, ভক্ত, সন্ত, একাধারে সেই অধরাকে ধরতে চেয়েছেন। কে তুমি!

একবার এক আলোচনাসভায় শুনেছিলাম ঈশ্বরহীনতা নাকি আধুনিক সাহিত্যের একটি আবশ্যিক শর্ত। হয়তো হবে তাই। কিন্তু কাকে বলে ঈশ্বর আর কাকেই বা বলে আধুনিকতা? এসব প্রশ্নের কি একটা কোনও নির্দিষ্ট উত্তর আছে নাকি? রিলকের মাস্টের কথা মনে পড়ে। অপার বিস্ময়ে তিনি বলেছিলেন, পেন্সিল কাটা ছুরিও যদি প্রতি মানুষের ব্যবহার-অনুসারে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে, তবে সব মানুষের একজন-সাধারণ ঈশ্বর কীভাবে সম্ভব? একজন সন্ত হয়তো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগত একমাত্র ঈশ্বরের কথা বলতে পারেন, কিন্তু একজন কবি তা পারেন না। কখনও বা কোনও ভাবুক 'ঈশ্বর' শব্দটিকে সেকেলে বলে বাতিল করে দেন, কিন্তু ঐশ্বরিক অনুভবকে বাতিল করেন না। তাই মনে হয়, যে-কোনও ভাবুক মানুষেরই একজন নিজস্ব ঈশ্বর আছেন। এমন কি যিনি অগাধ নিরীশ্বরবাদী বলে নিজের পরিচয় দেন, তাঁর না-ঈশ্বরের মধ্যেও তো ঈশ্বর বিষয়ে একটি বিশেষ ধারণা থেকে যায়। নিটশের সেই পাগল, যে মৃঢ় ঈশ্বরের গলিত শরীর দেখে নিয়েছে, ঈশ্বরের হত্যাকারী বলে শনাক্ত করেছে নিজেকে, সেও কি আসলে চূড়ান্ত এক ঈশ্বরপ্রেমিকই নয়? তাই মনে হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস কোনও বিপরীত মনোভঙ্গি নয়, ভিন্ন মনোভঙ্গি শুধু। 'ঈশ্বর' শব্দটিকে যিনি পরিত্যাজ্য বলে মনে করেন, তিনিও হয়তো দিব্য অনুভব, ঐশ্বরিক উপলব্ধির এপিফ্যানির সঙ্গে অপরিচিত নন।

আজকের দিনেও, অনেক ভাবুকের লেখাতেই তাই, একজন ঈশ্বর বা না-ঈশ্বর কোথাও-না-কোথাও থেকে যান, হয়তো খুব সংগোপনে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ভাবুক খুব বিরল, যাঁর লেখায় গোপনে নয়, আছেন অতি-প্রকাশ্য এক ঈশ্বর—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পে-উপন্যাসে প্রায়শই থেকে যান— সেই ঈশ্বর-বিষয়ে আলোচনা। কল্লোল-কালিকলমের কথাসাহিত্যিকেরা যখন জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকেই বিশেষভাবে তুলে ধরছিলেন সাহিত্যে, সেটাই যখন ছিল সাহিত্যিক ফ্যাশন, তখনই, সেই ১৯২৪-২৫ সালেই, ফ্যাশনের কোনও তোয়াক্কা না করে বিভূতিভূষণ লিখতে পেরেছেন ঈশ্বর-অন্বেষণের, ঈশ্বর-প্রাপ্তির গল্প। এমন কি বাস্তবকে ডিঙিয়ে অলৌকিককে নিয়ে আসতেও সংকোচ করেননি, 'নব-বৃন্দাবন'-এর

●

কোন নিরাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে অমেয় সান্ত্বনা হয়ে দেখা দেন না বিভূতিভূষণের ঈশ্বর, জীবনের অর্থহীনতার গ্লানির মধ্যে ঈশ্বর তাঁর চৈতন্যে অর্থময়তার দীপশিখা জ্বেলে দেন না। কেননা নিরাশার ক্লিষ্টতা থেকে মুক্ত তাঁর জগৎ।

●

মতো গল্প যার দৃষ্টান্ত। সংকোচ করেননি, কেননা তাঁর নাড়ির যোগ ছিল আমাদের দেশের যুগ যুগ প্রবাহিত সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে, শুধুমাত্র কলকাতা শহরের ছোট সাহিত্য-পাড়াটুকুর সঙ্গে নয়।

কোন নিরাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে অমেয় সান্ত্বনা হয়ে দেখা দেন না বিভূতিভূষণের ঈশ্বর, জীবনের অর্থহীনতার গ্লানির মধ্যে ঈশ্বর তাঁর চৈতন্যে অর্থময়তার দীপশিখা জ্বেলে দেন না। কেননা নিরাশার ক্লিষ্টতা থেকে অর্থহীনতার অন্ধকার থেকে মুক্ত বিভূতিভূষণের জগৎ— সে জগৎ অবিরাম হতে-থাকার যন্ত্রণা জানে না কখনও। 'পথের পাঁচালী'র অপু যেমন প্রথম থেকেই হয়ে আছে, প্রথম থেকেই আনন্দময় এক উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে চিনে নিচ্ছে বিশ্বচরাচর, অপুর স্রষ্টাও তেমনই।

তবু, তাঁর হয়ে-থাকা ঈশ্বরবোধের মধ্যেও এক ধরনের চলমানতা আছে, বলা যায় কবির ঈশ্বর ক্রমশ হয়ে উঠেছেন সন্তের ঈশ্বর। 'অপরাজিত'-র অপু কিংবা 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-র দীপুর উপলব্ধি কবির উপলব্ধি, আর 'ইছামতী'-র ভবানীর উপলব্ধি সন্তের উপলব্ধি। 'নাস্তিক' গল্পটি সম্ভবত তাঁর ঈশ্বরবোধ বিষয়ে প্রথম গল্প, আর শেষ গল্প 'কুশল পহাড়ী'। 'নাস্তিক'-এ অন্বেষণ আছে, আছে ছদ্ম-সংশয়, তার নায়ক দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হলেও দর্শনের পথে তার সংশয় ঘোচে না। জ্ঞানের পথে নয়, সে খুঁজে চলে উপলব্ধির পথে, তাই তাকেও বলা যায় কবি। আর 'কুশল পাহাড়ী'-র সাধুটির কোনও সংশয়ই নেই, তার আছে পূর্ণ বিশ্বাস। তাকে বলি সন্ত। কিন্তু তিনিও কোন কঠিন সাধনার কথা বলেন না, গল্পটি শেষ হয় এই বিশ্বাসে 'যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই বন্ধনও নেই। ব্রহ্মকে জানতে হলে কিছু পড়তে হবে না কিছু সাধনা করতে হবে না।' কেননা, 'অনুভূতিই একমাত্র জিনিস'।

অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। আর, প্রতি মানুষের অনুভূতি স্বতন্ত্র বলে প্রতি মানুষের ঈশ্বরও স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ তাঁর সেই অনুভূতি দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন নিজস্ব এক তন্ত্রও। সে তন্ত্রের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল 'অপরাজিত' লেখার সময়ই, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, প্রকাশকালে এ অংশ পরিত্যক্ত হয়। 'অপরাজিত' রচনাকালের ঈশ্বর বা দিব্যলোকের [illegible] অনেক পরে পরিণতি পায় [illegible]

প্রগতি লেখক সংঘের সভ্যদের সঙ্গে বিভূতিভূষণ। হাবিবগঞ্জ, শ্রীহট্ট। ১৯৩৮-৪১-এর কোনও এক সময়ে *তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে*

কিন্তু 'অপরাজিত'র পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপিতে যতটা বিস্তারিতভাবে তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা আছে, ততটা 'দেবযানে'ও নেই। সেই তত্ত্বের মূলে আছে 'এই বিরাট বস্তুতে গড়া বিশ্ব'-র পাশাপাশি 'একটা আধ্যাত্মিক non-matter, spiritual বিশ্বজগতে'র অস্তিত্বের ধারণা। যে-কোনও জড়বাদীর কাছে এই দ্বিতীয় বিশ্ব পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতি মানুষ তার নিজের প্রত্যক্ষণের জগতে বাঁচে। এই দ্বিতীয় বিশ্ব যদি বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষণে ধরা দিয়ে থাকে, তবে সেখানে অবশ্যই তার অস্তিত্ব আছে। প্রশ্নটা হলো— তাঁর প্রত্যক্ষণেই কি ধরা দিচ্ছে এই অন্য বিশ্ব ? বিভূতিভূষণ নিজেই বলেন : 'সেটা এটার কোথায় কিভাবে আছে, তা কেউ জানে না, মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না তা, মানুষের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার তা বাইরের জিনিস। এ বিশ্বের অধিবাসী প্রাণিদল আছে, তারা উচ্চস্তরের প্রাণী, তারাও মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অভিজ্ঞতা ও কল্পনাগ্রাহ্য নন।' তা হলে বিভূতিভূষণ নিজে কীভাবে জানছেন এদের কথা ? জানা সম্ভব নয়— এ কথাই তো তিনি বারবার বলছেন : 'তাদের সে অচিন্ত্যনীয় মহনীয় বিরাট জীবন ও তার বিভিন্ন কর্ম ও আনন্দ ও চৈতন্যের কোনও খবরই আমরা ধারণা করতে পারি না, কারণ তা আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার বাইরের। আমরা সেরকম কোনও প্রাণীকে কখনও দেখিনি, তাদের জীবনধারা বিষয়ে কিছু জানিও না।' বিভূতিভূষণ জানেন না, কিন্তু আমরা যা জানি না, তার অস্তিত্ব নেই— এই যুক্তিকে তিনি মেনে নিতে পারেন না। তাঁর বোধে তাঁর অনুভূতিতে এই দ্বিতীয় বিশ্বের সম্ভাব্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সরাসরি তা না পেলেও তাঁর কোনও অসুবিধে হয় না।

বিভূতিভূষণের সেই যুক্তিক্রম অস্বীকার করার কোনও কারণ দেখি না, কেননা থাকা বলতে আমরা তো নিছক বস্তুর থাকাই বুঝি না, আমাদের দর্শনে আমাদের কবিতায় প্রতিনিয়তই বস্তু-অতিরিক্তকে মেনে নিই। এমন কি মনোবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলে মানি, তবে সেখানেও থাকার তাৎপর্য ঠিক বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। সেই অন্য বিশ্বের যুক্তি এইভাবে দেন বিভূতিভূষণ :

'এই অনন্ত নীলশূন্যটা তো আমাদের শূন্য অর্থাৎ ফাঁকা নয়। ওরই সঙ্গে co-extensive যে বিরাট Spiritual universeটা। আমরা সে দিকটা জানি না। আমাদের চৈতন্য space-time-এর সে dimension-এ খোলে নি। তাই মনে হয় শূন্যটা ফাঁকা— আসলে ফাঁকা নয় তত। শুধু জ্যামিতিকভাবে ভরাট নয়, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু জ্যামিতি অবস্থান সেভাবে নয়, যেমন জায়গা আমার ঘরে এই যে টেবিলখানা রয়েচে। অবস্থান অর্থে ব্যাপকতা বা জায়গাজোড়া নয়। আমাদের সে dimension-এ চৈতন্য যদি খুলতো, তবে দেখতে পেতুম আমরা যে বিশ্বটা দেখচি আমাদের চোখের অনুবীনে, দূরবীনে, চশমায়, সমগ্র বিশ্বটা এর চেয়ে অনেক বড়, অন্যরকম, অনেক সুন্দর, অনেক মোহনীয়।'

সকলে পারে না, কিন্তু বিভূতিভূষণ পারতেন সেই বিরাট space-time-এর অঙ্কে নিজেকে স্থাপন করতে, তার জন্যে এই মাটির পৃথিবীটুকু আর তার তুচ্ছ অসহায় মানুষদের জন্য তাঁর ভালোবাসায় কোনও ভাঁটা পড়ে নি। কেননা 'এই বস্তু-বিশ্ব ও অবস্তু-বিশ্ব' তো পাশাপাশিই রয়েচে। স্বর্গ-মর্ত শব্দ দুটিকে বিভূতিভূষণ এই দুই বিশ্বের প্রতিশব্দ হিসেবেই দেখেন : "স্বর্গ মানে— নন্দন-শোভিত গোলোকের স্বর্গ নয়— স্বর্গ অর্থে তা। Spiritual non-matter বিশ্ব— যা space time -এ অবস্থিত। মর্ত মানে শুধু এই পৃথিবী নয়, এই অগণ্য জ্যোতি-তারকা ধূমকেতু নীহারিকা, গ্রহ-উপগ্রহ সমেত অনাদি অনন্ত বস্তুবিশ্বটা। স্বর্গ ও মর্ত পাশাপাশি বিরাজমান— co-extensive universe এই অনাদি অনন্ত বিশ্ব কিন্তু কেউ কারও খবর রাখে না। আমরা অ

মনোজ বসু, হরনামদাস সহরাই প্রমুখের সঙ্গে বিভূতিভূষণ

দেখতে পাই নে, বুঝতে পারি নে, ধারণা করতে পারি নে— অতএব সেটা নেই এ যুক্তি অদ্ভুত।"

'অপরাজিত'-র পাণ্ডুলিপি থেকেই নেওয়া এসব উদ্ধৃতি। কিন্তু মনে হয় এ সব ভাবনা ঠিক উপন্যাসের অংশ হিসেবে নয়, আত্মগত ভাবনা হিসেবেই লিখে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। 'অপরাজিত' সাধু ভাষায় রচিত, আর এসব অংশের ভাষা চলিত। এ ছাড়া 'অপু' নামটিও এখানে পাইনি। পরে রয়েছে সাধুভাষায় অপুর জবানিতেই :

'অপু একদিন বসিয়া বসিয়া ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ভাবিল। সকলপ্রকার পূর্ব সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া দিল। বাল্যকাল হইতে লোকের মুখে শোনা ও পড়া সকলপ্রকার ঈশ্বরের প্রকৃতি কোনওটাই তাহার বর্তমান অবস্থায় ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। বাবার মুখে শোনা ও ভাগবতে পড়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের আসন হইতে নামাইল, বিষ্ণুকে নামাইল, শ্রীহরি, নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, কালী, তারা, রাম, চৈতন্য, বুদ্ধ, যীশু— সব সব। দিল্লিতে যেমন ঐতিহাসিক নরনারী সম্বন্ধে মনে হইয়াছিল— এখনও তাহার মনে হইল—এসব চরিত্র মানুষের মন-গড়া, কল্পনাদৃষ্ট, প্রকৃত ঈশ্বর এসব নহেন, একেবারে নহেন। অন্তত তাহার মন এইসব বৈষয়িক, কূটকর্মী, রাজনৈতিক ঈশ্বরের প্রকৃতিতে সায় দেয় না— বা ভাবুক, আপন-ভোলা সন্ন্যাসী ঈশ্বরেও সায় দেয় না।

'মানুষে দেশে দেশে যুগে যুগে নিজেদের বিদ্যা ও জ্ঞান অনুযায়ী ঈশ্বরের [?] গড়িয়াছে— এসব মানুষের যুগধর্মে সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের কল্পনা। গ্রিকদের জোড়, খ্রিস্টধর্মশাস্ত্রের নরকে নিক্ষেপকারী গড, আমাদের ক্ষীরোদশয্যাশায়ী লক্ষ্মীসেবিত পদ্ম ভগবান— সব কাল্পনিক।...

'ঈশ্বরকে মানুষ ভাবিতে পারে না এইজন্য যে তিনি তাহাদের সীমাবদ্ধ কল্পনার ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। তার প্রকৃতিই ভিন্ন! তবু সে তার চিন্তা ও বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানের দিক হইতে ঈশ্বরের একটা ধারণা খাড়া করিয়াছে।'

'ঈশ্বরকে মানুষ ভাবিতে পারে না এইজন্য যে তিনি তাহাদের সীমাবদ্ধ কল্পনার ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। তার প্রকৃতিই ভিন্ন! তবু সে তার চিন্তা ও বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানের দিক হইতে ঈশ্বরের একটা ধারণা খাড়া করিয়াছে।'

এই পর্যন্ত অপুর জবানিতে লিখে বিভূতিভূষণ কি আবার ফিরে গেছেন নিজের কথায়, সাধুভাষা থেকে আবার ফিরে এসেছেন চলিত ভাষায়, তাইতেই প্রশ্নটা ওঠে। নাকি অপু আর তার স্রষ্টা মিলে-মিশে গেছেন?

'এখানে বলা দরকার এঁর কোনও নাম নেই। ইংরেজি সংস্কৃত বাংলা সব জানা অজানা নাম এঁর জন্য নয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে এর ধারণা হয়েছিল নাগপুরের আরণ্যভূমিতে নয়— কলকাতার মেসের বাসায়। শেষরাত্রের...

'কে একজন। তাঁকে দেখা যায় না। মানুষের মতো ঈশ্বর নয়। [?] God নয়। ও-ও একটা কুসংস্কার— দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি। Being—তবে তাঁকে বোঝা যায় না। বিরাট পুরুষ। মানুষ পুরুষ নয়— কি রকম? স্ত্রী গরিলা পুং গরিলার চোখে খুব সুন্দরী। কিন্তু কোনও দার্শনিক পুং গরিলা যদি ভাবে ক্লিওপেট্রা খুব সুন্দরী একজন মেয়ে গরিলা

তবে সে মস্ত ভুল করবে। ক্লিওপেট্রা প্রাণী বটে সুন্দরীও বটে কিন্তু গরিলা নয়।' তিনি যা, একজন উচ্চ কল্পনাপ্রবণ গরিলাও কোনওদিন নিজের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কল্পনা ছাড়িয়ে উঠে তাঁকে কল্পনা করতে পারবে না। কারণ ক্লিওপেট্রা প্রাণী বটে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর প্রাণী এবং সেই শ্রেণীর প্রাণী সম্বন্ধে ঐ গরিলার কোনও ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই।

'তিনি এই বিশাল কোটি আলোকবর্ষব্যাপী আমাদের বিশ্বটা ও এর বহুদূরে অবস্থিত অন্য আরও সব বিশ্বেরও স্রষ্টা—এর প্রত্যেকের জীবের হাসিকান্নার খবর তিনি রাখেন। এই সমগ্র বিশ্বটা এর ফুল, ফল, লতা, পাখি, সেবা, দয়া, মায়া— একদিন তাঁর কল্পনায় মাত্র বিরাজ করত।

লাল সূর্যটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-গুঁড়ে যায়— বিশ্বের পর বিশ্বের লয় হচ্ছে তাঁরই কৌশলে ও প্রবর্তিত নিয়মের অধীনে। তিনি অনাদিকালের পথিক সঙ্গীহারা পথিক। আনন্দলীলায় এ বিশ্বের সৃষ্টি। তাঁর বিরাট আনন্দের কণা বিশ্বে বিলিয়ে দিতে দিতে চলেছেন। এত বড়... কিন্তু তিনি প্রাণের কান্নায় সাড়া দেন, চোখের জলে আশ্বাস দেন। অনাদি অনন্ত সময়টাও তাঁরই সৃষ্টি— তিনি কালাতীত দেশাতীত। মানুষের কালের মাপ ও তাঁর কালের মাপ এক নয়। আমাদের অনাদি সময় যাকে বলছি, তা তাঁর এক পক্ষ হয়তো।

'তাঁর সঙ্গী আছে? ...আছে। তাঁদেরও ধারণা মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁরা এ বিশ্বের কাজে তাঁর সহকারী। তিনি সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ পুরুষ ভাবলে অসঙ্গত হবে। তাঁর আনন্দ কোন দিক থেকে আসে আমরা জানি নে, কিন্তু তাঁরও আনন্দের scope আছে। কিন্তু আমাদের আনন্দ তাঁর আনন্দ নয়। জগৎটা তাঁরই conception-এর বিস্তার। হয়তো তাঁরই কল্পনার সুদূর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং মানুষের ধারণার কোনও কথাই সেখানে ওঠে না।

'বিশাল বিশ্বে আরও অনেক প্রাণিজগৎ আছে, লক্ষ কোটি কোটি। সকলের গ্রহের সকল প্রাণীর ধর্ম আছে। সকলে ঈশ্বরের কল্পনা ও নামকরণ করেছে। নিজের নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উন্নতির stage অনুসারে তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা করেছে। কোনও বিশ্বের কোনও জগতে বলেচে X-ই ঈশ্বর, তাঁকে ভজ। কোথাও বলেচে Y-ই ঈশ্বর, কোথাও বলেচে Z-ই ঈশ্বর; এমনি l, m, n, q, r... ঈশ্বর আছেন বিভিন্ন প্রাণিজগতের বিজ্ঞ ও ভাবুকদের কল্পনায়। l, m, n, q, r -এর যোগফল ঈশ্বর নন কিন্তু। অথচ সব বিশ্বের সব প্রাণীর সব ধর্মযাজকই বলছে যে তাঁদের ধর্মই সত্য, সনাতন, নিখুঁত। তারাই জগতে একমাত্র উচ্চ প্রাণী, গ্রহতারা তাদেরই জন্য তৈরি, ভগবান তাদেরই উপকারের জন্য যা কিছু করবার করচেন। এই ভেবে তারা খুব খুশি আছেন।

'অথচ সব সময় তাদের মাথার উপর দিয়ে অনাদি-অনন্ত বিশ্বদেব তাঁর কালের রথে জ্যোতির্ময় আনন্দযাত্রায় চলেছেন, সোমসূর্য টুকরো টুকরো হয়ে পড়চে, জগতের জন্ম জগতের লয় হচ্চে, প্রাণিকুলের পর প্রাণিকুল আসচে যাচ্ছে, বিশ্বের পর বিশ্ব— তাঁর দৃকপাত নেই। বহুদূর ভবিষ্যতের পানে তাঁর আয়তদৃষ্টি বদ্ধ— তাঁর চিন্তা তাঁর কল্পনা তাঁর সে উদ্দেশ্যের সমন্ধে কোনও ধারণাও মানুষ করতে পারে না, পারবেও না কোনওদিন। ...আরিস্টটলের প্রতিভা ও দৃষ্টি, ক্লিওপেট্রার রূপ রবীন্দ্রনাথের মনের ঐশ্বর্যের কোনও ধারণা করতে সমর্থ ঐ বিজ্ঞ মাকড়সা?'

দেখা যাচ্ছে বিভূতিভূষণের এই ঈশ্বরতত্ত্ব শুধু যে মানুষের বিজ্ঞান-অহংকারের প্রতিবাদ করে তাই নয়, ধর্ম-অহংকারেরও প্রতিবাদ করে। প্রচলিত ধর্ম আর তার ভগবানের বিপরীতে বিভূতিভূষণ রাখতে চেয়েছেন সৌন্দর্যের অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথও কি বলেননি এমন কথা? সৌন্দর্য-অনুভব যখন ইন্দ্রিয়ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়, ভালোবাসা যখন ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায় বিশ্বভুবনে— তখন সেসব অনুভবই তো ঐশ্বরিক— রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাই বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুভূতিটাই উপেয়, বিভূতিভূষণের কাছে তা উপায়। বিভূতিভূষণের ভগবান মানুষ-অতিরিক্ত এক ব্যক্তিত্ব, এই সৃষ্টি যাঁর রচনা, সৃষ্টির থেকে তিনি পৃথক। আর রবীন্দ্রনাথ বলবেন: 'আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে/ বাঁধা সবার কাছে।' যত বয়স হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ ততই হয়ে উঠেছে মানবকেন্দ্রিক, মানুষের চৈতন্যকে তিনি অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের অংশ বলে মেনেছেন। আর বিভূতিভূষণ যত দিন গেছে তত বেশি করে ভগবান-তন্ময় হয়ে উঠেছেন। দিনের কত মুহূর্তে কত ভাবে যে তিনি ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতেন— তাঁর জীবনের শেষ ক'বছরের দিনলিপিতে তার অজস্র বিবরণ রয়ে গেছে। তিনি খুব বড় মাপের একজন সাহিত্যিক ঠিকই কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি খুব বড় মাপের একজন ভগবৎ-প্রেমিকও। তাঁর দৃষ্টি কবির, কিন্তু উপলব্ধি সন্তের। ভগবান তাঁর কাছে এত বেশি প্রত্যক্ষ সত্য ছিলেন, যে দিনলিপিতে একবার তিনি লিখেছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে ভগবানের যেন অনেকটা মিল আছে। শেষ দিকের দিনলিপি থেকে আরও জানা যায়— এসময় সন্তদের জীবনী পড়ছেন তিনি সবচেয়ে বেশি— রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য— সকলের জীবনী।

কিন্তু রামকৃষ্ণ চৈতন্যের মতো মহাপুরুষেরা তাঁর সাহিত্যে ততটা ছায়া ফেলেননি। কেননা এঁরা তাঁর জ্ঞানের বিষয়, অভিজ্ঞতার নন। যে লোকজীবনপ্রবাহকে তিনি নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইখান থেকেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন আরেক রকম 'ঋষি'-দের। লক্ষ করার বিষয়, তাঁর গল্পের উত্তম পুরুষ কথক আসে অনেক সময়ই আয়রনির প্রয়োজনে— ধনী শিক্ষিত শহরবাসী আলোকাভিমানী সেই কথক মাথা নোয়ান, গ্রাম্য ভক্ত বা ঋষির কাছে, জাতে যারা অন্ত্যজ। যদিও অবশ্য উচ্চবর্ণের সেই কথক কখনও তাঁর শ্রেণী হারান না, বুনো সাধুর আশ্রমে দীনদুঃখী মানুষের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে মোটা চালের ভাত খান না তিনি, কিন্তু তাঁর আলোকাভিমান গৌণ হয়ে যায় এইসব গ্রাম্য সাধু বা সাধিকা আর তাদের ভক্ত পরিজনদের মিলিত মহোৎসবে যোগ দিতে পেরে। গরিব মানুষেরা পয়সা খরচ করে গঙ্গাস্নানে যেতে পারে না বলে 'মরিঘাটের মেলা'র বুনো সাধু রটিয়ে দেন মাঘী পূর্ণিমার রাতে মরিঘাটেই গঙ্গা আসেন— তাঁর সেই অনৃতকথনের মধ্যেই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে নিতে অসুবিধে হয় না গল্পের কথকের। 'পিদিমের নিচে' গল্পের পাগল ঠাকুর বিষয়ে উত্তম পুরুষ কথক বলেন: 'পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হলে এই লোকই উপনিষদ রচনা করত...'।

এই গল্পের কথক জানান: 'আমার সারা জীবন ওর দত্ত সহজ আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত'। এখানে কথকের সঙ্গে লেখক কি একাকার নন? বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মবোধ এইভাবেই তাঁকে যুক্ত করে দেয় সর্বসাধারণের সঙ্গে— যুগ-যুগ ধরে প্রবাহিত জন-জীবনের সঙ্গে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো জ্ঞানাভিমানী মনে করতে পারেন বিভূতিভূষণের আচার-আচরণ কখনও বা 'বোকার মত' লাগত তাঁদের, এমন কি এ কথা লিখতেও পারেন! কিন্তু তাতে ছোট হন না বিভূতিভূষণ। পূর্ব-পশ্চিমের দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান রাজ্যে অগাধ বিচরণ করলেও যে বিভূতিভূষণ আলোকাভিমানীর সীমিত জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন, সে ওই নিরক্ষর মানুষের কাছে পাওয়া 'সহজ আনন্দের মন্ত্রে', তাঁর ঈশ্বরের অনুভূতিতে।

তোমার মাটিদেশ

[ঘাসপুত্র, ঘাসকন্যাদের]

জ য় গো স্বা মী

১

নদী এত ছোট হয় ? অন্তত তোমার নদী ছিল !
বাঁকা হয়ে, আঁকা হয়ে, ছিল, আছে, বাঁশঝাড় ঘুরে...
এপার কি মাধবপুর ? ওই পার বনশিমতলা ?
এই পারে বাবলা গাছ, দুটো চারটে ডাল জল ছুঁয়ে
আড়াআড়ি বেড়ে গেছে, জলে মাথা ঠেকাচ্ছে হাওয়ায় ।
জলের উপরে যেন আনমনে, শেষ হয়নি, সাঁকো...
পাখি বসছে তার উপর, লম্বা ল্যাজ, কী জানি কী পাখি !
বসছে আর ডাল থেকে ফুল খসে পাপড়ি পড়ছে জলে
জল শান্ত, এ সময়, ভরাভরতি দুপুরবেলায়
প্রায় পথচারী নেই, প্রায় কোনো স্নানার্থীও নেই ।

দুটো বাচ্চা বহুক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করছে আঘাটায়
পাপড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানার সঙ্গে মিশে
ডিঙিতে কাঠগুঁড়ি তুলছে মাথায় গামছা বাঁধা লোক ।
এপার মাধবপুর, ওই পার, বনশিমতলা ?
একটা গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়লেই ওপার ।
নদী এত ছোট হয় ! অন্তত তোমার নদী তাই ।
আমি এ নদীর বাঁকে দেহ ঢেলে ঘুমোনোর পথে
যে কটি বিভ্রম পাই, অতীতপাখির চেয়ে দামি ।
ভ্রম বলতে একা একটা কোঁচবক ! ভ্রম বলতে দু'টো
ফিঙে যাচ্ছে এদিকের বাবলা বন থেকে ওপারের
বাঁশঝাড়ে ! হাতে হাত বেঁধে ঝাড়, গোল গুহাপথ
তৈয়ার করেছে নিচে, ঢালু রাস্তা জলে শেষ হয় ।
কাটা কাটা সূর্যালোক মাঝে মধ্যে খুলেছে ফোকর
ঘাট থেকে পায়ে-চলা-পথ উঠে মিলিয়ে চলেছে
আঁকা হয়ে বাঁকা হয়ে, ছিল, আছে ঘাসজমি ঘুরে
পথ নিজে যাত্রী আজ । আমি জেগে থাকি বা না থাকি
ভুল দেখতে আপত্তি কি ! একটি বিভ্রমদেশে যেতে
শুল্ক, ছাড়পত্র নেই, জলস্রোত নিজে দেবযান...
ঘাসেরা সবুজ রোম, কাল বুঝি বৃষ্টি হয়েছিল ।
আজ সব ধুয়ে গেছে ! নাম-না-জানা গাছ-পরিবার ।
আজ সবটাই মেঘ, মাঝে মাঝে চুলে বৃষ্টিগুঁড়ো
রোদ আসছে, রোদ যাচ্ছে,... শরৎ, বর্ষার মাঝখানে
হাত ছেড়ে দু'দিকেই ঝুল দিচ্ছে দুপুরবেলাটি !
শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, এই বাবলা গাছের পাশটিতে...
শব্দ নেই, শব্দ নেই... ফুল পড়লে শব্দ পাওয়া যায়
পাখি বসলে পাওয়া যায়, এত কাছে, লক্ষ করছে না !
গায়ের হলুদ রোঁয়া, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে যেন ।
ঘাড় ফিরছে, পুঁতি চোখ, তুমি দেখলে বলে দিতে বুঝি
কবার সকাল থেকে ফড়িং-এর পশ্চাদ্ধাবন !

অতি সুস্বাদু রান্নার জন্য একমাত্র উপকরণ
অশোক মশলাই আমার চাই সবসময়!

অশোক মশলা আর সব মশলা থেকে আলাদা। কারণ এই মশলা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এবং এর প্রতিটি প্যাকেটে রয়েছে বিশুদ্ধ, তাজা উপকরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিতে শীল করা যাতে এর সুগন্ধ ও স্বাদ বছর ধরে বজায় থাকে। সুতরাং, এরপর আপনি যখন অতিথি আপ্যায়ন করবেন, 'আগমার্ক' অশোক মশলার কথা অবশ্যই ভুলবেন না।

অশোক মশলা

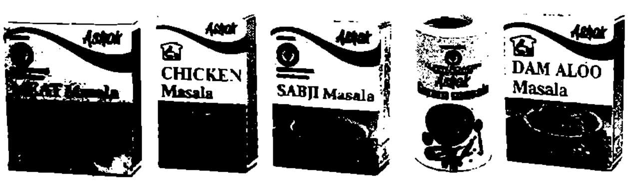

অশোক সেলস্ কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫১/৫৩, নয়াগঞ্জ, কানপুর ২০৮০০১ ফোন : ৩৬৫৬৭৭, ৩৬৩৭০৬
৯১-৫১২-৩১৭৬১১
naa/ASC/94

তুমি জানতে এইসব গাছপালা কী করে কখন !
তুমি এই পাখিদের বৃদ্ধ বৃদ্ধ পিতামহদের
চিনে নিয়েছিলে ! আমরা, তোমার নদীর আড়াআড়ি
কাঁটা ভরতি গাছ হয়ে বেড়েছি, বয়স পেয়ে গেছি ।
কাঁটা বাবলারই মতো, অর্ধপথে, শেষ-হইনি সাঁকো ।
এসেছি মাধবপুর পনেরো পয়সার খেয়া দিয়ে
তুমি কত খেয়া দিলে ? আমাদের জন্য কত খেয়া
এপার ওপার তুমি রেখে দিলে, জেনে তো আসিনি !
এখানে তোমার দেশ, অতীত অদৃষ্টপূর্ব দামে ।
আঘাটায় ঢলে আছে বাঁশবেড়া নদীতে অর্ধেক !
ওই পথ দিয়ে নাকি সীমান্তে গরু চালান হয় ।
ওরা বলে, গরু পার করে করে দেশটার রইল না কিছু ।
কী দেশ, কী গরু পার ? আমার বোঝার বহু দেরি,
যেতে দেরি, আসতে দেরি, গাছে পিঠ ঘুমন্তের দেরি,
বেলা বুঝতে আরো দেরি, কোন সন তারিখে রয়েছি ?
অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই প্রান্তে পা মাথা শয়ান
তোমার এখানে দেশ, অতীত, অদৃষ্ট জলদাম ।
মনে মনে নাটা-কাঁটা, মনে মনে তিত্তিরাজ গাছের তলায়
সুঁড়িপথ আবিষ্কার, ময়না ঝোপের তলা দিয়ে
বন-ধুঁদুলের লতা কোথায় ত্রিশূন্যে দোলে, কই
প্রাচীন শিরিষগাছে শ্যাওলা ধরা ডালে পরগাছা !
এ বনের শেষ দেখতে নেই স্বপ্নে এ বনের শেষ...
গুলঞ্চ লতা দোলানো থোলো থোলো বনচালতার
ফল চারিধারে আর সুঁড়িরাস্তা আমবাগানে শেষ ...
জানি তুমি একদিন এই পথ চারণ করেছ
ধুলো ধুলো, ঘাস ঘাস, ঘাসপুত্র ঘাসকন্যাদের
অভিজ্ঞান, জল জল, অভিজ্ঞান, রৌদ্রতাপ, এই
মাঠযুক্ত, পথযুক্ত, ঘ্রাণ-দৃষ্টি-শ্রুতিযুক্ত হয়ে
দান করছে তেপান্তরে পায়ে পায়ে চিরমুহূর্তকে !
হাতে হাতে নিশ্চয়তা । তেপান্তর মানে দুই চোখ
একবারে যতদূর দেখতে পায়, তার সবটুকু...
সময় দৌড়য়, তার থামা নেই, থামা নেই, লাফ...
লাফিয়ে পড়লেই মধ্যে খোঁদলে কী দীঘিভরা জল
গলা অবদি ডুবে যাবে, সন্তরণ কাজে লাগবে না
নিচে গেলে দেখা যাবে, কর্ণ আজো কাদা থেকে তাঁর
রথচক্র কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলছেন । খোলা চুলে
বনলক্ষ্মী ঝাঁপি নিয়ে একপলক আবির্ভূতা হয়ে
জলে গুলে যাবেন ফের । নিচে খেলবে আলো ঘোলা রঙ...
পানাজল ঠেলে দিয়ে দীঘি থেকে উঠে দেখি, রাত ।
রাত্রি থেকে মাথা তুলতে যাই, একী, ছাদ হচ্ছে মাটি !

লেখক, কীভাবে এই মেদিনীটি ভেদ করে ওঠো ?
লেখক কীভাবে এই ভূ-গোলকে দখল বসাও
আমরা দিনের আলো ফেলে রাখি দিবসের কাজে
রাতের আলোটি জ্বেলে আমরা পোকামাকড় তাড়াই
আমরা বাঁ হাতে দিয়ে ডান হাতে সুধার বিন্দু চাই
এই যে ছোটর ছোট নদী, এর দুই তীর ধরে
আঁকা হতে বাঁকা হতে আলো অন্ধ চরিত্র কতই
দাঁড়ায়, ফেরত আসে, অন্ধকার খাতা মেলে দেয়
তেপান্তর মাঠে মাঠে, আমরা দৌড়ই গল্প ধ'রে...
যা দেখি তা শেষ হয়নি, আরো নিচে নেমে গেছে ঢাল...
এক পাতা বন্ধ হয়, এক পাতা খুলে যাবে কাল !

২

এইসব গাছেদের পূর্ব পূর্ব পুরুষের প্রাণ
তুমি স্পর্শ করেছিলে হাতে তুলে। বৈঁচি বাবলায়
জল বা আলোর ফোঁটা কতটা একাগ্র হয়ে পড়ে
শিষ থেকে শিষে যেতে পতঙ্গের কী গতি পাখায়
বনের কোন্ দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ আবির্ভূত।
কোথায় মাঠের পারে অজানা বসতিশূন্য দেশ—
তুমি তার পরীক্ষাও নিয়েছিলে প্রাণ নেড়ে চেড়ে
এইসব মৃত্তিকার, এইসব মাটিমেদিনীর
আকর্ষণ, গন্ধ, দান, ধরেছিলে স্বীয় শস্যমুখে
মাটিতে বিছানো হাত আজো বুঝি টের পাই তোমার—
বিছানো, ছড়ানো হাত, হাতের রেখায় বহুমুখী—
ছাপ, চিহ্ন, ভবিতব্য, গমনাগমন, কৃষিকাজ
এক যুগ থেকে অন্য যুগে হাত রাখা
করতলে খোলা ক্ষেত নিজে থেকে উল্টেপাল্টে গিয়ে
লুপ্ত বীজ ঠেলে তোলে হাতের পাতার থেকে গাছ।
গোল হয়ে পাখি ঘোরে গ্রামান্তের আকাশে আকাশে
গন্ধে বশীভূত হয়ে, পালকের রঙে অন্ধ হয়ে
আমার সকল আত্মা এ বন সন্ধান করে ফেরে
যেন সেও লতা ছিল। ছিল সে লতায় বসা পাখি।
এইসব পাখিপক্ষী, ভিতরে অনেক মুক্ত রঙ
এইসব মৃত্তিকার অনেক ভাইভগিনী ছিল
এইসব পরিবার দূরে দূরে আলোজ্বলা কুঁড়ে
এক থালা দুঃখের ভাত, একযোগে গালগল্পে খাওয়া
এইসব লেপ-তোশক গায়ে টেনে সারি সারি ঘুম
মাটির আধারে ঘুম, অথবা জলের ধারে ধারে
দেহ ঢেলে পড়ে থাকা যেখানে তোমার মাটিদেশ
তোমার লেখার কাশ, তোমার লেখার উলুবনে
ঢুকে পড়া, ঘোরতর জঙ্গলের অতি পৌরাণিক
অধিষ্ঠাতা আছে বুঝি, ঈশ্বরের প্রাণও হাতে আসে।
তোমার পথের সঙ্গে চলে গিয়ে, স্থির জনপদ ....
শতশত দরকার সেইখানে স্তূপ হয়ে পড়ে।
মাটির গঠনশক্তি এখনো অপরিসীম ক্ষয়
ধরে ও পূরণ করে, আমি সে মাটির হাতে যাই।

প্রয়োজন মতো বেলা, আলো থাকতে সম্বিত ফেরে না
পিছনে পিছনে হা হা হাই রোড তাড়া করে আসে...

৩

জমি থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে রোয়াকে পৌঁছেছে
দেয়ালে নতুন রঙ, ফেরানো হয়েছে সদ্য কলি
একপাশে বেদি করা, বেদির পিঠের দিকে ঢেউ...
তুমি বসতে। কাছাকাছি স্বর্ণচাঁপা কাঁঠচাপা দুই বোন থাকে!
সামনেই কামিনী, তার শ্যামনীল পাতা ক্ষুদ্রাকার
তেঁতুল, কদমও আছে, উঠোনের নিকটে ডালিম।
এতসব গাছপালায় ঘিরে বসে লেখা করতে তুমি?
ওটাকে বিলবিলে বলে? ওই যে, ওই ছোট্টমতো ডোবা?
দরজার তালা খুলছে... সুদূর আত্মীয় থাকে ঘরে।
তারই একটু খাট তোশক, হাতে তোলা মাটির উনুন।
কুলঙ্গির ছবি থেকে তুমি সোজা তাকিয়ে রয়েছ
এইখানে তুমি থাকতে? এখানে তীর্থের জন্য আসা।
পিছনের দাওয়া ফাটা, ফাটলে অপরাজিত ফুল।
তুমি কোনখানে লিখতে? ওই যে, বকুলঅন্ধ গাছ,
বাড়ির ডানদিকটায়, ওর পায়ে ঠেস দিয়ে বসে?
অথচ ও গাছ নাকি একদিন পুড়ে গিয়েছিল
তোমার মৃত্যুর পর, জনশ্রুতি, ও গাছ আগুনে!
আবার নতুন করে জন্মেছে সে! না জন্মে কি পারে?
ও তোমার বন্ধু ছিল, বন্ধু হবে, জন্ম জন্ম, গল্পের ওপারে...

৪

মোটর গাড়ির সামনে মেঘ নেমে এল। কে মেয়েটা?
এক হাতে টিফিন কৌটো, এক হাতে ভাইয়ের হাত ধরে,
ঢালু দিয়ে ক্ষেতে নামছে, বাবাকে খাবার পৌঁছে দেবে।
এই মেয়ে দুর্গা বুঝি? কোঁচড়ে আমের কুসি নিয়ে
সালোয়ার কামিজ পরা নীল মূর্তি দাওয়ায় দাঁড়াবে?
কিংবা এ-ই, অন্য মাঠে, ময়নাপাড়ার মাঠে গিয়ে
আকাশে যুগল ভুরু হানলো কিনা, দেখলো কিনা চেয়ে
সে কথা কবির সঙ্গে মনে মনে জেনে সেই মেয়ে
এত দূর চলে এল? অথবা সে আমাদের পাশের বাড়িতে
পঁচিশ বছর আগে ভাড়া থাকত?
কুল নিয়ে ঝগড়া করে আড়ি হয়েছিল
বছর বছর ধরে আর কথা বলেনি তারপর?
নাকি ও আমারই শিশু, যে পরে বাবাকে দেখতে যাবে?
না, ওরা না। কেউ নয়, অচেনা অপরিচিত মেঘ।
সীতা আর বনলক্ষ্মী মিশে
যে উঠছে বাসন নিয়ে ঘাট থেকে সে কি ওর
বাড়ি বাড়ি কাজ করা মা?
এ মাঠ সর্বংসহা, এ মাটির উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা কাজ
সে কবি কোথায় রইলো, সে কবি কোথায় রইলে আজ!
এ মেয়ে দুর্গার বড়, চোখে তাই ঝিলিক ফুটেছে,
কার ঘরে যাবি তুই? কার ঘরে ঠেলবি হেঁসেল!

—'আমি কী করি না করি তোর তাতে কী রে
কাপড়ের ব্যবসা দোব,
বর্ডারের মাল আনবো, বারোমাস সেল !'

৫

রাস্তার দুধারে এত কাশ ফুল দাঁড় করালো কে ?
বন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি বালক, অপু নয় ।
খাটো প্যান্ট, আঁটো গেঞ্জি । আমাদের থেমে থাকা গাড়ি—
সামনে এসে দেখছে বাঁকা চোখে । মুখে 'চিজ বড়ি হ্যায়
মস্ত্ মস্ত্' গান আছে । কোমরে ভিডিও ভাঙা নাচ ।
নতুন লোকের দিকে কৌতূহল নয়, কৌতুকের,
ঘৃণাকৌতুকের দৃষ্টি ।
গাড়ি ছেড়ে দেওয়া মাত্র সিটি তোলে ।
ইশারা জানায় ।
দু আঙুলে, ছাপবার অযোগ্য ইশারা ।

গোপাল নগর থেকে, গাইঘাটা, গুমা, চাঁদপাড়া
আমরা ফেরত আসছি । ডোবা, ছাইগাদা, কচুবন ।
লাইনের ধারে ধারে গাঁজা আর চোলাইয়ের ঠেক ।
দুধারে ঝোপঝাড় দুলছে । জলে শুয়ে আছে পাট ।
মাঠে উড়ছে চাঁদ দিশাহারা...
রামায়ণ যাত্রা নয় । রাত রাত জেগে
A মার্কা ভিডিও দেখছে গ্রামে গ্রামে অপুদের পাড়া !

৬

গূঢ় অন্ধ পৃথিবীর ভিতরে কী প্রবেশাধিকার
এ-মুহূর্তে লাভ করি, আর পরমুহূর্তে হারাই !
মুহূর্ত, সময়স্রোত একটি বিন্দুতে থেমে গিয়ে
আবার পিছনে চলে, যেন প্রজাপতির পশ্চাতে
দুর্গম বালক দৌড়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে মিশে যায়
থেকে থেকে দৃঢ় ভিত্তি আরণ্যক গুঁড়ি, বাধা রাখে,
পুরোনো বোলতার বাসা, ওঠানামা পিপীলিকা দাগ,
মাতা গন্ধ, মাতা প্রাণ, আমার কি লেখাধর্ম নেই ?
মাতা গুল্ম, মাতা মূল, আমি হইনি ভূমিতে উদ্গত ?
আমি বাইরে আসিনি কি আদিম কাদার স্রোত ঠেলে ?
কেন এই চিনতে পারো, কেন পরমুহূর্তে হারাও ?
আমি অঙ্কুরের ভাই, কপালে রোদ্দুর ঠিকরে দাও !

৭

'ছাতাটি বগলে নিয়ে আনমনে ইস্কুলে যেতেন
কারো পানে চাইতেন না'...(বিশ্বনাথ হালদার নামক
মাঝির এমত সাক্ষ্য) । ... কত পার করেছি তেনাকে ।'

এই রাস্তা ? এই পার ? রাস্তাটি বুজিয়ে নেয় চোখ !

দাঁড়ানো পাথর মূর্তি । ছেলেরা স্কুলের কোলে কাঁখে
হুটোপাটি করে ফিরছে । ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ।
বিকেলের বাস এল । কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে লোক ।

গাছের আড়ালে সূর্য । ভাঙা মেঘে লাল হলদে ছাই ।

আমিও শহরে ফিরি । রাতে জানলা খুলে দেখতে পাই
ইস্কুলের কম্পাউন্ডে, পাথরের মূর্তি থেকে নেমে
জ্যোৎস্নালোকে বেড়াচ্ছেন বেখেয়ালি মাস্টারমশাই ।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

প্র · চ্ছ · দ নি · ব · ন্ধ

বিভূতি-সাহিত্য

সু নী ল দা স

রচনার সুনির্বাচিত একটি তালিকা উত্তরকালের পাঠক ও গবেষকদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সেকালের প্রকাশনায় প্রকাশকাল নির্দেশিত হত না। এটিও ধারাবাহিকতা নির্দেশে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রচনা, বিভিন্ন নামে ও সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত জট ছাড়াবার প্রয়াসে তালিকাটি যতদূর সম্ভব তথ্যনিষ্ঠ।

প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্য জীবনে বিভূতিভূষণ বহু লিখেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে ৪৬টি বই। বাকি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর পর যে সব গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তা অধিকাংশই পুনর্মুদ্রণ ও নানা বই থেকে ইতস্তত সংকলিত।

গ্রন্থপঞ্জিটি কালানুক্রমিক। শুধু মাত্র প্রথম সংস্করণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এবং বহু ক্ষেত্রে ইংরাজি ও বাংলা সাল—দুটোরই উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিভূতিভূষণের প্রথম সংস্করণ গ্রন্থের জরাজীর্ণ অবস্থা। আখ্যাপত্র ও শেষদিকের পাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনষ্ট। এ ঘটনা বহুল পঠিতের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু গ্রন্থপঞ্জি রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশকাল অত্যন্ত জরুরি। বিভূতিভূষণের বহু গ্রন্থে প্রকাশকাল দেওয়া নেই। তাই নির্ভর করতে হয়েছে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার উপর। যে কাজটি তাঁর মৃত্যুর পর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করে গেছেন (দ্রষ্টব্য শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭)। এ ছাড়া গ্রন্থপঞ্জিটি পূর্ণাঙ্গ করতে 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা : বিভূতিভূষণ সংখ্যা ১৯৯১' এবং 'বিভূতি রচনাবলী' ও বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবুও বেশ কিছু গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি গ্রন্থপঞ্জিটিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার মুখ্য গ্রন্থাগারিক শক্তিদাস রায় মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতায়।

পথের পাঁচালী (উপন্যাস)। কলিকাতা, রঞ্জন প্রকাশালয়, ২ অক্টোবর ১৯২৯ (১৬ আশ্বিন ১৩৩৬)। ৪২৬ পৃ.। মূল্য ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ : 'পিতৃদেবকে'।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : বিচিত্রা, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৩৫-৩৬।

মেঘমল্লার (গল্প)। কলিকাতা, বরেন্দ্র লাইব্রেরি, ১৯৩১ (১৩৩৮)। ২১৯ পৃ.। মূল্য : ২.০০ টাকা। উৎসর্গ : 'মেজমামা

●

'বেশ বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে। ... উত্তেজনায় সে রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র কাটিল।'
—আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস।

●

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ করকমলে'।
সূচি : মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউচণ্ডীর মাঠ, নব-বৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁই-মাচা, উপেক্ষিতা।
'উপেক্ষিতা' গল্পটিই বিভূতিভূষণের প্রথম মুদ্রিত রচনা। ১৩২৮ মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

অপরাজিত (উপন্যাস)। কলিকাতা, সজনীকান্ত দাস, ১৯৩২ (১৩৩৮)। ১ম খণ্ড : ১৯৩২ (মাঘ ১৩৩৮)। ৩৫৪ পৃ.। মূল্য : ২.২৫ টাকা। ২য় খণ্ড : ১৯৩২ (ফাল্গুন ১৩৩৮)। ৩৫৫-৬১৯ পৃ.। মূল্য : ২.০০ টাকা। উৎসর্গ : 'মাতৃদেবীকে'।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : প্রবাসী, পৌষ-আশ্বিন ১৩৩৬-৩৮।

মৌরীফুল (গল্প)। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৯৩২ (১৩৩৯)। ১৭৫ পৃ.। মূল্য : ১.৭৫ টাকা। উৎসর্গ : 'স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসুকে'।
সূচি : মৌরীফুল, জলসত্র, রোমান্স, রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটী-দেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।

যাত্রাবদল (গল্প)। কলিকাতা, পি. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৩৪ (১৩৪১)। ১৬২ পৃ.। মূল্য : ১.৫০ টাকা। উৎসর্গ : 'ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'।
সূচি : ভণ্ডুলমামার বাড়ী, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডানপিটে, যাত্রাবদল।

দৃষ্টি-প্রদীপ (উপন্যাস)। কলিকাতা, পি. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৩৫ (১৩৪২)। ৩১৬ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৪০-৪১।

বিচিত্র জগৎ (সচিত্র সন্দর্ভ)। কলিকাতা, প্রবোধচন্দ্র সরকার মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭ (১৩৪৪)। ৪+২৯০ পৃ.।
মূল্য : ৫.০০ টাকা। উৎসর্গ : রেণুকে।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : বিচিত্রা পত্রিকায় বিবিধ সংগ্রহ বিভাগে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত।
সূচি : আধুনিক গ্রীস, পারস্য, বর্তমান প্যালেস্টাইন, বর্তমান মাঞ্চুরিয়া, বলিভিয়া, বেলজিয়ামের খালপথে, বরফের রাজ্য, ইংলন্ডের পল্লী, উত্তর আমেরিকা হইতে দক্ষিণ আমেরিকা, হাওয়াই হইতে সানফ্রানসিসকো,

প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর, বোম্বেটেদের শহর সেন্ট ম্যালো, সান্টা ফি, জ্যামেকা, কলোরাডো, বোর্ণিও দ্বীপ, ফিজি দ্বীপ, মাদাগাস্কার দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেশিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ, ভারত সমুদ্রের দ্বীপ, হাইতুরুদ্বীপ, টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো, যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি, মরুভূমির দেশ আরব, আরিজনার মরুভূমি, তুর্কিস্থানের মরুপথ, মাঞ্চুকুও, পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজান, কলোরাডো নদী, চীনের নদী, পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য, পানামা খাল ও অরণ্য, ভোলাপথ, ভূস্বর্গ সেচিলিস, সার্গুয়ে-র সেলুঙ জাতি, সমুদ্রতলের নূতন জগৎ, জলের তলায় নূতন জগৎ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য বস্তু, তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর কংকা, কেপ্রিদ্বীপের পাখীর আড্ডা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু, ব্যাঙের চাষ, কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী, লিবীয় মরুভূমি, এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন, আমেরিকার কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য ঘুম, ফার্ন, ভূমধ্যসাগর হইতে পিকিং।

চাঁদের পাহাড় (ছোটদের উপন্যাস)। কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৩৮ (১৩৪৪)। ১৭৫ পৃ.। সচিত্র। মূল্য : এক টাকা ছ আনা। উৎসর্গ : খুকুকে দিলাম।

সাময়িকপত্রে প্রকাশ : মৌচাক, আষাঢ়-চৈত্র ১৩৪২-৪৩।

জন্ম ও মৃত্যু (গল্প)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৩৮ (১৩৪৪)। ১৮৮ পৃ., মূল্য : ২.০০ টাকা। উৎসর্গ : সুপ্রভাকে।

সূচি : যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরি, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

'অকারণ' গল্পটি যাত্রাবদল গ্রন্থে 'একটি দিন' নামে ছাপা হয়েছে।

আইভ্যানহো (অনুবাদ)। ১৯৩৮ (১৩৪৫)। পৃ. ২১১।

কিন্নরদল (গল্প)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৩৮ (১৩৪৫)। ২০৫ পৃ.। মূল্য : ২.০০ টাকা।

সূচি : মণি ডাক্তার, পুরোণো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটি চচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধু মাষ্টার, উন্নতি, কিন্নরদল।

আরণ্যক (উপন্যাস)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৩৯ (১৩৪৫)। ৫+৩৩৩ পৃ। মূল্য : ২.৫০ টাকা। উৎসর্গ : গৌরীকে দিলাম।

সাময়িকপত্রে প্রকাশ : প্রবাসী, কার্তিক-ফাল্গুন ১৩৪৪-৪৫।

মরণের ডঙ্কা বাজে (ছোটদের উপন্যাস)। কলিকাতা, বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০ (১৩৪৬)। ১৫০ পৃ.। সচিত্র। মূল্য: চৌদ্দ আনা।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ : মৌচাক, পৌষ-আশ্বিন ১৩৪০-৪৬।

অভিনব বাঙলা ব্যাকরণ (পাঠ্য)। কলিকাতা, সেন ব্রাদার্স, ১৯৪০ (১৩৪৭)। ২+১৫৫ পৃ.। মূল্য : ×

কো-এডুকেশন (বারোয়ারি উপন্যাস)। ১৯৪০ (১৩৪৭)। বিভূতিভূষণ ৯১-১১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছিলেন।

আদর্শ হিন্দু-হোটেল (উপন্যাস)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৪০ (১৩৪৭)। ২৯২ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণীয় শ্রীমান নন্টুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সাময়িকপত্রে প্রকাশ : মাতৃভূমি, মাঘ- ভাদ্র ১৩৪৫-৪৭।

অভিযাত্রিক (ভ্রমণ কাহিনী)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪১ (১৩৪৭)। ৩+২৫৮ পৃ। সচিত্র। মূল্য : ২.৫০ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণী উমাকে।

মীনকেতুর কৌতুক (বারোয়ারি উপন্যাস)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৪১ (১৩৪৮)।

বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন ৯৭-১২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বেণীগির ফুলবাড়ী (গল্প)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল ১৯৪১ (১৩৪৮)। ১৭৪ পৃ.। মূল্য : ১.৫০ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণীয়া জাহ্নবীকে দিলাম।

সূচি : বেণীগির ফুলবাড়ী, মাষ্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শান্তিরাম, কুয়াশার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা।

স্মৃতির রেখা (দিনলিপি)। কলিকাতা ১৯৪১ (১৩৪৮)। ১৫৫ পৃ.। উৎসর্গ : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশে।

দিনলিপির রচনাকাল : ২৭ অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল ১৯২৮ পর্যন্ত।

বিপিনের সংসার (উপন্যাস)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৪১। ৩৪৯ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা। উৎসর্গ : চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ : অলকা, আশ্বিন-ভাদ্র ১৩৪৫-৪৬।

দুই বাড়ী (উপন্যাস) কলিকাতা, শঙ্করানন্দ ঠাকুর, ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১৯৪১ (১৩৪৮)। পৃ. ১৮৬। মূল্য : ১.০০ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণীয়া বধূমাতাকে।

পঞ্চদশী (বারোয়ারি উপন্যাস)। ১৯৪১। বিভূতিভূষণ ১২২-১৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছিলেন।

মিসমিদের কবচ (ছোটদের উপন্যাস)। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৪২। ৯৯ পৃ.। সচিত্র। মূল্য : ৫০ পয়সা। উৎসর্গ : শান্তকে দিলাম।

অনুবর্তন (উপন্যাস)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৪২ (১৩৪৯)। ২৯৯ পৃ.। মূল্য: ২.৭৫ টাকা।

তৃণাঙ্কুর (দিনলিপি)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৪৩ (১৩৪৯)। ১২৪ পৃ.। মূল্য : ২.২৫ টাকা। উৎসর্গ : সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের করকমলে।

দিনলিপির রচনাকাল : ১৯ জুন ১৯২৯-জানুয়ারি ১৯৩৫।

টমাস বাটার আত্মজীবনী (অনুবাদ)। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স ১৯৪৩ (১৩৫০)। ২+১৬০ পৃ.। মূল্য : ৪.০০ টাকা। ভূমিকা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

'জান বারোস কৃত ইংরেজী হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।'

নবাগত (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৪ (১৩৫০)। ১৮০ পৃ.। মূল্য : ২.০০ টাকা। উৎসর্গ : অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু।

সূচি : দ্রবময়ীর কাশীবাস, আমার লেখা, ক্যানভ্যাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে

হলুদ, ঠাকুরদা'র গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব।

তালনবমী (ছোটদের গল্প)। কলিকাতা, রমেশচন্দ্র ঘোষাল, কালিকা প্রেস ১৯৪৪ (১৩৫১)। পৃ. ১০৪। সচিত্র। মূল্য : ১.৫০ টাকা।

সূচি : তালনবমী, রুক্মিণী দেবীর খড়্গ, মেডেল, মশলাভূত, বাসা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল।

ছোটদের পথের পাঁচালী (উপন্যাস)। কলিকাতা, অপূর্ব্বকুমার বাগচী, বোস প্রেস ১৯৪৪ (১৩৫১)। ২+১৯২ পৃ.। মূল্য : ২.২৫ টাকা।

উর্ম্মিমুখর (দিনলিপি)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৪৪ (১৩৫১)। ৮৫ পৃ.। মূল্য : ×

দিনলিপির রচনাকাল : মে ১৯৩৫- সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।

দেবযান (উপন্যাস)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৪ (১৩৫১)। ২৩৭ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু।

আম আঁটির ভেঁপু (ছোটদের উপন্যাস)। কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৯৪৪ (১৩৫১)। ১৮১ পৃ.। সচিত্র। মূল্য : ২.২৫ টাকা।

উপলখণ্ড (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৫ (১৩৫২)। ১৭১ পৃ.। মূল্য : ২.৭৫ টাকা।

সূচি : আহ্বান, একটি ভ্রমণ কাহিনী, নসুমামা ও আমি, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা।

বিধু মাস্টার (গল্প) কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৪৫ (১৩৫২)। ২০৮ পৃ.। মূল্য : ×

সূচি : বাক্স বদল, মূলো- র‍্যাডিশ- হর্স র‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডুমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসীমা, বিধু মাস্টার, অভিশাপ। 'বিধুমাস্টার', 'কিন্নরদল' গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়েছে।

কেদার রাজা (উপন্যাস)। কলিকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৪৫ (১৩৫২)। ৩৬৩ পৃ.। মূল্য : ×। উৎসর্গ : আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাইবুনালের বিচারপতি সুসাহিত্যিক শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ ব্যারিস্টার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান আলোকরঞ্জনের স্মৃতিতর্পণে।

সাময়িকপত্রে প্রকাশ : মাতৃভূমি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ থেকে।

বনে-পাহাড়ে (ভ্রমণ কাহিনী) কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৪৫ (১৩৫২) ৮৯ পৃ. মূল্য :

পিতা ও পুত্র

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

২.২৫ টাকা।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : মৌচাক, আষাঢ় ১৩৫০-আষাঢ় ১৩৫২।
ক্ষণভঙ্গুর (গল্প)। কলিকাতা, গুপ্ত প্রকাশিকা, ১৯৪৫ (১৩৫২)। ১৩১ পৃ.। মূল্য : ২.২৫ টাকা। উৎসর্গ: স্বর্গতা মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশে।
সূচি : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলেধরা, রামতারণ চাটুজ্জে— অথর, নুটি মন্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য।
উৎকর্ণ (দিনলিপি)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৬ (১৩৫২)। ২৫৪ পৃ.। মূল্য : ×। উৎসর্গ : জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায়— অথচ দাবি করেনি কিছু— তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম।
দিনলিপির রচনাকাল : ১১ অক্টোবর ১৯৩৬-১৬ নভেম্বর ১৯৪১।
অসাধারণ (গল্প)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৪৬ (১৩৫৩)। ১৮১ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ : স্বনামখ্যাত বন্ধু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে।
সূচি : অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ি, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-বিক্রী বুড়ো, হারুণ-অল-রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো-বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, দুই দিন, মাকাললতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নিচে।
হীরা মানিক জ্বলে (ছোটদের উপন্যাস)। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৪৬ (১৩৫৩)। পৃ. ১৫৯। মূল্য : ×।
সাময়িক পত্রে প্রকাশ : মৌচাক, বৈশাখ ১৩৪৮- চৈত্র ১৩৪৯।
ছেলেদের আরণ্যক (উপন্যাস)। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৪৭ (১৩৫৩)। ২৪৯ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা।
বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৭ (১৩৫৪)। পৃ. ২১২। মূল্য : ৪.৫০ টাকা। ভূমিকা : প্রমথনাথ বিশী।
সূচি : কিন্নর দল, মৌরীফুল, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, দ্রবময়ীর কাশীবাস, আহ্বান, একটি ভ্রমণকাহিনী, নসুমামা ও আমি, বিপদ, তুচ্ছ, সিঁদুরচরণ,তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ভণ্ডুলমামার বাড়ী, কনে দেখা, মেঘমল্লার, পুঁই-মাচা।
অথৈজল (উপন্যাস)। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৪৭ (১৩৫৪)। ২৫৩ পৃ.। সচিত্র। মূল্য : ×।
সাময়িক পত্রে প্রকাশ : প্রভাতী, চৈত্র ১৩৫০-পৌষ ১৩৫৩।
মুখোস ও মুখশ্রী (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৭ (১৩৫৪)। ১৭৬ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ: পূজনীয় মাতুল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে।
সূচি : মুখোশ ও মুখশ্রী, রাসু হাড়ি, দৈব ঔষধ, বারিক অপেরা পার্টি, উড়ুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্ত পুরুষ, হরিদাস, অন্তর্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী।
হে অরণ্য কথা কও (দিনলিপি)। কলিকাতা, আরতি এজেন্সি, ১৯৪৮ (১৩৫৪)। ১৮৮ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ : বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে। দিনলিপির রচনাকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৪২-১৯৪৭ (আনুমানিক)।
আচার্য কৃপালনী কলোনি (গল্প)। কলিকাতা, ১৯৪৮ (১৩৫৫)। ১১৪ পৃ.।মূল্য : ×। উৎসর্গ : সুহৃদ্বর শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে দিলাম।
সূচি : আচার্য কৃপালনী কলোনি, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুঁড়ির টাকা, প্রত্যাবর্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।
জ্যোতিরিঙ্গণ (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৯। ১৩৯ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা। উৎসর্গ : পণ্ডিতবর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সূচি : সংসার, হিংয়ের কচুরী, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, খনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।
ইছামতী (উপন্যাস)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৫০। ৪২৪ পৃ.। মূল্য : ৬.০০ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণীয়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কুশল-পাহাড়ী (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫০ (১৩৫৭)।
২+৪+২৮ পৃ.। মূল্য: ×। উৎসর্গ : কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের করকমলে। ভূমিকা : অপরাজিত বিভূতিভূষণ— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সূচি : কুশল-পাহাড়ী, ঝগড়া, বড় দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মান তালাও, বে-নিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জওহরলাল ও গড, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ী ফেরা, হরিকাকা, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিস্ট, শেষ লেখা।
সুন্দরবনে সাত বৎসর (ছোটদের গল্প)। কলিকাতা, এম. সি. সরকার ১৯৫২ (১৩৫৯)। ১১৮ পৃ.। মূল্য : ৩.৫০ টাকা।
'সখা ও সাথী' পত্রিকার সম্পাদক ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ যুগ্ম লেখক। গ্রন্থটির ভূমিকায় বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন— 'শেষ দিকের কয়েকটি অধ্যায় লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের সুন্দর গল্পটি সমাপ্ত করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।'
দম্পতি (উপন্যাস)। কলিকাতা, ১৯৫২ (১৩৫৯)। ২০৬ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা।
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প। কলিকাতা, ১৯৫৫ (১৩৬২)। ১২৩ পৃ.। সূচি : আরক, দাদু, বাঘের মন্তর, খনটন কাকা, নুটি মন্তর, হারুণ-অল-রসিদের বিপদ, ঠেলাগাড়ী, কাশী কবিরাজের গল্প, অবিশ্বাস্য, বিরজা হোম ও তার বাধা, পথ চেয়ে।
লবটুলিয়ার কাহিনী (ছোটদের জন্য)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ ১৯৫৫ (১৩৬২)। ১৭৬ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা।
গল্প-পঞ্চাশৎ (গল্প)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৬ (১৩৬৩)। ৫০৮ পৃ.। মূল্য : ×।
সূচি : আমার লেখা, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব, কয়লা ভাঁটা, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা, বাক্সবদল, মূলো- র‍্যাডিস- হর্স র‍্যাডিস, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডু মশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসিমা, বিঠু মাষ্টার, অভিশাপ, একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলে-ধরা, রামতারণ চাটুজ্জে—অথর, নুটি মন্তর, ফড় খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য, সংসার, হিংয়ের কচুরী, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, খনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।
গ্রন্থ পরিচয় : রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।
রূপহলুদ (গল্প)। কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭ (১৩৬৪)। ১১৮ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা। সূচি : ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়; কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারি, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।
অশনি সংকেত (উপন্যাস)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৯৫৯ (১৩৬৬)। ১৫৮ পৃ.। মূল্য : ৪.৫০ টাকা।
সাময়িকপত্রে প্রকাশ : মাতৃভূমি, মাঘ ১৩৫০-মাঘ ১৩৫২।
অনুসন্ধান (গল্প)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৯৬০ (১৩৬৬)। ২+১০০ পৃ.। মূল্য : ৩.০০ টাকা।
সূচি : অনুসন্ধান, টান, চ্যালারাম, সান্ত্বনা।
ছায়াছবি (গল্প)। কলিকাতা, চণ্ডীদাস

চট্টোপাধ্যায়, তাপসী প্রেস, ১৯৬০ (১৩৬৬)। ৪+৯৮ পৃ.।
সূচি : ছায়াছবি, বিপদ, কবিরাজের বিপদ, আমোদ, সতীশ, অভিনন্দন সভা, মরফোলজি, ডালুর বিপদ।
ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস।
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (গল্প)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৩৬৬। ১১৮ পৃ.। মূল্য : ৩.৫০ টাকা। ভূমিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
গ্রন্থটি 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' নামে পূর্বেই প্রকাশিত।
আমার লেখা (প্রবন্ধ)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৯৬১ (১৩৬৮)। ৯৬ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা।
সূচি : আমার লেখা, রবীন্দ্রনাথ, রবি-প্রশস্তি, প্রথম দর্শন, সাহিত্যে বাস্তবতা, সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প, সাহিত্য ও সমাজ, পরিশিষ্ট।
কুয়াশার রঙ (গল্প)। কলিকাতা, সাহিত্যায়ন, ১৯৬২ (১৩৬৯)। ১৭০ পৃ.। মূল্য : ৩.৫০ টাকা।
সূচি : কুয়াশার রঙ, মাষ্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন,
প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শান্তিরাম, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা, বেনীগির ফুলবাড়ি।
সুলোচনা (গল্প)। কলিকাতা, প্রাইমা, ১৯৬৩ (১৩৬৯)। ১১২ পৃ.।
সূচি : সুলোচনা, বাক্সবদল, স্বপ্ন-বাসুদেব, ফকির, দ্রবময়ীর কাশীবাস, রোমান্স।
প্রেমের গল্প। কলিকাতা, ১৯৬৩ (১৩৬৯)। ১৪৬ পৃ.।
সূচি : বোতাম, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, অসাধারণ, মণি ডাক্তার, মরফোলজি, প্রতিমা, বেনীগির ফুলবাড়ী।
অলৌকিক (গল্প)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৯৬৩ (১৩৭০)। ১১৮ পৃ.। মূল্য :×।
সূচি : প্রত্নতত্ত্ব, কবিরাজের বিপদ, টান, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, আরক, মেডেল, ছায়াছবি।
ভূমিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিভূতি-বিচিত্রা (সংকলন)। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৪ (১৩৭১)। ৬১২ পৃ.। মূল্য : ১২.৫০ টাকা।
সূচি : বিভূতি বৈচিত্র্য— প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ—চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, কেদার রাজা, চাঁদের পাহাড়, মরফোলজি, অসাধারণ, নদীর ধারের বাড়ী, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-বিক্রী বুড়ো, হারুণ-অল-রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো-বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, দুই দিন, মাকাললতা কাহিনি, বঙ্কলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্লাক মার্কেট দমন কর, তুচ্ছ,

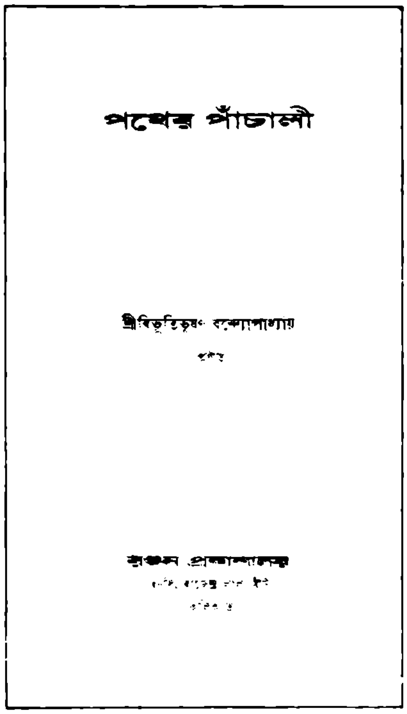

পিদিমের নিচে, অদৃশ্য ধর্মাধিকরণ, অমর কণ্টক-যাত্রা, দৃষ্টিপ্রদীপ, একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, দাবানল, পত্রসাহিত্য, নবযুগের কবি (কবিতা), আমার লেখা, দিনলিপি, কাজল কেন লিখব, শেষ লেখা।
ছোটদের দৃষ্টিপ্রদীপ (উপন্যাস)। কলিকাতা, বিভূতি প্রকাশন, ১৯৬৫ (১৩৭২) : ১০০ পৃঃ। মূল্য : ×। সচিত্র। ভূমিকা : কৃষ্ণধন দে।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন। কলিকাতা, ১৯৬৫, (১৩৭২)। ২০১ পৃঃ। মূল্য : ×।
সূচি : উপন্যাস—হীরামাণিক জ্বলে, গল্প— মায়াজাল, বিপদ, পৈতৃক ভিটা, রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ, আচার্য কৃপালনী কলোনী, কবিতা, ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা—চিঠি, নবযুগের কবি, আমার লেখা, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে।
বাক্সবদল (গল্প)। কলিকাতা, গ্রন্থম, ১৯৬৫ (১৩৭২)। ১০৫ পৃ.। মূল্য : ২.৫০ টাকা।
সূচি : বাক্সবদল, যাচাই, এয়ারগান, ডাকগাড়ি, বেনীগির ফুলবাড়ি, গ্রহের ফের, খুড়ীমা।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের ভালো ভালো গল্প।. কলিকাতা, ১৯৬৫ (১৩৭২)। ৯৬ পৃ.। মূল্য : ×।
সূচি : রাজপুত্র, বামা, ভৌতিক পালঙ্ক, তালনবমী, অভিনন্দনসভা, হাসি, ঝড়ের রাতে, জাল, গল্প নয়, গঙ্গাধরের বিপদ।
অরণ্যমর্মর (সংকলন)। কলিকাতা, অমর সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৬৭ (১৩৭৪)। ২২৪ পৃ.। মূল্য : ৭.০০ টাকা।
বিভূতি বীথিকা (সংকলন)। কলিকাতা, সাহিত্যম্, ১৯৭০ (১৩৭৭) ১১+৩৩৯ পৃ। মূল্য : ×।
বিভূতি রচনাবলী। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭০-১৯৭২ (১৩৭৭-১৩৭৯)। ১-১২ খণ্ড।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প। কলিকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৭১ (১৩৭৮)। ৫+১৯৯ পৃ.। মূল্য ১২.০০ টাকা।
সূচি : তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, বিরজা হোম ও তার বাধা, গঙ্গাধরের বিপদ, পৈতৃক ভিটা, বাঘের মন্তর, মায়া, কবিরাজের বিপদ, রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ, প্রত্নতত্ত্ব, মশলাভূত, নুটি মন্তর, টান, ছায়াছবি, মেডেল, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, রহস্য, পেয়ালা, ভৌতিক পালঙ্ক, আরক, হাসি, খাঁটি দেবতা, অভিশপ্ত।
অনশ্বর (উপন্যাস)। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৭২ (১৩৭৯) : ১৩৫ পৃ.। মূল্য : ৫.০০ টাকা।
বিভূতিভূষণের গল্প সমগ্র। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৫ (১৩৮২) ১৪+৮৯৩ পৃ.। মূল্য : ৪০.০০ টাকা। ভূমিকা : জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সম্পাদনা : জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও মণীশ চক্রবর্তী। ১ম খণ্ড।
অন্তরঙ্গ দিনলিপি। কলিকাতা, পুস্তক প্রকাশনী, ১৯৭৬ (১৩৮৩) ৮০ পৃ.। মূল্য ৫.০০ টাকা।
ছোটদের দেবযান (উপন্যাস)। কলিকাতা, ১৩৮৩। ৪+১৮৬ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০ টাকা।
বিভূতি-রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ) কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৭-৭৯ (১৩৮৪-৮৬)। ১-৬ খণ্ড।
বিভূতিভূষণের গল্প সমগ্র। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৯ (১৩৮৬) ৯০৩ পৃঃ। মূল্য : ৪৫.০০ টাকা। সম্পাদনা : জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও মণীশ চক্রবর্তী। ২য় খণ্ড।
বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি (১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৪১)। কলিকাতা, নাথ পাবলিশিং ১৯৮৩ (১৩৯০)। ২+৪+৩৭০ পৃ.। সচিত্র। মানচিত্র। মূল্য : ২৫.০০ টাকা। সম্পাদনা : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।
অপ্রকাশিত রচনা। কলিকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৮৮ (১৩৯৫)। ৮+৩৩৩ পৃ। মানচিত্র, হস্তলিপির ফটোকপি। মূল্য : ৫০.০০ টাকা। সম্পাদনা : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আশার ছলনে ভুলি

গোলাম মুরশিদ

১৪

প্রবাসে দৈবের বশে

বিশ্বাস করো, প্রিয় বন্ধু, বাংলা একটি অসাধারণ সুন্দর ভাষা ; এর পরিমার্জনের জন্যে দরকার কেবল প্রতিভাবান কয়েকজন লোকের। আমরা নিজেরা যেমনটা শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষার মতো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন এ ভাষার কথা সামান্যই জানা আছে; অথবা লোকেরা এ ভাষাকে কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে, সেটা নিতান্তই ভ্রান্তি ; এর আছে অসাধারণ মূল্যবান ভাষিক উপাদান। আহা, আমি যদি এই ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারতাম! কিন্তু তুমি তো জানো কোনও কাজ না-করে কেবল সাহিত্যিক জীবন যাপন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আমি বড্ডো গরিব, বা বলতে পার, গরিব অবস্থা মেনে নেবার মত মনোভাব আমার নেই, আমি তার চেয়ে অনেকটা গর্বিত। তোমার যদি টাকা থাকে, তুমি তা হলে বড় মানুষ, তা না-হলে কে তোমাকে পোছে? তখন তুমি হচ্ছ মর্যাদাহীন লোক। আমাদের দেশের বড় মানুষ কারা? চোরাবাগান আর বড়বাজারের নামহীন লোকেরা। ...আমি যদি সাহিত্যের জন্যে কিছু না-ও করে থাকি, অথচ আমার যদি সাহিত্যিক প্রতিভা থেকে থাকে, তা হলেও সেই সাহিত্যিক প্রতিভা পুরোপুরি লালন করার মতো সঙ্গতি আমার নেই। আমি যা করেছি, তা নিয়েই আমাদের জাতির সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিলেত যাবার আসল কারণ গৌরদাসকে লেখা এই চিঠিতে মাইকেল যেমন স্পষ্ট করে বলেছেন, তেমন করে অন্য কোথাও বলেননি।

ইংল্যান্ডে যাবার ঠিক আগে মাইকেলের জীবনে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটেছিল, যা তাঁর বিলেত যাবার বহু দিনের অবদমিত ইচ্ছেকে উস্কে দিয়েছিল। তা ছাড়া, যাওয়ার পথকেও সুগম করেছিল। বিশেষ করে মামলায় জিতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারায় তাঁর মনে একটা ধারণা হয়েছিল যে, তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি অনায়াসে ইংল্যান্ডে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারবেন। এর ওপর, বিদ্যাসাগরের মতো তাঁর কোনও কোনও বন্ধুও তাঁকে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর এই বন্ধুরা নিজেরা যা হতে পারেননি—প্রধানত বিত্তের অভাবে—মাইকেলকে দিয়ে সেটাই এখন বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো সর্বত্র দেশীয়দের উন্নতির পথ ছিল অত্যন্ত সীমিত। অথচ স্বজাতিকে নিয়ে গর্ব করার চেতনাও শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধছিল দ্রুত গতিতে, বিশেষ করে সিপাহি বিদ্রোহের পর। আইসিএস হবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষের বিলেত গমন অথবা দেশীয়দের ব্যারিস্টারি পড়ার হুজুগ এই নবলব্ধ স্বাজাত্যবোধেরই অংশবিশেষ। দেশীয়দের মধ্যে কোনো ব্যারিস্টার নেই, থাকলে সে ব্যারিস্টারের অনেক আয় হবে এবং সমাজে সে স্বীকৃতি লাভ করবে বড় লোক হিসেবে—মাইকেল নিজেও এটা জানতেন।

গ্রেজ ইন। লন্ডন। ব্যারিস্টারি পড়ার এই পুরনো ও বনেদি প্রতিষ্ঠানে মাইকেল ভর্তি হয়েছিলেন

সর্বোপরি, বিলেত যাবার স্বপ্ন তাঁর দীর্ঘদিনের। এখন অবস্থা মোটামুটি নিজের আয়ত্তের মধ্যে দেখতে পেয়ে মাইকেল আর এ ব্যাপারে দ্বিধা করতে পারেননি।

কল্পনার বিলেত যাবার জন্যে মাইকেল নানা ধরনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন নানা জনের সঙ্গে। পরিবার আর নিজের টাকাপয়সার ব্যবস্থাটাই ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি। পৈতৃক আমলের কর্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে তাঁর সম্পত্তি থেকে তাঁকে বেদখল করার চেষ্টায় তাঁর জ্ঞাতিদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও, তাঁকেই নিজের তালুক চক মুনকিয়া এবং গদারডাঙ্গা পত্তনি দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এক সময়ে মতিভ্রম হয়ে তাঁর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলেও, এখন তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তা ছাড়া, মহাদেব [illegible] নিয়মিত টাকাপয়সা দেন, [illegible] রেখেছিলেন কলকাতার [illegible] প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একজন—দিগম্বর মিত্রকে। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। [illegible] দিগম্বর মিত্র বিখ্যাত এবং ব্যস্ত মানুষ, [illegible] সব সময়ে যোগাযোগ করার মত সুযোগ তার না-ও হতে পারে। সে কারণে, দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন আরও একজন—পিসতুত ভাই বৈদ্যনাথ মিত্রের ওপর। এ কাজের বিনিময়ে তিনি বৈদ্যনাথ এবং তাঁর ভাই দ্বারকানাথকে বছরে তিন শো টাকা করে দেবার ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন।[১] তদুপরি এঁদের সম্পত্তিও দান করেছিলেন অনেক টাকার। মনে মনে বোধ হয় আশা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর বিলেত যাবার ব্যাপারে যখন এতটা উদ্যোগ নিয়েছেন, তিনিও দেখাশোনা করবেন তাঁর স্বার্থ এবং পরিবার।

বিদেশে চলে গেলে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বাধা পড়বে এবং সমাজে তাঁর যে-খ্যাতি হচ্ছিল, তাতে ছেদ পড়বে—এ আশঙ্কা তাঁর মনে নিঃসন্দেহে ছিল। সে জন্যে নিজের কবিখ্যাতি রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসুকে। ভেবেছিলেন রাজনারায়ণ (এবং তাঁর মতো অন্য বন্ধুরা) মাঝেমধ্যে তাঁর সাহিত্য নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা করলে তাঁর কবিখ্যাতি ম্লান না-হয়ে উজ্জ্বলই থাকবে। কিন্তু দৈবের বশে দেহাকাশ থেকে জীব-তারা যদি খসে পড়ে, তা হলে? তাঁর প্রিয় স্বদেশ তা হলে তাঁকে কি ভুলে যাবে! তাঁর চিঠিপত্র পড়লে মনে হয়, মৃত্যুচিন্তা তাঁর মধ্যে বেশ প্রবল ছিল। সুদূর ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসতে পারবেন কি না, সে সম্পর্কে তাঁর মনে সত্যি সত্যি আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এটা দেখাশোনা করার দায়িত্ব তো কাউকে দেওয়া যায় না! সে জন্যে প্রার্থনা করেছেন স্বদেশের কাছে। বস্তুত, "রেখো মা দাসেরে মনে"—এই কথা বলে বঙ্গভূমির সঙ্গে তিনি পাকা করে গিয়েছিলেন আর-এক ধরনের ব্যবস্থা। মোট কথা, আপাতদৃষ্টিতে সব রকমের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ৯ জুন (১৮৬২) সোমবার তিনি কলকাতা থেকে বিলেতের উদ্দেশে পাল তোলেন। বয়ঃসন্ধি কাল থেকে আরম্ভ করে তিনি বিলেত যাবার ধ্যান করেছিলেন। অবশেষে *ক্যান্ডিয়া* জাহাজে চড়ে সেই স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তিনি।

তাঁর জাহাজ মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছয় তিন দিন পরে—১২ জুন তারিখে। স্মৃতি-ভরা মাদ্রাজকে দেখে তাঁর সমগ্র অন্তর কী বেদনায়

মথিত হয়েছিল, তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। প্রায় চার বছর ধরে হেনরিয়েটার সঙ্গে ঘর করলেও, রেবেকাকে তিনি যে ভুলতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া, রেবেকার প্রতি মনোভাব যেমনই হোক না কেন, ছোটো ছোটো যে-সন্তানদের তিনি ফেলে গিয়েছিলেন—বার্থা, ফিবি, জর্জ আর মাইকেল—তাঁদের জন্য তাঁর মন কেমন উতলা হয়েছিল, তা-ও শুধু অনুমান করা যেতে পারে। আগেই লক্ষ্য করেছি, কনিষ্ঠ পুত্র মাইকেল মারা গিয়েছিল কবি মাদ্রাজ ছাড়ার তিন মাসের মধ্যে। কিন্তু বার্থা ততদিনে তেরো বছরের কিশোরী হতে চলেছে। ফিবি এগারো বছরের বালিকা। জর্জের বয়স দশ হতে বাকি এক মাস। কেমন হয়েছে ওরা দেখতে! কী পড়ছে? কোন স্কুলে পড়ে? লেখাপড়ায় কেমন হয়েছে? কেমন করে চলছে ওদের সংসার? নানা প্রশ্নই তাঁর মনকে ব্যাকুল করে থাকবে। পারলে একবার গিয়ে দেখেও আসতেন হয়তো। দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন কিনা, কে জানে? মাদ্রাজে এই জাহাজ ছিল মোট দু দিন। তিনি কি এই দু দিনের মধ্যে একবারও মাদ্রাজ শহরে গিয়ে স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো দেখে আসেননি? অথবা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেননি? রিচার্ড নেইলর তখন ডভটন কলেজের শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ হয়নি? প্রমাণের অভাবে আজ আর নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সুখের বিলেত যাত্রার পথে তাঁর মন যে বারবার ব্যাকুল এবং ব্যথায় বিদীর্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতায় যাঁদের তিনি ফেলে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যেও তাঁর ব্যাকুলতা কিছু কম ছিল না।

মাদ্রাজ ছেড়ে *ক্যান্ডিয়া* যত এগিয়ে যেতে থাকে আরব সাগরের দিকে, তাঁর মন অবশ্য ততই ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে উচ্ছ্বসিত হতে আরম্ভ করে। প্রায় চার সপ্তাহ লেগে গেল জাহাজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে। জাহাজ গিয়ে প্রথমে নোঙ্গর করল এডেনে। তারপর লোহিত সাগর ধরে আরও এগিয়ে গিয়ে ছোট্টো সুয়েজ বন্দরে।[২] সেখানে জাহাজ বদল করার পালা। এর তিন বছর আগে সুয়েজ খাল তৈরির কাজ শুরু হয়। কিন্তু সে কাজ শেষ হয় আরও সাত বছর পরে। সুয়েজ খালের উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৮৬৯ সালে। সায়েদ বন্দরে যাত্রীদের উঠতে হয় অন্য একটি জাহাজে—*সিলোন-এ।* ৬ জুলাই রোববার এই জাহাজ ভিড়ল গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাত্রীরা ঘুরে এলেন দু হাজার বছরেরও পুরোনো এই শহর। চার দিন পরে ৯ জুলাই রাতের বেলায় তাঁরা পৌঁছে গেলেন মল্টায়। তার উত্তর দিকে মাত্র কয়েক শো মাইল দূরে গ্রীস। এ দেশের সভ্যতার বিস্তারিত ইতিহাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তেমন পরিচয় সহযাত্রীদের মধ্যে সম্ভবত কারও ছিল না। মনে মনে যে-হোমারের জগতে নিরন্তর ঘুরে বেড়াতেন তিনি, সেখান থেকে তিনি আর এখন বেশি দূরে নন। তাঁর প্রথম যৌবনের নায়ক লর্ড বায়রন যেখানে মারা যান, তা-ও বেশ কাছে। অনুমান করি, তিনি সেই জগতের কথা ভেবে কখনও অতীতমুখো হয়েছেন, কখনও বা দিন দশেক পরে তিনি লন্ডনের রাজপথে ঘুরে বেড়াবেন—সেই কথা ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। বর্তমান থেকে, অদূর অতীত থেকে মাইকেলের মন বার বার সরে গেছে অনেক দূরে। ধূসর হয়ে গেছে রেবেকা-হেনরিয়েটার জগৎ। বিলীন হয়ে গেছে প্রাত্যহিকতার ক্ষুদ্রতার সীমানা। তাঁর এই সময়কার মনের অবস্থা কেমন ছিল তার সামান্য আভাস পাওয়া যায় গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠি থেকে। কলকাতা থেকে রওয়ানা হবার ঠিক এক মাস দুদিন পরে আফ্রিকার উপকূলের ধার দিয়ে যখন জাহাজ চলছিল—তখন লিখেছিলেন এ চিঠি।

'*সিলোন* জাহাজ থেকে তোমাকে কয়েকটা লাইন লেখার জন্যে বসেছি। কি বলবো ভাই, এ জাহাজটাকে মনে হচ্ছে পরীর দেশের একটি ছোটোখাটো ভাসমান প্রাসাদের মতো। এই জাহাজের প্রতিটি জিনিস যে কী জাঁকজমকপূর্ণ সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এই জাহাজে যে-স্যালুনগুলো আছে তা প্রাসাদের মতো, আর কেবিনগুলো রীতিমতো রাজসিক।[৩] তবে এসব বিবরণ আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানাতে পারবো ইংল্যান্ডে গিয়ে তোমাকে লেখার সময় পেলে। এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি বিখ্যাত ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে। আমাদের জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে উত্তর আফ্রিকার পাহাড়ী উপকূল। ...মাত্র ৩২ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম। কী দ্রুত ভ্রমণ করছি, তাই না? ...আমি হলপ করে বলতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি প্রতি মুহূর্তে সেই দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যার কথা আমি অত ভেবেছি আমার ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু সত্য কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত!'

নিচে দেখতে পাব এ চিঠির মধ্যে মাইকেলের মনের দুটো অসাধারণ দিক সহজেই ধরা পড়ে। তিনি এরই মধ্যে নিজের স্বরূপ নিয়ে সংকটে পড়েছিলেন। স্বদেশের ভিড়ে চিরদিন নিজেকে তিনি অন্য এক জগতের, সমাজের অন্য এক স্তরের মানুষ বলে বিবেচনা করে এসেছেন। কিন্তু এখন শ্বেতাঙ্গদের ভিড়ে তিনি এই প্রথম বারের মতো স্বদেশ এবং স্বদেশের মানুষদের সম্পর্কে একটু যেন বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলেন। জাহাজ-ভর্তি ভিনদেশীদের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারলেন না। সাড়ে ছ বছর আগে মাদ্রাজ থেকে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে যান, তখন জাহাজের ভারতবর্ষ-মুখী বিদেশি যাত্রীরা ইংরেজ-বনে-যাওয়া মাইকেলকে নাম দিয়েছিলেন মিস্টার হোল্ট, সেটাকে মাইকেল নিতান্ত ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এবারে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশ-অভিমুখী বিদেশিদের ভিন্ন চেহারা দেখতে পেলেন তিনি।

'আহা, এই জাহাজে যদি আমাদের দেশের আধ-ডজন লোকও থাকত! তা হলে তাঁদের নিয়ে আমাদের নিজেদের একটা দল তৈরি করতাম।'

দেশের মাটি এবং মানুষের কথা তাঁর মনে পড়তে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাইকেল স্বভাবের দিক দিয়ে সরল হলেও, সাধারণ মানুষের মত অতি-সরল অথবা একমাত্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না। মস্ত বড় সৃজনশীল একজন শিল্পীর জন্যে যা স্বাভাবিক—তিনি এমন একটি জটিল মনের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁকে অসুখী করতে বাধ্য। প্রাচ্যে জন্মেও তাঁর মনন এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং মূল্যবোধে। আবার তিনি যখন পাশ্চাত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করতে গেছেন, তখন প্রাচ্যের প্রতি তাঁর সহজাত দরদ, তাঁকে কিছুতেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে দেয়নি। এই দুয়ের সমন্বয় তিনি কোনও দিন করতে পারেননি। যেমন লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যে কোনও একজনকে পুরোপুরি বর্জন করে অন্য একজনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি অসুখী হবার মতো মানসিকতা নিয়েই প্রথম যৌবন থেকে বড় হয়েছিলেন। কলকাতায় থাকতে যে-হরির হয়তো খোঁজ নেননি, সেই হরিকে স্মরণ করেই এখন তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'আমাদের হরি[৪] কোথায় জানো? জানলে তার কাছে আমার কথা মনে করিয়ে দিয়ো। আজ সাগরটা যে কী শান্ত, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, একেবারে আমাদের নিজেদের হুগলি নদীর মত। এখানকার আবহাওয়া হল অনেকটা আমাদের দেশে অঘ্রান মাসের শুরুতে যেমনটা থাকে, খুব ঠাণ্ডা নয়, আবার খুব গরমও নয়।'

বোঝা যায়, ইতিমধ্যে তিনি নিজেকে প্রবাসী

বলে বিবেচনা করছেন। সেই সঙ্গে স্বদেশকে মনে পড়ছে বার বার। সবকিছুকে আজ তুলনা করে দেখতে চাইছেন দেশে যেমনটা দেখেছেন, তার সঙ্গে।

নিজের লক্ষ্যের কথাও তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ে—যে-কাজে এসেছেন, সফলভাবে তা শেষ করা চাই। তিনি তো আর কবি হতে চান না! ভালো করে আইন শিখে দেশে ফিরে গিয়ে অনেক উপার্জন করবেন। বড়লোক না-হলে সমাজে তাঁর কোনও মর্যাদা থাকে না। এবারে কেবল "অর্থ"হীন কবিখ্যাতি অর্জন করে তিনি সুখী হতে চান না, তিনি অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে সমাজের ওপরতলায় আসন নিতে চান। জীবনটাকে উপভোগ করতে চান নানাভাবে, নানা উপকরণ দিয়ে। পরবর্তী দু বছরে লেখা একাধিক চিঠিতে বাঙালিদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারও নেই—এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথা ভেবে উদ্দীপ্ত বোধ করেছেন যে, তিনি ব্যারিস্টার হতে পারলে প্রচুর সম্মান পাবেন আর সেই সঙ্গে করতে পারবেন একচেটিয়া ব্যবসা। নতুন প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টও ব্যবসার বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। কলকাতা ত্যাগ করার আগে তিনি জেনে এসেছিলেন সদর দেওয়ানি আদালত আর সুপ্রিম কোর্ট থাকছে না, তার বদলে পয়লা জুলাই থেকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবে

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাই কোর্ট। সেই হাই কোর্টের উদ্বোধন হবার কথা পয়লা জুলাই।' পয়লা জুলাই তিনি যখন আরব সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কি মনে মনে ভাবেননি সেই হাইকোর্টের কথা? সেই জন্যেই, লক্ষ্যের কথা সদা জাগরূক তাঁর হৃদয়ে:

'আমার আশঙ্কা হয় (ইংল্যান্ডে যাবার পর) বন্ধুদের দেবার জন্যে আমার তেমন সময় হবে না, কারণ আমি আমার পেশা ভালো করে শিখতে চাই, আর চাই সম্মান অর্জন করতে।' বিদেশ থেকে লেখা অনেক চিঠিতেই তাঁর এ ধরনের স্বাদেশিকতা এবং নিজের সংকল্প সম্পর্কিত মনোভাব দেখা যাবে।

১৪ জুলাই *সিলোন* জাহাজ গিয়ে পৌঁছয় জিব্রল্টারে এবং সেদিনই আবার যাত্রা শুরু করে। ১৯ জুলাই শনিবারের *লয়েড'স লিস্ট* অনুযায়ী এই জাহাজ সাউথ্যাম্পটনে পৌঁছায় সেদিনই, সম্ভবত ১৮ই জুলাই-এর শেষরাতে। ধারণা করি, দুপুরের দিকে তিনি গিয়ে পৌঁছে যান তাঁর স্বপ্নে-দেখা লন্ডন নগরীতে। এখানে তিনি মনোমোহন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। লন্ডন দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এ প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। যদিও অনেক বড় বড় বাড়িঘরের স্থাপত্য দেখে তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ তিনি কলকাতাতেই দেখেছেন। পরবর্তী চার সপ্তাহ তিনি মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাল করে লন্ডন ঘুরে দেখেছেন এবং পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন ভর্তি হবার।

মাইকেল ইংল্যান্ডে এসেছিলেন যে-লক্ষ্য নিয়ে তিনি তা কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন, তা বোঝা যায়, কত দ্রুত তিনি আইন পড়ার জন্যে ভর্তি হলেন, তা থেকে। পরবর্তী টার্ম শুরু হবার কথা নভেম্বর মাসে।

গ্রেজ ইন-এ ভর্তির রেজিস্টারে মাইকেলের ভর্তি-পত্র

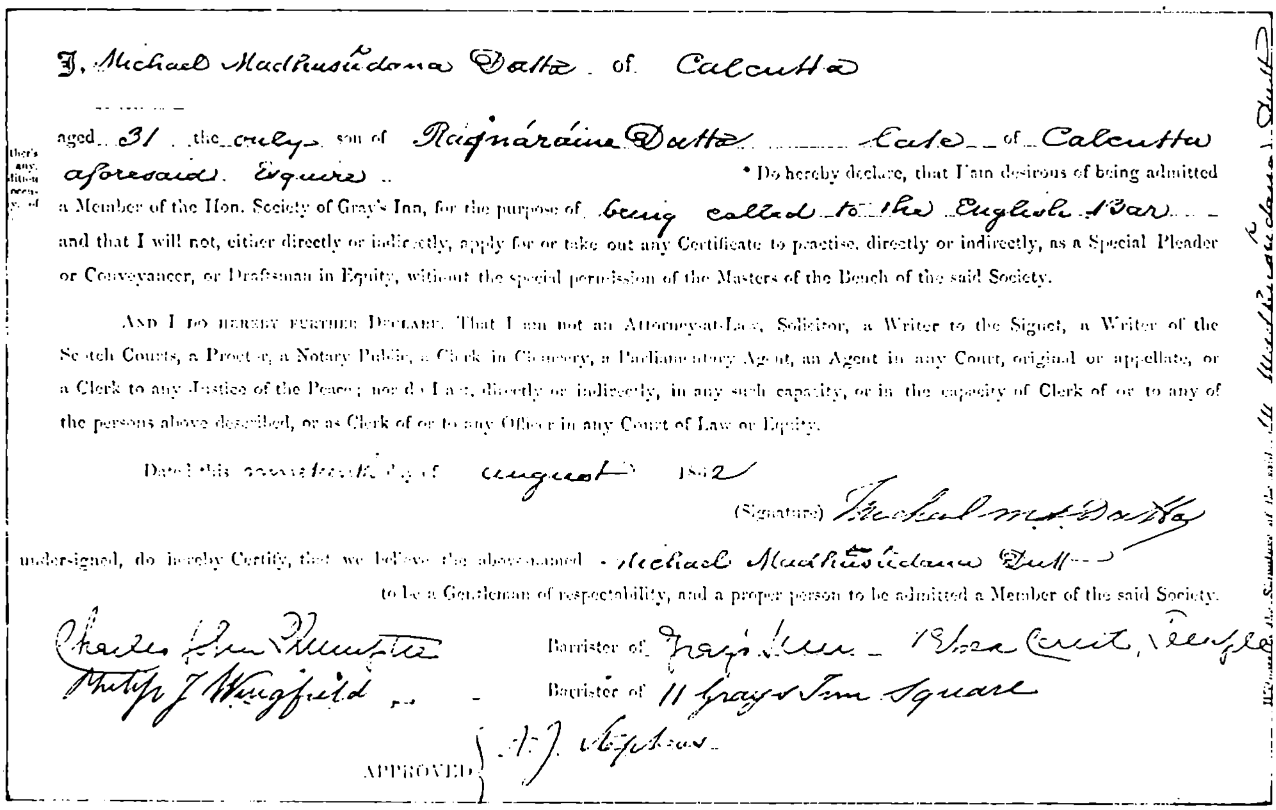

I, Michael Madhusudana Datta of Calcutta

aged 31 the only son of Rajnaraine Datta late of Calcutta aforesaid Esquire * Do hereby declare, that I am desirous of being admitted a Member of the Hon. Society of Gray's Inn, for the purpose of being called to the English Bar and that I will not, either directly or indirectly, apply for or take out any Certificate to practise, directly or indirectly, as a Special Pleader or Conveyancer, or Draftsman in Equity, without the special permission of the Masters of the Bench of the said Society.

And I do hereby further Declare, That I am not an Attorney-at-Law, Solicitor, a Writer to the Signet, a Writer of the Scotch Courts, a Proctor, a Notary Public, a Clerk in Chancery, a Parliamentary Agent, an Agent in any Court, original or appellate, or a Clerk to any Justice of the Peace; nor do I act, directly or indirectly, in any such capacity, or in the capacity of Clerk of or to any of the persons above described, or as Clerk of or to any Officer in any Court of Law or Equity.

Dated this seventeenth day of August 1862

(Signature) Michael M S Dutta

undersigned, do hereby Certify, that we believe the abovenamed Michael Madhusudana Dutt to be a Gentleman of respectability, and a proper person to be admitted a Member of the said Society.

Charles [illegible] Barrister of Gray's Inn – 1 Brick Court, Temple

Philip J Wingfield Barrister of 11 Gray's Inn Square

APPROVED [illegible]

মনোমোহন ঘোষ

কিন্তু তিনি তত দিন দেরি করতে পারলেন না। উনিশে অগস্ট তিনি ভর্তি হন গ্রেজ ইনে—এর আগে ইনার টেম্পলে যান বলে মনে হয়। ইনার টেম্পলে লেখাপড়া শিখবেন বলেই তিনি ঠিক করে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এখানে ভর্তি হননি। তখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ছিল চারটি প্রতিষ্ঠান—লিঙ্কন'স ইন, ইনার টেম্পল, গ্রেজ ইন আর মিডল টেম্পল। এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলা হয় ইনস অব কোর্ট। সবগুলোই তিন শো বছরেরও বেশি পুরনো এবং বনেদি। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল লিঙ্কন'স ইন। সেখানে ছিলেন ৬২ জন বেঞ্চার বা শিক্ষক। ইনার টেম্পলে বেঞ্চার ছিলেন ৪৬ জন। মিডল টেম্পলে ৩৯ জন। সে তুলনায় সবচেয়ে ছোটো ছিল গ্রেজ ইন—বেঞ্চারের সংখ্যা মাত্র ১৯। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জর্জ লং। অন্য বেঞ্চারদের নাম হলো: রবার্ট গ্রীন ব্রেডলি, জন টীড, টমাস গ্রীনউড, স্যামুয়েল টার্নার, টমাস গ্রীন, স্যর জে. রমিলি, টমাস চ্যান্ডেলস, টমাস মার্শাল, উইলিয়াম ওয়াইল্ড, জেমস ব্যার্স্ট, উইলিয়াম হেনরি ডডকিন্স, জন হাডলস্টন, রবার্ট লাশ, হেনরি ম্যানিস্টি, আর্চিবল্ড স্টিফেনস, উইলিয়াম হিন্ডমার্চ, টমাস সাউথগেট আর জন লী। লন্ডনে পৌঁছনোর ঠিক এক মাস পরে তিনি এই ইনেই ভর্তি হন। তাঁর ভর্তি অনুমোদন করেন আর্চিবল্ড স্টিফেনস। ভর্তির সময়ে তাঁর জামিন থাকেন টেম্পলের অধিবাসী চার্লস জন প্রামট্রী আর ১১ নম্বর গ্রেজ ইন স্কোয়ারের বাসিন্দা ফিলিপ জে, উইংফীল্ড। দুজনেই ব্যারিস্টার।

তাঁর স্বরূপের সঙ্কটের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গ্রেজ ইনের রেজিস্টারে তিনি যেভাবে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন, তা থেকেও এই সঙ্কটের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। গ্রেজ ইনের ভর্তির রেজিস্টার থেকে দেখা যায়, তিনি এখানে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন—Michael Madhusudana Datta। পিতৃ-পরিচয় দিয়ে লিখেছেন only son of Rajnaraina Datta. (বয়স লিখিয়েছিলেন ৩১।) যে-মাইকেল নিজের নাম অনেক আগেই পুরোপুরি ইংরেজি ধরনে লিখতে আরম্ভ করেন, তিনি হঠাৎ কোন প্রেরণায় একেবারে সংস্কৃত-ঘেঁষা বানানে তাঁর নিজের নাম লিখলেন দেশ থেকে ছ হাজার মাইল দূরে এসে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। চিরকাল তিনি মনে মনে ইংল্যান্ডে বিচরণ করেছেন, স্বদেশের অনেক কিছুকেই সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু আজ স্বদেশ থেকে এত দূরে এসে স্বদেশকে ভোলার সুযোগ পেয়েও ভুলতে পারলেন না, বরং তাকেই চাইলেন আঁকড়ে ধরতে নিজের পরিচয়ের খুটো হিসেবে। এর সঙ্গে প্রতি তুলনা করা যেতে পারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামের বানান। মাইকেলের ঠিক দু বছর এগারো মাস আগে ১৮৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর—জ্ঞানেন্দ্রমোহন যখন লিংকন'স ইনে ভর্তি হন, তখন তিনি তাঁর নিজের বানান লিখেছিলেন যতোটা ইংরেজি ধরনের করে লেখা যায়, তেমন করে—Ganneundro Mohun Tagore পিতার নামও লিখেছিলেন ইংরেজি রীতিতে—Prosonno Kumar Tagore।

ইনার টেম্পলে ভর্তি না-হয়ে তিনি কেন যে গ্রেজ ইনে ভর্তি হলেন, তা জানার উপায় নেই। হঠাৎ তাঁর মন পরিবর্তনের কারণও অজ্ঞাত। তিনি যখন লন্ডনে পৌঁছন, তত দিনে কি ইনার টেম্পলে সব আসন পূরণ হয়ে গিয়েছিল? (অসম্ভব না-হলেও এটাকে আমার খুব বিশ্বাসযোগ্য কারণ বলে মনে হয় না। কারণ পরের টার্ম শুরু হতে তখনও সাড়ে তিন মাস বাকি।) দূর থেকে ভাল করে না-জেনে তিনি মনে মনে ইনার টেম্পলকে নির্বাচন করেছিলেন। লন্ডনে পৌঁছবার পর মনোমোহন অথবা অন্যেরা কি তাঁকে ভিন্ন রকমের পরামর্শ দিয়েছিলেন? অসম্ভব নয়। আর-একটা সম্ভাব্য কারণ—গ্রেজ ইন সবচেয়ে ছোটো প্রতিষ্ঠান বলে সেখানে বেতন হয়তো সবচেয়ে কম ছিল। অথবা এমনও হতে পারে, সেখান থেকে ব্যারিস্টার হওয়াও তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। (অবশ্য এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে, গর্বিত মাইকেল সবচেয়ে কম বেতনের ইনে পড়বেন। এটা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।) তবে কারণ যা-ই হোক, মাইকেল গ্রেজ ইনেই ভর্তি হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাইকেল কলকাতায় ফিরে গিয়ে যখন ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ শুরু করেন, তখন কলকাতা হাইকোর্টে ৪০ জনের বেশি ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু গ্রেজ ইন থেকে পাস করা একজন ব্যারিস্টারও ছিলেন না। মাইকেলের আগে যে-দুজন বাঙালি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আর মনোমোহন ঘোষ—তাঁরা দুজনেই ব্যারিস্টার হয়েছিলেন লিঙ্কন'স ইন থেকে।

কয়েক সপ্তাহ তিনি মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছিলেন বলে তাঁর চিঠি থেকে আভাস পাওয়া যায়। খুব সম্ভব গ্রেজ ইনে ভর্তি হবার পর তিনি অন্যত্র বাসা ভাড়া করেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহনও তখন অন্য জায়গায় চলে যান। কবির ভর্তির আবেদনপত্রে তাঁর ঠিকানা দেওয়া আছে ৫৪ বার্নার্ড স্ট্রিট। এই বাড়িটি হলো রাসেল স্কোয়ার এবং গ্রেজ ইন উভয়েরই কাছে। এই ঠিকানায় মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথ থাকতেন, না তিনি তাঁদের কাছ থেকে এসে এখানে বাস করেন, তার হদিস করতে পারিনি। ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কবি মনোমোহনকে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে মনে হয়, কদিন আগেই তিনি এঁদের সঙ্গে একত্রে বাস করছিলেন।

'(ওখান থেকে) চলে আসার পর আমার খুবই বিষণ্ণ এবং নিরুৎসাহ মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এ অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে। বিশেষ করে তোমরা যখন শিগগিরই শহরের বাইরে যাচ্ছ। বলা বাহুল্য, তোমাদের দুজনের জন্যে আমার মন খুব খারাপ। সারাক্ষণ তোমাদের কথা মনে পড়ছে। ...আমার সত্যি সত্যি খুব একঘেয়ে এবং বিষণ্ণ লাগছে। তোমাদের কাছাকাছি কোনো সস্তা এবং ছোট বাসা পাওয়া যায় কি না, আমাকে দয়া করে জানিয়ো। তোমরা এখন যেখানে গেছ, তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছ জেনে আমার ভাল লাগছে।'

মাইকেল রাজকীয় ব্যাপারে, জাঁকজমকপূর্ণ বিষয়ে খুব উৎসাহ বোধ করতেন। সাহিত্য এবং ইতিহাসে তিনি রাজাদের যে-কাহিনী এবং লন্ডন মহানগরীর যে-বর্ণনা পড়েছিলেন, তা তিনি যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন নিজের চোখ দিয়ে। সে জন্যে, বিষণ্ণ মন নিয়ে ঘরে বসে থাকতে চাননি, বরং লন্ডন এবং তার ধারে-কাছে যে-জায়গাগুলো ছিল, তা তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে চেয়েছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর, যেমন, তিনি যে-বাড়িতে থাকতেন তার অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে ট্রেনে করে বের হলেন দক্ষিণ লন্ডন ভাল করে ঘুরে দেখার জন্যে। প্রথমে তাঁরা যান বিখ্যাত কিউ (বোটানিক্যাল) গার্ডেনে। ভারতবর্ষ থেকে আনা গাছপালাও তিনি সেখানে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর রিচমন্ডে। কিন্তু যা তাঁকে তাক লাগিয়ে দেয় তা হল হ্যাম্পটন কোর্ট—সাড়ে তিন শো বছর ধরে যা ছিল ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ।

'আমি যে কী আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি, তা তোমাদের বর্ণনা করতে পারব না। কী দুঃখের বিষয় যে, তোমরা লন্ডনের বাইরে যাও না অথবা এসব আশ্চর্যজনক জায়গাগুলো দেখ না। এই সব জায়গা সম্পর্কে আমরা আমাদের তরুণ বয়সে যেসব শুকনো ঐতিহাসিক তথ্যাদি পড়েছি, এখন দেখার পর সেই তথ্যাদির সঙ্গে একটা রোম্যান্টিক বাস্তবতা মিশে যায়। আমি তো এরই মধ্যে হ্যাম্পটন কোর্টের বেশ প্রেমে পড়ে গেছি। এ দেশের কঠোর আবহাওয়ায় যতটা প্রাচ্য হতে পারে, হ্যাম্পটন কোর্টকে আমার তাই মনে হল। এই প্রাসাদের অনেকগুলো ভাগ আছে, যাকে বলা যায় : মহল ; আর প্রত্যেক ভাগেরই আছে নিজস্ব উঠোন। প্রাসাদের ভেতরে যেসব চিত্র আছে আর এর কারুকার্য-করা সিলিংগুলো চমৎকার।'

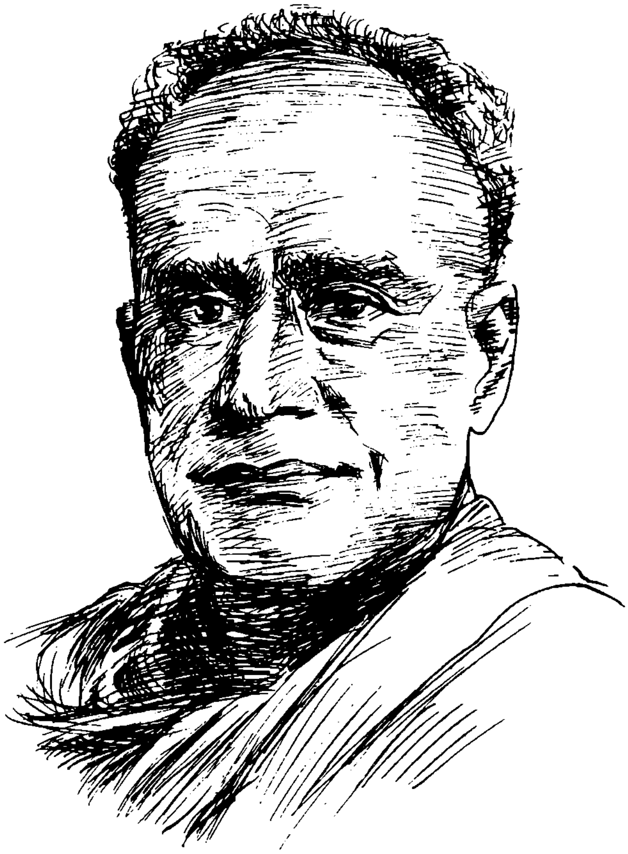

বিদ্যাসাগর

কিন্তু যত সুন্দর হোক লন্ডনের চারদিক, যত দেখার মতো জায়গাই থাক, তাঁর মূল লক্ষ্যের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথকেও তিনি সে কথা মনে করিয়ে দিতে চান। ১৪ নভেম্বর তিনি আবার মনোমোহনকে লেখেন :

'কাজ চালিয়ে যাও ভাইয়েরা। যত পারো সম্মান অর্জন কর। আমরা এটা করার জন্যেই এসেছি। মনে রেখো সমস্ত দেশ T...সম্পর্কে নীরব, কিন্তু আমি বলতে পারি যে, আমাদের তিন জনের কথা নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা অনেক সময়েই আলোচনা করেন।'

এই T কে নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। তবে খুব সম্ভব জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। মাইকেল যে-দিন কলকাতা ত্যাগ করেন, তার দুদিন পরেই—এগারোই জুন তারিখে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিস্টার হন। তবে তিনি দেশের সঙ্গে তাঁর শিকড়ের বন্ধন কেটে ফেলেছিলেন। তা ছাড়া, বিলেতে তিনি ব্যারিস্টার হবার জন্যেও আসেননি। তিনি বিলেতেই বাস করছিলেন। এক সময়ে তিনি ব্যারিস্টার হবার জন্যে ভর্তি হন লিঙ্কনস ইনে। মাইকেল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতো খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু দু জনের মধ্যে ছিল অনেক পার্থক্য। জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর শিকড় উপড়ে ফেলে একেবারে ইংরেজ বনে গিয়েছিলেন। আর মাইকেল সাহেব হয়েও বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি সমাজের সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সে জন্যে, তিনি যখন ব্যারিস্টার হবার লক্ষ্য নিয়ে বিলেতে যাত্রা করেন, তখন

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদিত দলিলের প্রতিলিপি

ডৌল বন্দবস্ত রূপেয়া জেলা জসহারের অন্তপাতি সুন্দরবনের ২২০ নম্বর লাটের মধ্যেগত চকমুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা তালুকদার ও গাঁতিদার শ্রীমাইকেল মধুশুদন দত্ত মফস্বল তালুকদার ও দরগাঁতিদার শ্রীমক্ষ্যদা দেবী জওজে শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায় সাকিন পাইকপাড়া— পরহণে হোগলা থানা নওয়াবাদ হালসামিক বাহিরশীমলা—সহর কলিকাতা— ইতি—

আসামী জুমনা
ইং সন ১৮৬৮ সাল বাং সন ১২৭৪ সাল শালীয়ানা মুদ্দত ৭ বৎসর কোম্পানি ২৯৯৭ ৷৷
ইং সন ১৮৭৫ সাল সর্ব্বকার জন্য
কোম্পানি ৩৫০১

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধ জন্য আপনার স্বামি অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমার মকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চক তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদুজ্জাই তাঁহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চকমুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১৮৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও তাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেল এবং তাহার শালিয়ানা জমা ইং ১৮৬৮ বাং

১২৭৪ সাল মুর্দ্দত ৭ বৎসর মং ২৯৯৭ ৷৷ উনত্রিশ শত সাড়ে সাতানব্বই টাকা ও ইং ১৮৭৫ সাল সর্ব্বদার জন্য মঃ ৩৫০১ পৌত্রিশ শত এক টকায় অবধারিত হইল আপনি উক্ত উভয় চকের হাসিল পতিত রাইয়তি খামারদীগর আবাদীয়াতে ও জলকর ও বনকর ও ফলকর ইত্যাদি দরোবস্তি হকুকে দখলিকার হইয়া মালগুজারির টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিবতী-বন্দী মোতাবেক সন বসন মাহ বমাহ কিস্তী বকিস্তী সরবরাহ পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রয় অধিকারিণী হইয়া ভোগ দখল করিবেন কিস্তী খেলাপ করিলে শতকরা মাসীকে ১ এক টাকা হিসাবে শুদ দিতে হইবেক...যে পর্য্যন্ত আমি অন্য কোন নিয়ম না করিব সে পর্য্যন্ত আমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে আপনি ও আপনার ওয়ারিশান সন সন মঃ ৩০০ তিন শত টাকা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ও তাঁহাদের ওয়ারিশানকে দীবার তাহাদের নিকট রশীদ লইবেন ঐ রশীদ ও কালেকট্টরির দাখিলা আমার নিকট দাখিল করিলে ঐ টাকার দাখিলা পাইবেন... ইতি সন ১৮৬৮ আটসট্টি সাল— তারিখ ৯ই আশ্বিন—

কাত কিস্তী বন্দী
ইং ১৮৬৮ সাল না ৭৪ সাল
মুদ্দত ৭ সাল বৎসর

মাহ পৌষ—৩৭৪ ৷৷/	৪৩৭ ৷৷/
মাহ মাঘ—৭৪৯ ৲ /	৮৭৫ ৲ /
মাহ ফাল্গুন—১১২৪ /	১৩১২ ৲ /
মাহ চৈত্র—৭৪৯ ৲ /	৮৭৫ ৲ /
২৯৯৭ ৷৷	৩৫০১

কলকাতার শিক্ষিত সমাজ তাঁকে নিয়ে নিশ্চিতভাবে অনেক প্রত্যাশা করেছে। তেমনি আই সি এস হবার বড় লক্ষ্য নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন যখন বাঙালিদের মধ্যে সবার আগে বিলেতে আসেন, তখনও তাঁদের দিকে দেশবাসী প্রত্যাশার সঙ্গে তাকিয়েছেন। কবি সেই প্রত্যাশার কথাই তাঁর তরুণ বন্ধুদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। চৌঠা জানুয়ারি তিনি আবার লেখেন :

'গত দুদিন লন্ডন ভয়ানক কুয়াশায় ঢাকা ছিল। এ যে কী বর্বরোচিত দেশ! ....তুমি এবং আমাদের খুদে ইন্দ্র (সত্যেন্দ্রনাথ) ভালো করছ জেনে আমি খুশ হয়েছি। মনে রেখো, ভাইয়েরা, আমাদের গোটা জাতির নজর রয়েছে তোমাদের ওপর।'

নিজের কথাও ভোলেননি। এবং মনে হয়, এ সময়ে তিনি রীতিমতো কঠোর পরিশ্রম করছিলেন তাঁর লেখাপড়া নিয়ে।

'তোমার শ্রদ্ধাভাজন পিতার কাছে আমার ভক্তি জানিয়ো। তাঁকে বোলো যে, আমি যদি দেশে ফিরে যাবার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তা হলে তিনি যাঁকে এক কালে স্নেহ করতেন এবং নিজের ছোট ভাই-এর মতো গণ্য করতেন, আমার সেই বাবার সম্মান যাতে নষ্ট না-হয় তার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

'আপাতত বিদায়। তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও, তা হলে আমি তোমাদের শেকসপীয়র পাঠে সাহায্য করব—তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটকগুলো সম্পর্কে তোমাদের মাঝেমধ্যে প্রশ্ন পাঠিয়ে। তোমরা কোন কোন নাটক পড়ছ আমাকে জানিয়ো।'

প্রথম যৌবনে তিনি যখন বিলেত যাবার জন্যে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন সামনে ব্যারিস্টার হবার কোনও স্বপ্ন ছিল না। তখন একমাত্র স্বপ্ন ছিল কবি হবার। বিলেতে আসবেন, তাঁর প্রিয় কবিদের দেখবেন, সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় হবে এবং অনুকূল পরিবেশে কাব্য প্রকাশ করে ইংরেজি সাহিত্যের আসরে খ্যাতি লাভ করবেন—এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু ১৮৬২ সালে শেষ পর্যন্ত তিনি যখন বিলেত যান, তখন তিনি যে আদৌ সাহিত্যের দিকে নজর দিয়েছেন, সমসাময়িক তৃতীয় প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবিদের রচনা পড়ে তার প্রশংসা করেছেন—তাঁর কোনও চিঠিপত্র থেকে তার আভাস পাওয়া যায় না। অথবা তিনি পরবর্তীতে সামান্য হলেও যে-টুকু কাব্যচর্চা করেছেন, তা থেকেও তার কোনও পরোক্ষ প্রমাণ মেলে না। আমরা পরে দেখতে পাব, সে সময়কার ইংরেজি অথবা ফরাসি কাব্যসাহিত্যের যে-ধারা আধুনিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হননি। তিনি প্রথমবারে যতদিন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে লন্ডনে ছিলেন, তত দিন তিনি সাহিত্য চর্চা নয়, কেবল আইন অধ্যয়নের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অপরিচিত এবং বন্ধুহীন পরিবেশে স্বদেশ এবং স্বজন তাঁর হৃদয়কে বিশেষ করে অধিকার করে রাখে। স্বদেশে যখন ছিলেন, তখন ভিড় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রযত্ন করতেন। তিনি যে চারদিকের লোকজনের তুলনায় আলাদা এবং অনেক বড়, সে ব্যাপারে সব সময়ে সচেতন থাকতেন। কিন্তু অনেক দূরে এসে এখন সেই স্বদেশ এবং স্বসমাজকে ভাল করে দেখতে পেলেন। এই স্বদেশ এবং

হ্যাম্পটন কোর্ট

সমাজকে তিনি কত ভালোবাসেন, তাও অনুভব করেন। এই পরিস্থিতিতে কোন্ জগতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করবেন, তা নিয়ে সত্যি সত্যি সংকটে পড়লেন তিনি। চেষ্টা করেও এখন ভিন দেশ এবং ভিন সমাজের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেন না। আমার ধারণা, তাঁর স্বপ্নের ইংল্যান্ড এবং যে-ইংল্যান্ডকে তিনি দেখতে পেলেন, তার মধ্যে তেমন সাদৃশ্যও খুঁজে পাননি। (না-দেখা ইয়ারো, সব সময়েই দেখা-ইয়ারোর চেয়ে সুন্দর!) সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে-বড় ইংরেজকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লন্ডনের ভিড়ে তাকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেন। মাদ্রাজ এবং কলকাতায় তিনি ইংরেজদের বর্ণবাদ দেখেননি, তা নয়। যদিও সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের বর্ণবাদ তাঁকে হয়তো অত পীড়া দেয়নি। কিন্তু কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠার পরেই তিনি ভিন্ন রকমের পরিবেশ লক্ষ করে ব্যথিত হয়েছিলেন। সে জন্যে দ্রুত এবং কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। নিজের পরিবার ফেলে এসেছিলেন সে-ও অবশ্য একটা পিছু-টান হিসেবে কাজ করেছে। এ কারণে, তিনি বারবার নিজের লক্ষ্যের কথা স্মরণ করেছেন এবং মনোমোহন আর সত্যেন্দ্রনাথকেও তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এভাবেই সব কিছু চলত সম্ভবত। কিন্তু হঠাৎ বাধা এল একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে। যাঁর কাছে নিজের তালুক পত্তনি দিয়ে এসেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে-টাকা পাবেন বলে আশা করেছিলেন, বছরের শেষ দিকে (১৮৬২) অথবা পরের বছরের প্রথম দিকে তা পেলেন না। তিনি মহাদেবের কাছে ১৮৬১ সাল বাবদ প্রায় ৫০০ টাকা পেতেন। তা ছাড়া, ১৮৬২-৬৩ সাল বাবদে মহাদেবের যে-তিন হাজার টাকা দেবার কথা ছিল, তারও প্রথম কিস্তি ডিসেম্বর মাসে (১৮৬২) পাওনা হয়েছিল। তার পরের মাসেও কলকাতা থেকে টাকা এল না। মোট কথা, কোনও রকমের হুঁশিয়ারি ছাড়াই মহাদেব তাঁকে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। অথচ চুক্তি অনুযায়ী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন আর চৈত্র (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) মাসে মোট প্রায় তিন হাজার টাকা (২৯৯৭ টাকা আট আনা) কিছু লন্ডনে মাইকেলকে এবং কিছু কলকাতায় হেনরিয়েটাকে দেবার কথা। যথাসময়ে টাকা না-পাওয়ার ঘটনাকে প্রথমে কবি ডাকের গোলযোগ অথবা সাময়িক কোনও বিপত্তি বলে বিবেচনা করে থাকবেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনি হেনরিয়েটার চিঠি পান। তা থেকে জানতে পান, কলকাতায় হেনরিয়েটাও নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন না মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তদুপরি তিনি আরও জানতে পেলেন যে, তাঁর জ্ঞাতিভাইয়েরা হেনরিয়েটাকে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করছেন।

লন্ডনের ছোট একটি ঘরে বসে লেখাপড়া করার যে-প্রাত্যহিক নিয়ম তিনি করে নিয়েছিলেন, হেনরিয়েটার চিঠি পেয়ে তাতে ছেদ পড়ল। সম্পূর্ণ বন্ধুহীন পরিবেশে হেনরিয়েটা এবং তাঁদের দুটি ছোট সন্তান হয়রানির শিকার হচ্ছেন, এ কথা ভেবেও তিনি শিউরে ওঠেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন তিনি। কলকাতা ছাড়ার আগে ব্যবস্থা হয়েছিল মহাদেব হেনরিয়েটাকে মাসে মাসে ১৫০ টাকা দেবেন। এই টাকার একটা অংশ তিনি অগ্রিমও দিয়েছিলেন মে-জুন মাসে (১৮৬২)। যাবার আগে কবি সেই টাকা ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু

তিনি কলকাতা ছাড়ার পর থেকে মহাদেব হেনরিয়েটাকে টাকাপয়সা দেবার ব্যাপারে গড়িমসি আরম্ভ করেন। তবে এর চেয়েও যে-কারণে তিনি বিশেষ করে চটেছিলেন, তা হল: মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে তাঁর জ্ঞাতিভাইয়েরা নানাভাবে হেনরিয়েটাকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেন। কবি হেনরিয়েটাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জ্ঞাতিভাইয়েরা যত দিন না তাঁর মায়ের অলংকার ফিরিয়ে দেন, তত দিন তিনি যেন তাঁদের কোনও রকম আমলে না-আনেন। কিন্তু কবি কলকাতা ত্যাগ করার পর জ্ঞাতিভাইরা অলংকার তো ফিরিয়ে দেনইনি, তদুপরি ২৬/২৭ বছরের একটি নির্বান্ধব মহিলাকে নানাভাবে বিব্রত করার প্রয়াস পান। মাইকেল এটাকে পরে দারুণ তিক্ততার সঙ্গে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর নিজের জ্ঞাতিভাইদের ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কি আশা করেছিলেন, মাইকেল দেশছাড়া এই অবস্থায় তাঁর পরিবারকেও যদি দেশছাড়া করা যায়, তা হলে তাঁরা মাইকেলের সম্পত্তিতে আবার হাত দিতে পারবেন?

এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়, তা নিয়ে মাইকেল এবং হেনরিয়েটা উভয়ে নিঃসন্দেহে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত একটি নিরুপায় নারী এই অবস্থায় যে-সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সেই সিদ্ধান্তই নিলেন। তিনি লন্ডনে স্বামীর কাছে চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। অবশ্য তিনি কবির সম্মতি নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। এ সময়ে বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে তিনি পরামর্শ এবং টাকা আদায়ে সাহায্য পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। জানা যাচ্ছে যে, তিনি বিলেত যাবার ঠিক আগে মহাদেব তাঁকে বেশ কিছু টাকা দেন এবং এর ফলে ১৮৬২ সালের সামান্য টাকাই তখন বাকি থাকে। কবির হিসেব মতো এক হাজার টাকার মতো। ১৮৬৩-৬৪ সালের টাকা তখনও পাওনা হয়নি। সেজন্যে, মনে হয়, প্রথম দিকে তিনি টাকা না-দেবার ব্যাপারে মহাদেব এবং তাঁর জামিনদারদের যতটা দায়ী করেছেন তাঁরা আসলে অতটা দায়ী ছিলেন না। হেনরিয়েটা বিলেত পৌঁছনর তেরো মাস পরে কবি যখন বিদ্যাসাগরকে নিজের দুর্গতি জানিয়ে চিঠি লেখেন, তখন মহাদেব এবং তাঁর জামিনদারদের ষোলো আনা দায়ী করেন। তবে পরবর্তী চিঠিপত্র থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, এ ব্যাপারে তাঁদেরও একটা বক্তব্য ছিল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কয়েকটি চিঠি আদান-প্রদানের পর মহাদেবের প্রতি মাইকেলের ভাষা এবং মেজাজ অনেকটা নরম হয়েছিল।

এই অপবাদ ছিল কবির ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে— সোজা কথায় — নারীঘটিত অপবাদ। হেনরিয়েটার কানে যদি এসব উঠে থাকে, তা হলে তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রী এবং তিন-চারটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও মাইকেল কিভাবে তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, আর যেই ভুলুক, হেনরিয়েটার তা ভোলার কথা নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিলেত যাবার আগে টাকা আদায় করতে পারা সত্ত্বেও, হেনরিয়েটা চলে গেলেন কেন? ভবিষ্যতে যাতে আবার ঝামেলায় পড়তে না-হয়, সেটা নিশ্চয় একটা কারণ। কিন্তু আর-একটা কারণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গৌরদাস এবং বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে মাইকেল বার বার কলকাতায় তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ রটনা করার জন্যে "শত্রুদের" দায়ী করেছেন এবং এতে কান না-দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু অপবাদটা কিসের, তা উল্লেখ করেননি। এক সময়ে অন্তত তাঁর সম্পর্কে এ গুজব প্রচারিত হয়েছিল যে, তিনি ফ্রান্সের কারাগারে আছেন—গৌরদাসকে লেখা মাইকেলের চিঠি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর কোনও কোনও জীবনীকারের রচনা থেকে মনে হয়, এই অপবাদ ছিল কবির ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে—সোজা কথায়—নারীঘটিত অপবাদ। হেনরিয়েটার কানে যদি এসব উঠে থাকে, তা হলে তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রী এবং তিন-চারটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও মাইকেল কিভাবে তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, আর যেই ভুলুক, হেনরিয়েটার তা ভোলার কথা নয়। কিন্তু কারণ যাই হোক, তিনি লন্ডনে স্বামীর কাছে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

ওদিকে, লন্ডনে যখন নিয়মিত টাকা পেতেন, তখনও চিরদিনের বেহিসেবি মনোভাব বর্জন করে মাইকেল ঠিকমতো খরচ চালাতে পারতেন না। সেখানে তিনি যে-অর্থ সংকটে পড়েন, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে তিনি মনোমোহনের কাছ থেকেও ধার করতেন। যেখানে তিনি থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালার কাছে ধার হওয়াও স্বাভাবিক। আসলে লন্ডনে বসে নিজে আড়াই শো টাকা আর কলকাতায় হেনরিয়েটার দেড় শো টাকা করে পাওয়ার যে-ব্যবস্থা মাইকেল করে গিয়েছিলেন তা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। কারণ ব্যয়ের চেয়ে তাঁর আয় ছিল কম। মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর বছরে তিন হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল ঠিকই; কিন্তু মাসে মাসে চার শো টাকা করে ব্যয় হলে বছরে আরও প্রায় দু হাজার টাকার ঘাটতি হবার কথা। আলিপুর আদালতের একটি দলিল থেকে দেখা যায়, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে তিনি সাত হাজার টাকা পেয়েছিলেন। এ ছাড়া, জেমস হেনরি ফ্রেডারিক নামে এক ভদ্রলোকের কাছে তিনি ১৬০০ টাকায় পৈতৃক বাড়ির পেছনের এবং পাশের জমি বিক্রি করেন। মথুরামোহন কুণ্ডু, সাগর দত্ত এবং মধুসূদন মজুমদার নামে তিন ভদ্রলোকের কাছ থেকে যথাক্রমে ১৭০০, ৮০০ এবং ৫০০ টাকা ধার করেন। এ ছাড়া, বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ধার করেন এক হাজার টাকা। এসব টাকা দিয়ে বিলেত যাবার জাহাজের ভাড়া এবং এই ঘাটতি পূরণের কথা ভেবে থাকবেন। কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের কোনও পাকা অথবা স্থায়ী ব্যবস্থা মাইকেল করে যেতে পারেননি বলে মনে হয়। আমার ধারণা, প্রবাসে তাঁর দারুণ ভোগান্তির বীজ তিনি নিজে বপন করে গিয়েছিলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. বৈদ্যনাথ মিত্র এবং অন্য এক পিসতুত ভাইকে তিনি পিতৃ-নির্দেশ অনুযায়ী চকমুনকিয়া এবং সাগরদাঁড়ির বাড়ির অংশও দান করেন বিলেত যাত্রার দু দিন আগে।

২. তখন সুয়েজ বন্দরে বাস করতেন মাত্র তিন হাজার লোক। তারপর ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হবার পর দ্রুত এই বন্দর বড় হতে থাকে।

৩. এই জাহাজটি ছিল প্রায় দু হাজার টনের। কিন্তু তাই বলে মাইকেল যেমন বড় বা রাজসিক বলে দাবি করেছেন, তেমন ছিল না।

৪. হরিদাস। এর কথা মাইকেল ভার্সাই থেকে লেখা একটি চিঠিতেও উল্লেখ করেছেন।

৫. সরকারি হিসেবে পয়লা জুলাই হাইকোর্টের উদ্বোধন হলেও, বিচারপতিরা শপথ গ্রহণ করেন ৯ জুলাই তারিখে। *(ক্রমশ)*

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম আলো

সু নী ল গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

দ্বিতীয় পর্ব

১৬

একটি স্পেশাল ট্রেনে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এসে পৌঁছালেন শিয়ালদা স্টেশনে। সঙ্গে পারিষদ এবং খিদমদগারদের বেশ বড় একটি দল। মহারাজের প্রধান দেহরক্ষী এখন মহিম ঠাকুর, তাকে কর্নেল পদে উন্নীত করা হয়েছে, সে মহারাজের স্নেহভাজন বয়স্যও বটে। আঠাশ বৎসর বয়ীয় এই যুবা মহিম ঠাকুর সুঠাম দেহের অধিকারী, পড়াশুনোও করে যথেষ্ট। মহারাজ তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন।

মহারাজের শরীর এখন প্রায়ই সুস্থ থাকে না, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে হয়। ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদেও অশান্তি লেগেই আছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজ রাজপুরুষদের আধিপত্য ঠেকাবার জন্য চাণক্যসম ধুরন্ধর রাধারমণ ঘোষ বুদ্ধির খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনি মাথা গলান না। মহারাজ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেই তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কুমার সমরেন্দ্র ও কুমার রাধাকিশোরের পক্ষ নিয়ে দুটি দল ভাগ হয়ে যায়। রাধাকিশোর অনেক আগেই যুবরাজের পদ পেয়েছেন, সিংহাসনের ওপর তাঁর পরিপূর্ণ দাবি রয়েছে, কিন্তু মহারাজ ইচ্ছে করলে অন্য কারুকেও মনোনীত করতে পারেন। মহারাজের ব্যবহারে সে রকম একটা কিছু যেন প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে। প্রথমা পত্নী ভানুমতীর স্মৃতি তিনি এখনও ভোলেননি, ভানুমতীর সেই স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা তাঁর মনকে পীড়া দেয়, ভানুমতীর প্রিয় সন্তান সমরেন্দ্রচন্দ্রকে সেই জন্য তিনি কাছাকাছি রাখেন। সমরেন্দ্রচন্দ্রের আশা, পিতা শেষ পর্যন্ত তাকেই সিংহাসনে বসাবেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য দুই পুত্রের দাবি সম্পর্কে নিজে এখনও মৌখিক ভাবে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। কিছুদিন রোগভোগের পর একটু সুস্থ হয়ে উঠেই মুচকি হেসে বলেন, আমি তো এবারেও মরিনি। মাত্র উনষাট বছর বয়েস, যদি একশো বৎসর বাঁচি ? ততদিন কে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে দেখা যাক।

মহিম ঠাকুরের কাঁধে ভর দিয়ে স্টেশন চত্বর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহারাজ বললেন, মহিম, আমার কাছে ত্রিপুরার চেয়ে বেশি প্রিয় স্থান আর কোথাও নেই, ত্রিপুরার বাতাসে আমার শরীর জুড়োয়, কিন্তু কলকাতায় এলেও বেশ ভাল লাগে হে ! কলকাতার বাতাস বিশুদ্ধ নয়, দূষিতই বলতে পার, রাস্তায় কত ধুলো, অনেক কল-কারখানা গজিয়ে উঠেছে, সেগুলির চোঙা থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে চক্ষু জ্বালা করে, অনবরত ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, তবু কলকাতায় এলে চাঙ্গা বোধ করি কেন জানো ? এখানকার বাতাসে মিশে আছে বহু বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ মানুষের নিঃশ্বাস। এমনটি আর ভূ-ভারতে কোথায় আছে ?

মহিম বলল, তা ঠিক। মহারাজ, আপনার হাত এত ঘামছে কেন ?

মহারাজ বললেন, ওইটাই তো প্রধান রোগের লক্ষণ ! শরীরের কলকব্জায় কোথাও কিছু গোলযোগ ঘটেছে। এখানে যে ওই এক নামজাদা ডাক্তার আছে, কী যেন নাম, মহীন, মহীনলাল, তাই না !

মহিম বলল, মহেন্দ্রলাল সরকারের কথা বলছেন ?

মহারাজ বললেন, ঠিক ঠিক, মহেন্দ্রলাল, তাকে ডেকে আনিস, তার ওষুধ খাওয়ার চেয়েও তার কথাবার্তা শুনে আমি বেশ মজা পাই।

তারপর মহারাজ উচ্চহাস্য করে বললেন, ওই একটিমাত্র ডাক্তার, যে আমাকেও ধমকে কথা বলে !

স্টেশনের বাইরে অনেকগুলি জুড়িগাড়ি মহারাজ ও তাঁর দলবলের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এ যাত্রায় কনিষ্ঠা রানি মনোমোহিনীকেও সঙ্গে আনা হয়নি, তিনি এর মধ্যেই দুটি সন্তানের জননী। কুমার রাধাকিশোর কলকাতায় আসার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কলকাতার উচ্চবর্গীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তার আসার ব্যবস্থা সব ঠিক ছিল, শেষ মুহূর্তে কোনও কারণে মহারাজ তাঁকে ত্রিপুরাতেই থাকতে বলেছেন।

গাড়িতে ওঠার আগে মহারাজ একটুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই নগরী যেন সদাই ব্যস্ত। মানুষজন হাঁটে না, দৌড়োয়। কোথায় যায়, এদের এত কিসের কাজ ? এই তুলনায় ত্রিপুরায় জীবন কত শান্ত, ঢিলেঢালা। কলকাতার মানুষ একে অপরকে ঠেলেঠুলে ছুটছে, যেন জীবন যাপনের মধ্যে সর্বক্ষণই রয়েছে এক প্রতিযোগিতা।

সার্কুলার রোডের বাড়িটিতে মহারাজ বীরচন্দ্র যখন প্রথমবার আসেন, তখন শশিভূষণ তাঁর সাড়ম্বর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন শশিভূষণ নেই, মহারাজও আসছেন ঘন ঘন, তাই সে রকম কিছু

ঘটল না। মহারাজ এসেই ওপরে উঠে গেলেন বিশ্রাম নিতে। একেই তো শরীর সুস্থ নয়, তার ওপর দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তি, প্রথম দিন তিনি বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না। রানিদের কারুকে সঙ্গে আনেননি, কিন্তু দুজন কাছুয়া তরুণী সঙ্গে এসেছে সেবার জন্য। সারাদিনে ও রাত্রে কিছু সময়ের জন্য অন্তত নারীসঙ্গ তাঁর চাই-ই, না হলে প্রাণ উচাটন হয়। পুরুষরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে কেমন একটা রুক্ষতার বাতাস এসে গায়ে লাগে, নারীদের অলঙ্কারের সামান্য রিনিঝিনি, তাদের কটাক্ষ, তাদের বিলোল হাস্যে মধুর রসের সৃষ্টি হয়।

প্রভাবতী ও গিরিধারা নাম্নী যে যুবতী দুটি এসেছে, তারা সেবাকার্যে ও অঙ্গসংবাহনে খুবই নিপুণ, কিন্তু দুজনের একজনও গান জানে না। আসর জমিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের গান শুনতে মহারাজ পছন্দ করেন, কীর্তনিয়ারা তাঁকে প্রায়ই পদাবলী সঙ্গীত শোনায়, কিন্তু মহারাজের বড় শখ, বিশ্রাম নেবার সময় শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি রমণীকণ্ঠের গান শুনবেন। সে শখ আর মিটল না। তাঁর রানিরা কেউ গান জানে না, ত্রিপুরায় স্ত্রী লোকেরা গান বাজনার চর্চা করে না।

মহারাজকে বিশ্রাম নেবার জন্য পাঠিয়েই বেরিয়ে পড়ল মহিম। কলকাতা শহর তার খুব পরিচিত। সে এই শহরে থেকে পড়াশুনো করেছে। হেয়ার স্কুলে তার সহপাঠী ছিল ঠাকুর বাড়ির ছেলে বলেন্দ্রনাথ। কলেজ স্ট্রিটে শ্রীহট্ট মেসে থাকার সুখস্মৃতি আছে। সেই মেসের সহবাসীরা ত্রিপুরার ছেলে বলে মহিমকে বিশেষ খাতির করত। সুরেন বাড়ুজ্যের গরম গরম বক্তৃতা শুনে ছাত্রদের মধ্যে তখন রাজনৈতিক চেতনা জাগছে, ত্রিপুরা-রাজ প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের বাইরে একটি স্বাধীন দেশ, সে জন্য সকলেরই কৌতূহল ছিল ত্রিপুরা সম্পর্কে।

মহিম কলেজ স্ট্রিটের সেই মেসে গিয়ে পুরনো আমলের কাউকেই পেল না। আবাসিকরা সব নতুন তো বটেই, ম্যানেজার-ঠাকুর-চাকররাও বদলে গেছে। শুধু একজন দারোয়ান এখনও রয়ে গেছে, সে মহিমকে চিনতে পারল বলেই তার বড় আনন্দ হল।

সেখান থেকে সে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। খবর পেয়ে নেমে এল বলেন্দ্র, মহিমকে দেখে আলিঙ্গন করল সাদরে। দুই কৈশোরের বন্ধু মেতে উঠল গল্পে।

মহিম ছাত্রজীবনে এ বাড়িতে আগেও এসেছে। বলেন্দ্রর কাকা কবিবর রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গেও পরিচয় আছে বিলক্ষণ। মহারাজ এই রবীন্দ্রবাবুকে খুব পছন্দ করেন, কলকাতায় এলেই তাঁকে ডেকে নেন। রবীন্দ্রবাবু এখন বাড়িতে নেই, মহিম বলেন্দ্রকে বলল, আর একদিন সে নিজে এসে রবীন্দ্রবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাবে।

এরপর সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চেম্বারে গিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এল।

মহেন্দ্রলাল এলেন পরদিন বিকেলে।

কলকাতায় এসেই শরীরে বেশ অস্বস্তিবোধ করছেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, তিনি শয্যা ছেড়ে আর ওঠেননি। ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল অন্দরমহলে।

মহেন্দ্রলালের যা স্বভাব, দরজার সামনে কিছুক্ষণ গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে, ওয়েস্ট কোটের পকেটে দুটি হাত দিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন সারা ঘর। রোগীর চিকিৎসা করার আগেই কক্ষের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখলে তিনি ধমক দিতে শুরু করেন।

এখানে সে রকম কিছু পেলেন না, কিন্তু রোগীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তাঁকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, হুঁ!

পালঙ্কের পাশে একটি চেয়ারে বসে তিনি মহারাজের একটি হাত ধরে নাড়ি দেখতে দেখতে বললেন, গতবারে আপনাকে যেমনটি দেখেছি, তার চেয়ে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। মুখের চামড়ার রং ভাল নয়। খুব অনিয়ম করছেন বুঝি ?

মহারাজ বললেন, অনিয়ম কাকে বলে ? বাপ-ঠাকুর্দারা যে রকম ভাবে জীবন কাটিয়েছেন, আমিও সেইভাবে কাটাই।

মহেন্দ্রলাল বললেন, বাপ-ঠাকুর্দার মতন। হুঁ! রাজা-মহারাজাদের অনেক রকম বদ অভ্যেস থাকে শুনেছি। আপনার সে রকম কী কী আছে শুনি ?

মহারাজ হেসে বললেন, তা কিছু কিছু আছে বটে। এমনকি আমার বাপ-ঠাকুর্দার যে সব দোষ ছিল না আমার সে রকমও কিছু আছে। সেগুলিই আগে বলি ?

মহেন্দ্রলাল বললেন, বেশ, তাই শোনা যাক। রুগীর সম্পর্কে সব কিছু না-জানলে চিকিৎসা করা যায় না।

মহারাজ দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বললেন, আমি কবিতা রচনা করি।

মহেন্দ্রলাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ! কবিতা লেখেন ? কেন ?

মহারাজ বললেন, কেন লিখি ? মাথায় মাঝে মাঝে কবিতা এসে যায়, তাই না লিখে পারি না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, এ তো ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। একজন রাজার মাথায় কবিতা আসবে কেন ? রাজকার্যে পুরোপুরি মন না দিয়ে কবিতা লিখে সময় নষ্ট করা তো ভাল কথা নয়। কবিরা কবিতা রচনা করবে, রাজারা রাজত্ব চালাবে, এটাই তো ঠিক !

মহারাজ বললেন, রাজার মস্তিষ্কে যদি কবিতা সেঁধিয়ে পড়ে তা হলে কী করা যাবে ?

মহেন্দ্রলাল বললেন, বিদেয় করে দিতে হবে। উহুঁ, এ লক্ষণ ভাল নয়। ইদানীংকালে দু জনের কথা জানি। কবিতা লিখে বিপদে পড়েছে। দিল্লির মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহ আর আওয়েধের নবাব ওয়াজির আলি শাহ, এই দুজনেরই কবিতা লেখার বাতিক ছিল, সেই জন্য দু জনেই রাজ্য খুইয়ে নির্বাসিত হয়েছে। ঠিক কিনা ?

মহারাজ বললেন, আমার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। আমি লিখি, দু চারজন মাত্র শোনে। ইংরেজরা আমার কবিতা রচনার কথা টের পায়নি, পাবেও না।

মহেন্দ্রলাল গম্ভীরভাবে বললেন, যদি লিখতেই হয়, ও দোষ একেবারে কাটাতে না-পারেন, তা হলে শুধু দিনের বেলায়। রাত্তির জেগে লেখা চলবে না একেবারেই। শরীরে সইবে না।

মহারাজ বললেন, রাতে লিখি না বটে, কিন্তু গান-বাজনা শুনি। কোনও কোনও দিন শুনতে শুনতে রাত ভোর হয়ে যায়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, দিনের বেলা কাব্যি করবেন, রাত্তিরে গান-বাজনা, তা হলে প্রজাদের দেখবেন কখন ! রাজকার্য কখন সামলাবেন ?

মহারাজ বললেন, আমার রাজত্বে রাজকার্য তেমন গুরুতর নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই তো ঠিক চলে যায়। প্রজারাও আমাকে মান্য করে। দিনের বেলা আমি আর একটি কাজও করি। ছবি আঁকি, ছবি তুলি। আঁকার কাজটি এখন তেমন হয় না, তবে ফটোগ্রাফির শখ রয়েছে পুরোপুরি। এবারে গঙ্গার ধারের কতকগুলো ফটো তুলব ঠিক করেছি।

মহেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি দেখছি এক মডার্ন মহারাজ ! দিনকাল পাল্টেছে, এখনকার রাজা কিংবা নবাবরা প্রজাদের পিটিয়ে আনন্দ পায় না। অন্য রকম শখে মেতেছে। তা বেশ। মদ্যপান করা হয় কতখানি ?

মহারাজ বললেন, জীবনে কখনও স্পর্শ করিনি !

মহেন্দ্রলাল ভুরু প্রায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত তুলে বললেন, অ্যাঁ ? রাজা

হয়েও মদ খায় না, এমন তো কখনও শুনিনি। এ যে দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

মহারাজ বললেন, মদ্য পান করি না বটে, তবে তামাক বেশি খাই। দেখছেনই তো। গড়গড়ার নল হাতে না নিয়ে একটুক্ষণও থাকতে পারি না। এমনকি যখন পথ দিয়ে হেঁটে যাই, তখনও হুঁকো-বরদার সঙ্গে ছোটে।

মহেন্দ্রলাল বললেন, তামাক তো রাজা-প্রজা সকলেই খায়। এমনকি দক্ষিণেশ্বরের যে সাধু ছিলেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, তিনিও খুব তামাক টানতেন। গলায় ক্যানসার হল, তাও বন্ধ করেননি, তাঁর শিষ্যরাও খুব তামাকের ভক্ত। মহারাজ, আপনার রানির সংখ্যা কত ?

মহারাজ একটু চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, ঠিক বলতে পারি না। ঠিকঠাক হিসেব করে পরে আপনাকে সংখ্যাটা জানাব।

মহেন্দ্রলাল জিজ্ঞেস করলেন, আর রাজকীয় ভোজনবিলাস ? সেটা কী রকম ?

মহারাজ বললেন, সেটা বলার মতন কিছু নয়। এককালে খেতে পারতাম বটে। খিচুড়ি বড় প্রিয় ছিল, একগামলা উড়িয়ে দিতে পারতাম। এখন আর পেটে তত সয় না। বিশ-পঁচিশটা লুচি খাই বড় জোর, তাও দুপুরবেলা, রাত্তিরে চাট্টি গরম ভাত আর মাংসের জুস, একটা মাছের মাথা আর গোটাকতক সন্দেশ। কলকাতা এলে রসগোল্লা খাই। বড় ভাল এখানকার রসগোল্লা।

মহেন্দ্রলাল বললেন, হুঁ, বুঝলাম। এবার আমার কথাটা বলি ? আপনি পদ্য লিখে, গান শুনে, ফটোগ্রাফির চর্চা করেও কী ভাবে রাজ্য শাসন করবেন, সে চিন্তা আপনার, আমার নয়। আপনি সিংহাসনে বসেছেন বলেই তো সৃষ্টিকর্তা আপনার শরীরটা অন্যভাবে গড়েননি ? রাজা আর প্রজা, সকলেই মানুষ, সকলেরই শরীরের গঠন এক প্রকার। আমাকে যখন চিকিৎসা করতে হবে, তখন আপনার এই শরীরটাই চিকিৎসা করতে হবে, একজন মহারাজের শরীর বলে আলাদা কিছু নয়। কিছু কিছু নিয়ম মেনে না-চললে যত বড় ডাক্তারই ডাকুন আর যত দামি ওষুধই খান, আপনার রক্তামাশা সারবে না। আপনার হৃদযন্ত্রও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনাকে খাওয়া কমাতে হবে, লুচি চারখানার বেশি না, আর সন্দেশ একটা। মাছের মুড়ো এখন অল্পবয়েসীদের পাতে তুলে দিন। তামাক টানাও কমাতে হবে, বন্ধ করতে পারলেই ভাল হয়। অধিক রাত্রি জাগরণ একেবারে নিষিদ্ধ। গান-বাজনা শোনা ভাল, মন প্রফুল্ল হয়, আমিও খুব পছন্দ করি, কিন্তু রাত বারোটার পর একেবারেই নয়। এই সব মানলে ওষুধের ফল পাওয়া যাবে। নচেৎ না। কোথাও বায়ু পরিবর্তনের জন্য যেতে পারলে ভালো হয়।

মহারাজ বললেন, ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় এসেছি, এই তো বায়ু পরিবর্তন হল !

মহেন্দ্রলাল হেসে উঠে বললেন, কলকাতার বায়ু ? পরিবর্তন মানে ভাল ছেড়ে মন্দের দিকে নয়। আপনার দেশে উঁচু কোনও পাহাড় আছে ? যেখানে বরফ জমে ?

মহারাজ বললেন, পাহাড় আছে অগুনতি, কিন্তু তেমন উঁচু নয়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, কোনও শৈলনিবাসে গেলে আপনার উপকার হতে পারে। দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং যেতে পারেন, ঠাণ্ডায় আপনার উপকার হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে, চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়ে মহেন্দ্রলাল আবার বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা। আমি এখানে আসব শুনে আনন্দমোহন বসু আমাকে বললেন, ত্রিপুরায় নাকি এখনও সতীদাহ হয় ? ইংরেজের আইন আপনার রাজ্যে খাটে না। এখানে যারা বিধবা বিবাহের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছে, তারা আপনার দেশে সতীদাহ এ যুগেও চালু আছে শুনে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মহারাজ বললেন, না, না, ওই প্রথা ছিল এক সময়। আমি বছর কয়েক আগে তা রদ করে দিয়েছি।

মহেন্দ্রলাল বললেন, আপনি সিংহাসনে বসেছেন অনেককাল আগে, তবু এতদিন চালু ছিল ? হঠাৎ বদলাতে গেলেনই বা কেন ?

মহারাজ বললেন, অনেক দিনের ধর্মীয় প্রথা। বদলানো সহজ নয়। আমার সচিব রাধারমণ ঘোষ এই নিয়ে অনেকদিন ধরে খুঁচিয়েছে আমাকে। তারপর হল কী। আমার সেনাপতি চরণ, সে হঠাৎ মারা গেল। তার স্ত্রী নিছন্দবতী পরমাসুন্দরী। নিছন্দবতী নিজেই সতী হতে চাইল। আমি কিছুই জানি না, এমন তো কতই হয়। আমি জঙ্গলে ফটোগ্রাফি করতে গেছি, এমন সময় ঘোষমশাই এসে বলল, মহারাজ, একবার শ্মশানে চলুন। প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল আমাকে। গিয়ে দেখি কী, লোক জড়ো হয়েছে অনেক, ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজছে, একটা লাল পাড় শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে নিছন্দবতী, চুল খোলা, চোখে কাজল, টকটকে গৌরবর্ণ, ঠিক দেখাচ্ছে এক দেবীর মতন। এই অপরূপ রমণী জীবিত অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ? আমি হাত তুলে বললাম, ওরে রাখ, রাখ ! বন্ধ কর ! নিছন্দবতী তবু মানতে চায় না, জ্বলন্ত চিতায় সে উঠবেই। তখনই আমি আদেশ জারি করলাম, আজ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে সতী হওয়া নিষিদ্ধ হল। কেউ স্বেচ্ছায় সতী হতে চাইলেও আমার সেনা তাকে আটকাবে !

মহেন্দ্রলাল বললেন, তারপর আপনি সেই নিছন্দবতীকে বিয়ে করে ফেললেন ?

মহারাজ ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে না না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, একটি সুন্দরী রমণীকে দেখে আপনার মন গলে গিয়েছিল ! ওই নিছন্দবতী যদি এক কুচ্ছিৎ বুড়ি মাগী হত, তা হলে আপনি মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন, তাই না ?

মহেন্দ্রলাল কাছে এসে মহারাজের বাহুর চামড়া দু আঙুলে টেনে ধরে বললেন, একবার কল্পনা করুন তো, আপনার একখানা রানি মারা গেছে, তারপর আপনাকে জ্যান্ত অবস্থায় সেই চিতায় চড়ানো হয়েছে, সতীর পুংলিঙ্গ কী জানি না, আপনাকে পুরুষ-সতী করা হলে, পটপট করে পুড়ছে গায়ের চামড়া, মাথার চুল জ্বলছে দাউ দাউ করে, গলে যাচ্ছে চোখ, ভাবুন তো একবার সেই অবস্থাটা ? সতী ! যত সব শয়তান, বদ, গুখেকোর বাচ্চারা এই প্রথা চালু করেছিল, আপনার মতন লোকেরা সেই সব কুচরিত্তির পুরুতগুলোর কথায় নেচেছেন, তাদের মদত দিয়েছেন !

মহারাজ স্তম্ভিতভাবে ডাক্তারটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর রাজ-অঙ্গ এই ভাবে স্পর্শ করার সাহস নেই কারুর। তাঁর সামনে এ রকম দাঁত কিড়মিড়িয়ে আজ অবধি কেউ কথা বলেনি। এটা ব্রিটিশ রাজত্ব, নিজের রাজ্যে কেউ এমন বেয়াদপি করলে তিনি তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারতেন।

ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে মহেন্দ্রলাল বললেন, আমি যে সংযমগুলি পালন করতে বলেছি, তা মানতে পারেন তো ভাল। আর যদি না মানেন, তা হলে আর আমাকে কল দেবার দরকার নেই। শুধু ওষুধে কোনও কাজ হয় না। যে রুগী আমার নির্দেশ মানে না, হাজার টাকা ফি দিলেও আমি তাকে দেখতে আসি না।

মহিম দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। সে ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে গেল।

ওই অবস্থায় খানিকক্ষণ বসে থাকার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য পালঙ্ক থেকে নামলেন। তাঁর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রোধের জ্বালা। নাগরা পায়ে দিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে।

একটু বাদে তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, মহিম ! মহিম !

মহিম ছুটে এল এদিকে। হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বলল, কিছু আনতে হবে ?

মহারাজ হাত নেড়ে বললেন, না। ওই হারামজাদা ডাক্তারটা আমাকে কী রকম কথা শুনিয়ে গেল দেখলি ? এত সাহস !

মহিম চুপ করে রইল। এই ডাক্তার বরাবরই দুর্মুখ, সবাই জানে। তবে এতটা বাড়াবাড়ি কখনও করেননি। বিশেষত দু আঙুল চিমটের মতন করে মহারাজের চামড়া টেনে ধরা, মহিম তখন শিউরে উঠেছিল।

খাঁচায় বন্দী সিংহের মতন ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মহারাজ বললেন, তোর কাছে পিস্তল ছিল না ? তুই ওকে গুলি করে মারতে পারলি না ?

মহিম ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, আজ্ঞে—

মহারাজ বললেন, ডাক্তার হয়েছে বলে ও যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এতবড় কলকাতা শহরে আর বুঝি ডাক্তার নেই ? কত সাহেব ডাক্তার আছে, মাদ্রাজী ডাক্তার আছে, টাকা ছড়ালে ডাক্তারের অভাব !

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন মহারাজ। ক্রোধের বদলে তাঁর মুখে এবার ফুটে উঠল বিস্ময়।

তিনি বললেন, মহিম, একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস ?

মহিম বলল, কী মহারাজ ?

মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন, চোখ নেই ? দেখতে পাস না ? প্রায় দু মাস ধরে আমি ভাল করে হাঁটতে পারি না। বুক ধড়ফড় করে। কাল সন্ধে থেকে আমি মাটিতে পা ফেলতেই পারিনি। কিন্তু এখন আমি কী করছি ? নিজে নিজে হেঁটে বেড়াচ্ছি, কারুর কাঁধে ভর দিতেও হচ্ছে না।

তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, এ ব্যাটা ডাক্তারের গুণ আছে বাবা, স্বীকার করতেই হবে। ওষুধ লাগল না, শুধু কথা বলে বলেই আমাকে খাড়া করে দিলে ! অ্যাঁ ? এতক্ষণ তামাকও খাইনি। ওকেই বারবার ডাকবি। আসতে না-চায়, ধরে বেঁধে আনবি। তবে দেখিস, ও যখন আসবে, আমার ঘরের আশেপাশে কেউ যেন না থাকে। ও ব্যাটা যখন আমাকে অপমান করবে, আর যেন কেউ তা শুনতে না-পায়। আজ ও আমার সঙ্গে যেমন ব্যাভারটা করে গেল, সে কথা তুই যদি কারুকে বলিস, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো। যা এবার একটু তামাক সাজতে বল।

মহারাজ আপন মনে হাসতে লাগলেন।

এরপর ক্রমশই বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। শহরে তাঁর আগমনবার্তা প্রচারিত হয়ে গেল। অনেকেই তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসে। বাইরের লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার বেশ মধুর, ধনী বা দরিদ্রের প্রভেদ করেন না। তাঁর দানের মধ্যে প্রকাশ্য অহমিকা নেই। দীনেশচন্দ্র সেন নামে এক নবীন গ্রন্থকার নিজের বই ছাপার খরচ পেয়েছে মহারাজের কাছ থেকে, কৃতজ্ঞতাবশত সে গ্রন্থখানি মহারাজের নামে উৎসর্গ করতে চায়। মহারাজ বিনম্রভাবে বলে উঠলেন, না, না তা আবার কেন, তা আবার কেন ?

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা তিনি বরাবরই পছন্দ করেন, এবারও এই কবির নতুন কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন। 'চিত্রা' নামে রবীন্দ্রবাবুর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বড় সরেস এর কবিতাগুলি।

রবীন্দ্রবাবু উচ্চবংশের সন্তান, তিনি মহারাজের কাছে কখনও কিছু চাইবেন না। কিন্তু মহারাজের কিছু দিতে ইচ্ছে করে। 'চিত্রা' গ্রন্থখানি নাড়াচাড়া করতে করতে মহারাজ বললেন, ছাপা-বাঁধাই তেমন ভাল নয়। এমন উত্তম কবিতা, সোনার জলে ছাপান উচিত ছিল। চিত্র-শোভিত করে মরক্কো চামড়ায় বাঁধালে এর উপযুক্ত হয়।

রবির গ্রন্থগুলির প্রকাশক পাওয়া যায় না। নিজেদেরই ব্রাহ্ম মিশন

প্রেসে ছাপা হয়, দাম কমাবার জন্য বাঁধাইয়ের যত্ন নেওয়া হয় না।

মহারাজ বললেন, রবিবাবু, আমার ইচ্ছে হয়, আপনার যে কটি বই বেরিয়েছে, সব একত্র করে একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করি। আপনি কী বলেন ?

রবি সলজ্জ সম্মতি জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার আনুকূল্যে যদি একটি সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করা যায়, তা হলে অনেকের উপকার হয়। পদাবলীগুলি এক একটি রত্ন, কিন্তু কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

মহারাজ উৎসাহিত হয়ে বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনি সংগ্রহ করতে লেগে যান। যদি লক্ষ টাকাও লাগে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপারে রাধারমণেরও বিশেষ আগ্রহ। তিনি রবির সঙ্গে বসে গেলেন সম্পাদনার পরিকল্পনায়। মহিমের অনুরোধে কয়েকখানা গানও গাইলেন রবি। তার মধ্যে বিশেষত একখানা গান শুনে মহারাজ বলে উঠলেন, কথা ? শুধু কথা বিষয়ে একখানি গান ? এমন কথা কে কবে শুনেছে ? আর একবার শোনান তো !

রবি দ্বিতীয়বার গাইলেন :

কথা তারে ছিল বলিতে
চোখে চোখে দেখা হলো পথ চলিতে
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে।
যে কথা ফুটিয়া ওঠে কুসুমবনে
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে...

নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মহারাজ বললেন, এমন গান শুনলে বয়েস কমে যায়। কী গান শোনালেন রবিবাবু, আমার সব রোগ

সেরে গেল। কাব্য আর গানের কাছে ওষুধ-বিষুধ কোন ছার! এক ডাক্তার বলে কী, রাজা হলে নাকি কবিতা ভালবাসতে নেই!

বাংলার সাহিত্যি জগৎ সম্পর্কে মহারাজের স্পষ্ট ধারণা নেই। কিছু কিছু বই পড়েছেন শুধু। রবি প্রতিটি লেখক, প্রতিটি পত্র-পত্রিকার খুঁটিনাটি খবর রাখেন। রবির সঙ্গে আলোচনা করতে করতে মহারাজ অনেক কিছু জেনে নেন। মহারাজ স্বয়ং কবিতা রচনা করেন, রবি তার কয়েকটি 'ভারতী' কিংবা 'সাধনা'য় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, মহারাজ কিছুতেই তাতে সম্মত হন না। তাঁর যশের বাসনা নেই।

কথায় কথায় রাধারমণ এক সময় বললেন, শুনছি এখন দ্বিজুবাবু নামে একজনও বেশ ভাল লিখছেন, আমাদের কৃষ্ণনগরের ওদিককার ছেলে!

রবি বললেন, হ্যাঁ, খুব ভাল লিখছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমার বন্ধু মানুষ, নিজের রচিত গান গাইতেও পারেন খুব ভাল।

রাধারমণ বললেন, একদিন তাকে ডেকে তার গান শুনলে হয়!

মহারাজ মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, আমি একনিষ্ঠ। আমি রবিবাবু ছাড়া আর কারুর গান শুনতে চাই না। তোমরা শুনে দেখো!

রবি এ কথা শুনে শ্লাঘা বোধ করলেও জোর দিয়ে বললেন, না, মহারাজ, আপনি একবার শুনে দেখুন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর গান অতি উচ্চাঙ্গের।

রবি মহারাজকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একদিন আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে ওঁকে সরলা ও ইন্দিরার গান শোনান হবে।

মহারাজ বললেন, যাব, আপনাদের সুবিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে গেলে আমি ধন্য হবো। তবে একটা শর্ত আছে। আমি যদি হাওয়া পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং বা কাশিয়াং যাই, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

কাব্য ও সঙ্গীত ছাড়া মহারাজের অপর শখ নাটক দেখা। শরীর বেশ সুস্থ আছে, এখন মহারাজ এক এক সন্ধ্যায় এক একটি থিয়েটারে যান। এখন দুটি মঞ্চে গিরিশবাবু ও অর্ধেন্দুশেখর জোর পাল্লা দিয়ে নাটক নামিয়ে যাচ্ছেন। স্টারে অমৃতলালের দলটিও বেশ জনপ্রিয়। তুলনামূলক বিচার করার জন্য মহারাজ দেখতে লাগলেন সবগুলি।

এমারাল্ড থিয়েটারে গিয়ে একটি ঘটনা ঘটল।

ব্যবসাবুদ্ধিহীন অর্ধেন্দুশেখর অনেক আর্থিক দণ্ড দিয়ে থিয়েটারের মালিকানা খুইয়েছেন। অংশীদাররাও ত্যাগ করেছে তাঁকে। এমারাল্ড এখন ভাড়া নিয়েছে বেনারসী দাস নামে এক মারোয়াড়ি, অধ্যক্ষ ও নাট্য-পরিচালক রয়েছেন অর্ধেন্দুশেখরই। নাটক চলছে রমেশ দত্তর 'বঙ্গ বিজেতা'।

অভিনয় চলাকালীন নায়িকার মুখে একখানি গান শুনে মহারাজ চমকিত হলেন।

মহারাজের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়, অনেক পরিচিত মানুষেরও তিনি নাম ভুলে যান। কিন্তু গান কখনও ভোলেন না। গানের বাণী তাঁর সহজে মুখস্ত হয়ে যায়, একবার শোনা গানের সুরও তাঁর কানে লেগে থাকে।

এই নাটকের গানটি তাঁর চেনা চেনা লাগল। অথচ কোথায় শুনেছেন, কবে শুনেছেন ঠিক মনে পড়ছে না। এই নাটক তিনি আগে দেখেননি, সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এ নাটকের জন্য লিখিত গান তিনি পূর্বে শুনবেনই বা কী করে? অনেকে অবশ্য নতুন গানেও পরিচিত সুর লাগিয়ে দেয়। অন্যান্য দৃশ্যগুলির বদলে, যে সব দৃশ্যে ওই মেয়েটি আসছে মহারাজ শুধুই সেগুলিই দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

নায়িকাটি বেশ জনপ্রিয় বোঝা যায়। তার চোখা চোখা সংলাপে ও গানে দর্শকরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। মেয়েটি অভিনয়ও করছে খুব দাপটের সঙ্গে। তার মুখে আর একটি গান শুনেই মহারাজ বুঝতে পারলেন, এই গান নয়, এই কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত।

মহারাজের দু পাশে বসেছে রাধারমণ ও মহিম। ইন্টারভ্যালের সময় মহারাজ রাধারমণকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোষজা, এই প্রধানা অভিনেত্রীটিকে চিনতে পারলে?

রাধারমণ বললেন, আমি আগে ওর অভিনয় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

মহারাজ বললেন, এ মেয়ে এক সময় আমাদের এই কলকাতার বাড়ির দাসী ছিল। কী যেন ওর নাম?

রাধারমণ বাড়ির দাসীদের খোঁজখবর রাখেন না। তিনি তাকালেন মহিমের দিকে। মহিমের অন্দরমহলে যাতায়াত আছে। কিন্তু মহিম কলকাতার বাড়িতে এবারেই প্রথম এসেছে। সেও দেখেনি ও মেয়েটিকে।

মহারাজ ভুরু কুঞ্চিত করে স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে বললেন, নাম মনে করতে পারলে না? কী যে করো! ও যে আমার বাড়ির দাসী ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাধারমণ উঠে গিয়ে থিয়েটারের একটা হ্যান্ডবিল জোগাড় করে এনে বললেন, এর নাম তো দেখছি নয়নমণি।

মহারাজ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, না, ও নাম নয়। ও নাম নয়। অন্য, কী যেন। সেই যে শশীমাস্টার যে-মেয়েটাকে নিয়ে ভেগে পড়েছিল।

রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। তিনি বললেন, ভূমিসুতা? না, শশিভূষণ ওকে নিয়ে পালায়নি। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, সে চন্দননগরে অন্য এক বউ নিয়ে থিতু হয়েছে। সে ভূমিসুতার কোনও খবর রাখে না। এই সেই ভূমিসুতা?

মহারাজ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, শশিভূষণ ওকে নিয়ে ভাগেনি! তা হলে...আমি এই মেয়েটিকে চেয়েছিলাম, তবু সে চলে গেল কেন?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন রাধারমণ। তিনি চুপ করে রইলেন।

অভিনয় শেষ হবার পর মহারাজ নট-নটীদের কিছু পারিতোষিক দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মঞ্চের পেছনে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। সমস্ত নট-নটীরা সার বদ্ধ হয়ে রইল তাঁর সামনে, মধ্যিখানে অর্ধেন্দুশেখর।

মহারাজ নাটকটির অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে অর্ধেন্দুশেখরকে উপহার দিলেন একটি হীরের আংটি। এক হাজার রুপোর টাকা দিলেন নট-নটীদের মধ্যে বন্টন করে দেবার জন্য।

সবাই মহারাজকে প্রণাম করে যেতে লাগল। নয়নমণি যেই নিচু হয়ে মহারাজের পায়ে হাত দিয়েছে, তখনই মহারাজ রাধারমণকে বললেন, ঘোষমশাই, জিজ্ঞেস কর, এই মেয়েটি আমার বাড়ির দাসী ছিল কিনা।

নয়নমণির মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মহারাজ তাকে চিনতে পারবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এত বছর বাদে, তাও তার মুখে রং মাখা।

নয়নমণির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন না মহারাজ। তিনি আবার রাধারমণের দিকে চেয়ে বললেন, ওকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে কিছু না জানিয়ে এই মেয়ে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন?

নয়নমণি এবারেও কোনও উত্তর না দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

মহারাজ অর্ধেন্দুশেখরের দিকে ফিরে বললেন, মুস্তফিমশাই, কাল সোমবার বোধকরি আপনাদের থিয়েটার খোলা থাকে না। কাল সন্ধেবেলা এই মেয়েটিকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন তো। আমি নিভৃতে ওর গান শুনব। *(ক্রমশ)*

অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধা·রা·বা·হি·ক উ·প·ন্যা·স

মৈত্রেয়-জাতক

বা ণী ব সু

১৫

সাকেত থেকে তিন বটু তিন স্থবিকা কাহিনী নিয়ে ফিরলেন। পূর্বাপর শুনে মিগার-পত্নী বললেন, 'গহপতি যা করবে ভেবে-চিন্তে করো। তোমার উপার্জনকে যে তার নিজের সম্পদের তুলনায় এক কাহনও মনে করে না সেই দাম্ভিকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা কি ভালো?'

মিগার শুষ্ক মুখে বললেন, 'কিন্তু উপায় কী? পাশার দান যে ফেলা হয়ে গেছে! এখন আর ফিরি কী করে? তবে হ্যাঁ। মিগার অত সহজে ছেড়ে দেবে না, শিক্ষা দিচ্ছি। আগে দেখি মহারাজ কী বলেন!'

'মহারাজের সঙ্গে এ কুটুম্বিতার কী সম্পর্ক?'

'বাঃ, মহারাজ স্বয়ং তো এই সেঠ্‌ঠিকে মগধ থেকে এনে সাকেতে বসত করালেন।'

'তাই নাকি? কেন?'

'সে এক মহা অপমানের কথা!'

'কী ব্যাপার বলো তো সেঠ্‌ঠি!'

'ব্যাপার কিছুই না। মগধের রাজার তো দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। শ্রীবৃদ্ধি তো শুধু শুধু হয় না! অর্থভাণ্ডার প্রস্তুত থাকা চাই। মগধের শ্রীটি আছ পঞ্চ মহা-সেঠ্‌ঠির কোষে। তো রাজার অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছা মনে উদয় হয় কি না! আমাদের ডেকে কার কত সম্পদ গণনা করিয়ে বললেন— সাবত্থিতে তো দেখছি সুদত্ত, মণিভদ্র, প্রতর্দন ও মিগার। তাও সুদত্তর মতো সম্পদশালী আর কেউই নয়। কিন্তু মগধে রয়েছেন পাঁচজন। আমার রাজ্যেই বা সেনিয়র রাজ্যের থেকে অল্প থাকবে কেন? আমরা কত করে বোঝালাম, মহারাজ এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কী লাভ? আমরা কি যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে, মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময়ে আপনাকে ধন দিয়ে সাহায্য করতে পারছি না! তো রাজার এক গোঁ। আরেক জন সেঠ্‌ঠিকে মগধ থেকে এনে বসত করাতে হবে।'

'তোমরা বললে না কেন, ভিনদেশের ধনী এসে আমাদের সমাজে মানাতে পারবে না, একটা অনত্থ হবে!'

'বলিনি আবার! সে কথাও বলেছিলেন সেঠ্‌ঠি মণিভদ্দ। তার উত্তরে পাগলা রাজা কী বললেন জানো? বললেন, আপনারা অনর্থক হিংসুকবৃত্তি করে তাকে বিব্রত না করলে তার অসুবিধে হবে কেন? কোসল আর মগধ পাশাপাশি রাজ্য। দেশের প্রজাগণের মধ্যে, সমাজ-সংস্কারের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? সেখানেও যাগ-যজ্ঞ হয়, এখানেও যাগ-যজ্ঞ হয়। ওখানে মগধরাজ ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ও সোমদণ্ডকে প্রভূত ধন দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখানেও আমি ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাতি ও তারুক্‌খকে ব্রহ্মত্র দিয়েছি। ওখানেও সন্ন্যাসী-শ্রমণদের সমাদর, এখানেও তাই। আপনাদের অসুবিধা হবে তা-ই বলুন!'

'গহপতি সুদত্ত কিছু বললেন না?'

'তাঁর কি আসে যায় বলো গৃহিণী। তিনি তো নিজের সাম্রাজ্য বাড়িয়েই চলেছেন, বাড়িয়েই চলেছেন। মানুষটি কথাও বলেন অল্প। চতুর তো! বুঝেছেন রাজার ইচ্ছা, অন্যথা হবে না। অমনি মৌন নিলেন। তা সে যাই হোক। ওখানকার মহাসেঠ্‌ঠি মেণ্ডকের পুত্র ধনঞ্জয়কে মহারাজ একেবারে জোর করে নিয়ে আসছিলেন। সেঠ্‌ঠি পুত্তুর চতুর তো কম নয়! সাবত্থি পর্যন্ত এলোই না। সাকেতে বাস নিল। বাস চুকে গেল। আমাদের কারও আর সে কথা মনেও নেই। এই বটুরা যে কন্যা নির্বাচন করতে গিয়ে ওই ধনঞ্জয়ের কন্যার গলাতেই আমার মালাটি পরিয়ে আসবে তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছি!'

শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী উভয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিবাহ হচ্ছে, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু নিজেদের চেয়েও শতগুণে ধনী যে তার ঘর থেকে বধূ আনলে তো মহা সমস্যার উদয় হবে! সে কি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে মান্য করবে!

মহারাজ প্রসেনজিৎ কিন্তু এই সংবাদ শুনে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বুঝলে গহপতি, বৈবাহিক সম্পর্কই হলো সবার সেরা সম্পর্ক। এই যে আমি আর মগধরাজ বিম্বিসার পরস্পর পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ করেছি, দুটি রাজ্যে কেমন শান্তি বলুন তো? যতই রাজ্যলোভ থাক কেউই তো আর ভগ্নীকে বিধবা করতে চায় না।' বলে প্রসেনজিৎ হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন, 'তো গহপতি, আপনার আর ধনঞ্জয়ের কন্যা এবং পুত্র যদি থাকে তো এইরকম বিনিময় করে নিন না কেন? আমার রাজ্যের সম্পদের ভিত্তি আরও দৃঢ় হবে!'

মিগার অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'আমার কোনও কন্যা নেই।'

রাজা তাঁর অপ্রসন্নতা লক্ষ্যই করলেন না, বললেন, 'তা না থাক। এতদিনে যে মগধশ্রেষ্ঠীর সঙ্গে শ্রাবস্তীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হতে

চলেছে—এ অত্যন্ত সুখের কথা। আমি স্বয়ং যাবো। মহাদেবী মল্লিকাকে নিয়েই যাবো।'

এ কথাতে খুব সংগোপনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিগার। বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই, আপনার জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিজন-সৈন্য-রক্ষী সবই নিশ্চয় যাবে!'

প্রসেনজিৎ চিন্তিত হয়ে বললেন, 'জ্ঞাতি-বন্ধু? সে তো অনেক? আমি কয়েক জন দেহরক্ষী, নির্দিষ্ট সংখ্যক দাস-দাসী আর মহাদেবী মগধকুমারী ও দেবী মল্লিকাকে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলাম।'

মিগার বলে উঠলেন, 'না, মহারাজ, আমার পুত্রের আবাহে আপনার অন্তঃপুরিকারা সবাই যাবেন। অন্যান্য রানিরাই বা বাদ থাকবেন কেন? তাঁদের রক্ষার জন্য এবং আপনার মর্যাদারক্ষার জন্য যতজন দাসদাসী, রক্ষী ইত্যাদি লাগে সবাইকেই নিতে হবে।'

প্রসেনজিৎ বললেন, 'তাহলে গহপতি, আপনি একবার সাকেতের শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠান। শুধু শুধু তাঁকে বিব্রত করতে আমার ইচ্ছা নেই।'

মিগার সংবাদ পাঠালেন, 'মহাসেঠ্‌ঠি, আপনার কন্যাকে বধূ করে আনতে পারছি বলে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। মহারাজ প্রসেনজিৎ আমাকে খুবই অনুগ্রহ করেন। কন্যাকে আনতে তিনিও আমার সঙ্গে যেতে চান। কত জন বরযাত্র গেলে আপনার অসুবিধা হয় না, তা একটু যদি পূর্বাহ্নে জানান।'

অশ্বারোহী দূত দু দিনের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের লিপি নিয়ে এলো: 'মাননীয় শ্রেষ্ঠীবর মিগার, আপনার নিজের পরিবার, জ্ঞাতি, জ্ঞাতক, মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুলে যাঁরা আছেন তাঁরা তো সকলে আসবেনই, মহারাজ পসেনদিও তাঁর যতজন সৈন্য, যতজন রক্ষী লাগবে সবাইকে নিয়ে আমার কন্যার বিবাহোৎসবে আসবেন।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রমণীদের মধ্যে একমাত্র দেবী মল্লিকা ছাড়া আর কেউই গেলেন না। নারীদের এভাবে বরানুগমন করার প্রথা নেই। সে যত সমারোহের বিবাহই হোক। দেবী মল্লিকার কথা স্বতন্ত্র। মাত্র দু-চার বছর হল রাজা পসেনদি তাঁকে বিবাহ করেছেন। গিয়েছিলেন কোশল সীমান্তে বিদ্রোহ দমন করতে। এই সীমান্তের অঞ্চলগুলিতে মাণ্ডলিক রাজারা অধিকার পেতে পেতে এক সময়ে মনে করতে থাকে তারাই আসল রাজা। ইচ্ছামতো কর বসায়, বিচার করে প্রজাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে থাকে, রাজা পসেনদিকে গ্রাহ্যই করে না। কোশল রাজ্য, কাশী যুক্ত হবার পর একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। শাক্য, কোলিয়, কালাম, এরা সকলেই কোশলের পদানত। রাজার রয়েছে সুযোগ্য সেনাপতিদ্বয় বন্ধুমল্ল এবং দীঘচারায়ণ। রাজা নিজে অত্যন্ত বিলাসী হলেও একবার ক্রুদ্ধ হলে যে আর রক্ষা নেই এ কথা এরা ভুলে যায়। পসেনদি স্বয়ং গিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। ফেরবার পথে একটি অতি শোভন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলেন ক্লান্ত হয়ে। ওই পুষ্পোদ্যানের স্বত্ব ছিল যাঁর তিনি একজন সুবিখ্যাত মালাকার। মল্লিকা তাঁরই কন্যা। রাজাকে শ্রান্ত ক্লান্ত দেখে মল্লিকা তাঁর ঘোড়াটির রজ্জু ধরে, রাজাকে জল পান করতে দেয়। এবং ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে রাজা ঘুমিয়ে পড়লে, কঠিন ভূমিতে এই রাজপুরুষের কষ্ট হবে মনে করে তাঁর মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে—রাজার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত অচলভাবে বসে থাকে। —কন্যাটি সুশীলা, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী তো বটেই তার ওপর অতি সুন্দরী। এরকম নারী পসেনদির চোখে পড়লে রাজান্তঃপুরে সে যাবে না এমন হতে পারে না। মল্লিকা রাজা জেনে তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পসেনদি তৎক্ষণাৎ নিজের পরিচয় দিলেন এবং মল্লিকার পিতার কাছে গিয়ে কন্যাটির পাণি প্রার্থনা করলেন। এরকম তো কতই হয়! কয়েক মাস পরে এই রমণীর ওপর থেকে রাজার ঝোঁক চলে যায় সে তখন রাজার অসংখ্য অন্তঃপুরিকাদের একজন মাত্র হয়ে যায়। কিন্তু মল্লিকার ভাগ্য তেমন হল না। একেই তো তাঁকে রাজা অগ্রমহিষী করলেন, তারপর মাসের পর মাস শুধু মল্লিকার গৃহেই রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। দু'জনের মধ্যে গভীর প্রণয়। এখন রাজা দেবী মল্লিকাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই তিনিও সঙ্গে যাবেন। পাঁচ শতাধিক সৈন্য, রক্ষী, আরও পাঁচ শতাধিক জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজন নিয়ে রাজার মঙ্গল-হস্তী সহ বহু হস্তী, ঘোড়া, রথ ইত্যাদি নিয়ে মহানন্দে সাকেত অভিমুখে যাত্রা করলেন মিগার শ্রেষ্ঠী।

সময়টা বর্ষা। আকাশ প্রায় সর্বক্ষণই মেঘাচ্ছন্ন। যে কোনও মুহূর্তে আকাশ থেকে নেমে আসবে বারিধারা। পথঘাট হবে কর্দমাক্ত। স্কন্ধাবারে বাস করা অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। তার ওপর বর্ষার সময়ে নানাপ্রকার কীট, সাপ, পতঙ্গ-পিপীলিকায় ছেয়ে যাবে চতুর্দিক। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বর্ষা উত্তীর্ণ করে শীতের প্রারম্ভে বিবাহোৎসব করতে চেয়েছিলেন। তখন আকাশ থাকবে পরিষ্কার। বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ। কীট-পতঙ্গের উপদ্রব থাকবে না। সর্পেরা ঘুমোতে যাবে। বিবাহের জন্য এই সময়ই প্রশস্ত। তা ছাড়া কন্যার অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করতে সময় লাগবে। কিন্তু মিগার মনে মনে ধূর্ত হাসি হেসে ধনঞ্জয়ের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। অবশ্যই অতি সাবধান সম্ভ্রমের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠী ক্ষেপে না যায়। তিনি বলে পাঠালেন বাগ্‌-দানের পর আমাদের কুলে বধূকে এতদিন পিতৃগৃহে ফেলে রাখবার নিয়ম নেই। পুন্নবদ্ধনের মাতা তাঁর নির্বাচনের দুই পক্ষকালের মধ্যে শ্বশুরগৃহে এসেছিলেন। অতএব শ্রেষ্ঠিবর আপনি কন্যাকে প্রস্তুত করুন। আর অলঙ্কার বস্ত্রাদির জন্য অত সময় নেওয়ার প্রয়োজন কী! একমাত্র পুত্রের বধূর সম্মানরক্ষার জন্য মিগার যথাসম্ভব অলঙ্কারাদির ব্যবস্থা করেছেন।

এই লিপি পাবার পর সাকেতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। পেটিকার পর পেটিকা বস্ত্র আসছে, বারাণসীর নানা রঙের দুকূল, স্বর্ণসূত্রী শাটিকা, রূপা এবং সোনার সুতোর ফুল তোলা বসন, বহুরকম কার্পাসিক, ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, সূক্ষ্ম ঊর্ণার বস্ত্র, সেই সঙ্গে মুক্তা, গজদন্ত, হীরা, পুষ্পরাগ, মরকত, বৈদূর্য, মণি-মাণিক্যের স্তূপ হয়ে গেছে। এই সমস্ত নিয়ে নানা চিত্র করতে ব্যস্ত দেবী সুমনা। সেই সব চিত্র দেখে দেখে সুবন্নকারেরা গহনা প্রস্তুত করছে। তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন করছে। বিবাহমণ্ডপের সজ্জা কেমন হবে, বিশাখার অনুচরীরাই বা কীভাবে সজ্জিত হবে, সঙ্গে কী নেবে, পুরনারীরা, দাস-দাসীরা তারা কী বস্ত্র এবং অলংকার পরবে...দেবী সুমনার নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

মিগারের পত্রটি দেখে ধনঞ্জয় খানিকটা বিমূঢ় হয়ে অন্তঃপুরে এলেন। —'সুমনা, প্রিয়ে দেখো তো মিগার শ্রেষ্ঠীর অবিবেচনা। এই বর্ষাতেই সে বিবাহ দিতে চায়! ছয় সাত শতেরও অধিক সম্মানিত অতিথি আসছেন শ্রাবস্তী থেকে। এদিকে সাকেতের সবাইকে, গ্রামগুলি, ভদ্দিয়, রাজগৃহ সর্বত্রই তো নিমন্ত্রণ পাঠাতে হবে।'

সুমনা বললেন, 'সে কী! "মহালতা পসাদন" নির্মাণ করতেই তো তিন মাস সময় লাগবে সুবন্নকারেরা বলছে। তার আগে তো হবে না!'

ধনঞ্জয় বললেন, 'বুঝতে পারছি না। মিগার শ্রেষ্ঠী কিংবা রাজা প্রসেনজিৎ কি আমার ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে চান?'

'কেন? যাঁরা নিজেরাই কন্যাকে বরণ করেছেন, যৌতুকের কথা চিন্তা করেননি, সহসা তাঁরা তোমার ক্ষমতার পরীক্ষা করতে চাইবেন কেন?'

ধনঞ্জয় অপ্রতিভ মুখে বললেন, 'একটা কথা অসতর্কভাবে বলে ফেলেছিলাম প্রিয়ে, বুঝতে পারছি না এসব তারই প্রতিক্রিয়া কি না।'

'কী কথা!' সুমনা অবাক হয়ে বললেন।

'শ্রেষ্ঠীর উপার্জনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর শুনে মনে হল ইনি আমার সঙ্গে কোনও তুলনাতেই আসেন না। সে কথাটা

ব্রাহ্মণদের সামনেই বলে ফেলেছি।'

সুমনা রাগ করে বললেন, 'তুমি বড় অবিনয়ী সেঠ্‌ঠি। কতবার তোমাকে বলেছি প্রকৃত ধনী যে, সে কখনও দম্ভ দেখায় না। শ্বশুর পিতাকে দেখেছ কখনও সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে, অথচ তাঁর তুল্য ধনশালী আর কে আছে ভদ্দিয়তে ? তুমি যে অন্তত তিন পুরুষে ধনী সন্তান তোমার আচরণ দেখে কখনও কখনও তা মনে হয় না।'

ধনঞ্জয় প্রকৃতই অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'আসলে সুমনা, কত বিপজ্জনক বাণিজ্যযাত্রা করে, কত অজপথ, জঙ্কুপথ, বেত্রপথ, শঙ্কুপথ পার হয়ে নিজের বীর্যে, বুদ্ধিতে ধন অর্জন করেছি। অত ধনী পিতার পুত্র হয়েও তাঁর ওপর নির্ভর করিনি। আজ যে সাকেতের এই শ্রী-সমৃদ্ধি তার কিছুই কি ধনঞ্জয় ব্যতীত হত ? তাই দম্ভ নয়, একটা প্রসন্নতা, প্রত্যয় সব সময়ে আমার হৃদয় অধিকার করে থাকে। আর সংখ্যা গণনার কথাই যদি বলো, চার শত কোটি যে অশীতিসহস্র কোটির কাছে এক কাহনও নয়, এ তো অঙ্কপাত করলেই বোঝা যাবে। সহজ, সরল, সত্য কথা। তাই....।'

সুমনা বললেন, 'তাই, যে গৃহে কন্যা দিতে চলেছ, সেই গৃহের গৃহপতির সম্পর্কে এ উক্তি করবে! তার দূতদের সামনে ? তোমার কন্যার সুখশান্তি সবই যে নির্ভর করছে তোমার এই আচরণের ওপরে।'

জীবনে এই প্রথম শ্রেষ্ঠীগৃহে দাম্পত্যকলহ লাগল।

ধনঞ্জয় বারবার বলতে চান—তিনি যা সত্য তাই বলেছেন মাত্র। কাউকে অপমান করার জন্য কিছু বলেননি। তা ছাড়া সে সময় তিনি মিগার-পুত্রকে কন্যা দেবার কথা একেবারেই ভাবছিলেন না। সুমনা রাজগৃহ থেকে ফেরবার পর পরিস্থিতির চাপে পড়েই এ বিবাহ স্থির করেছেন।

সুমনা ততই ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'সত্য কথা আর রূঢ় কথার পার্থক্য ধনঞ্জয় কবে বুঝবেন ? এর ওপর যে বিশাখার সারা জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করছে।' সুমনা সহসা সংযম হারান না। কিন্তু তাঁর এখনকার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তিনি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

এই বাদপ্রতিবাদের মধ্যে বিশাখা কক্ষে প্রবেশ করেছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, 'বিশাখার সুখশান্তি কখনওই এইসব তুচ্ছ কারণের ওপর নির্ভর করবে না মা, তুমি শান্ত হও।'

সুমনা বললেন, 'কিন্তু মা তুই তো জানিস না, ইচ্ছে করলে শ্বশুর-শ্বশ্রূ যে তোকে কী অসহ্য কষ্ট দিতে পারেন, অপমান করতে পারেন, একবার বিবাহ হয়ে গেলে তোকে আমরা এ সব থেকে বাঁচাব কী করে ?'

বিশাখা বলল, 'ইচ্ছে করলেই শ্বশুর-শ্বশ্রূ বা অন্য কেউই ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখাকে কষ্ট দিতে পারেন না মা, অপমান করতেও পারেন না। আমি দেবী সুমনার কন্যা, দেবী পদ্মাবতীর পৌত্রী।'

সে স্বচ্ছন্দ কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাবে কোনও কঠিনতা নেই। কিন্তু রানির মতো এক সহজ মর্যাদাবোধ তাকে ঘিরে। এই বিশাখাকে কেউ কষ্ট দিতে পারে, কেউ এর অমর্যাদা করতে পারে সত্যিই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সদ্য ষোড়শী এই কন্যা তার পিতৃ-মাতৃকুলের গণ্ডির বাইরে যে বিশাল সংসার আছে তার কতটুকু জানে! শ্বশুরগৃহ হল নৈর্ঋত কোণের মতো, সেখান থেকে আসে যত দুঃখ, যত অনাদর, ভাগ্য মন্দ হলে! বিশাখার ভাগ্য কি ভালো! ভালো হলে রাজ-পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার ভয়ে এরকম বায়ুবেগে হ্রস্ব-দীর্ঘ কোনও চিন্তা না করে একটা বিবাহ স্থির করে ফেলতে হয় কেন ? ধনঞ্জয় যা বলছেন তাতে তো সুমনার বুক কাঁপছে।

তিনি সভয়ে বললেন, 'কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে আমরা বিশাখাকে যে ভাবে লালন-পালন করেছি তাতে ও সেখানে গিয়ে থাকবেই বা কী করে ?'

এইবার ধনঞ্জয় হেসে বললেন, 'বিশাখাকে মিগার শ্রেষ্ঠীর ঘরে থাকতে হবে কেন ?'

'তার অর্থ! কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাবে না ?'

'পাঠাব না কেন ? কিন্তু আমার কন্যা তার নিজের সমস্ত প্রয়োজন, নিত্যকৃত্য এবং বিলাসাদির ব্যয়ের জন্য যত অর্থ লাগবে সবই এখান থেকে নিয়ে যাবে। তার দাস-দাসী, সহচরীরা তাকে ঘিরে থাকবে। কোনও কিছুর জন্যই মিগার শ্রেষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হতে হবে না।'

'তাহলে তো আরও ভালো! কন্যার দুর্ভাগ্যের পথটি একেবারে বাঁধিয়ে দিচ্ছ।'

'কেন ? তুমি কি বলতে চাও ধনঞ্জয় তার কন্যাকে যৌতুক দেবে না ? দাস-দাসী দেবে না ? মহাদেবী কোশলকুমারী যখন রাজা বিম্বিসারের মহিষী হয়ে আসেন, কাশী রাজ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম শুধু স্নানের ব্যয়-নির্বাহ করবার জন্যই পেয়েছিলেন, তা জানো ?

'তুমি কি মহারাজ মহাকোশলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছ নাকি ?'

'না, তা নয়।' ধনঞ্জয় কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু আমার কন্যার অন্ন-বস্ত্র-প্রসাধন-দান-ধ্যান-আমোদ-প্রমোদের জন্য আমি যদি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী যৌতুক দিই কার কী বলার থাকতে পারে! আর ধরো যে গাভীগুলি পাঠাবো তাদের দুধ তো শুধু বিশাখা আর তার সহচরী দাস-দাসীরাই পান করে ফুরোতে পারবে না, মিগারও খাবেন, তাঁর ধর্মপত্নীও খাবেন, তাঁদের পরিজনদের ভাগ্যেও কিছু মাত্র অল্প পড়বে না। আর বলদ যে সব যাচ্ছে, সেগুলি দিয়ে তো বিশাখা ভূমি কর্ষণ করবে না!'

'কী অর্থ এসব কথার ?' দেবী সুমনা বিমূঢ় হয়ে বললেন। তিনি একবার হাস্যমুখী কন্যার দিকে তাকাচ্ছেন, আর একবার তাকাচ্ছেন দুষ্টু হাসিতে ভরা মুখ স্বামীর দিকে।' 'বুঝতে যদি না পারো তাহলে বুঝতে হবে অলঙ্কারের রত্ন গণনা করতে করতে আর গহনার রত্নসংস্থানের চিত্র করতে করতে তোমার মস্তিষ্কটি একেবারে সোনা রূপা মণি মুক্তাতেই ঠাসা হয়ে গেছে প্রিয়ে, না হলে...'

বিশাখা হাসতে হাসতে বলল, 'মা, পিতা বলতে চাইছেন অতিরিক্ত যৌতুক পেয়ে আমার শ্বশুর আহ্লাদিতই হবেন। পিতাকে অহংকারী ভেবে ক্রুদ্ধ হবার কোনও কারণ ঘটবে না।'

সুমনা বললেন, 'কত গাভী, কত বলদ দেবে শুনি ?'

'যত গাভী যেতে চায়, যত বলদ যেতে চায়।'

'পশুদের বিশাখা নিজের হাতে যত্ন করে, ওরা বিশাখাকে যত চেনে আর কাউকে তত চেনে না। তা ছাড়া গো-পালকদের মতো বিশাখা তো কখনও ওদের প্রহার করে না। বৎসগুলিকে সরিয়ে রেখে, দুধ দোহন করে নেয় না, সে যায় শুধু ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে, ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে দিতে কিংবা মধুমাখা ঘাসের গুচ্ছ খাওয়াতে। ওরা বিশাখাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে, ল্যাজ তুলে সব ওর পেছন পেছন চলে যাবে।'

'তাহলে সুমনা তুমি গাভীগুলিকে সব দিতে চাইছ না। শুনছিস বিশাখা, মায়ের মনে ভয় হয়েছে তাঁর গোয়াল বুঝি শূন্য হয়ে যায়।'

সুমনা রঙ্গরসিকতার ধার দিয়েও গেলেন না, বললেন, 'যার হৃদয় শূন্য হয়ে যেতে চলেছে তার গোয়ালে গরু থাকলেই বা কী! না থাকলেই বা কী! এ সব অর্থহীন কথা বলো না সেঠ্‌ঠি। কিন্তু এত গোধন পাঠালে, সাবত্থি সেঠ্‌ঠি তা রাখবেন কোথায় ?'

'নতুন নতুন গোশালা নির্মাণ করিয়ে নেবেন, আমি যেমন এই বর্ষায় অতিথিদের রাখবার জন্য নতুন নতুন গৃহ প্রস্তুত করছি।' ধনঞ্জয়ের চোখ ঝিকমিক করছে।

'আর তাদের পালন ? পালন করবার জন্যেও তো বহু লোক চাই!'

'চাই-ই তো! তাই-ই অপরিমিত দাস-দাসী পাঠাচ্ছি।'

'বাঃ, আর সেই সব দাস-দাসীর পালন ?'

'তার জন্য আবার শকটের পর শকট কার্ষাপণ যাবে।'

'সেগুলি ব্যয় হয়ে গেলে ?'

'ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ধনকে সন্তানবতী করার উপায় জানে। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী মাত্র এক দিনের পথ। ওদের লালন-পালন বিশাখাই করবে।'

'কিন্তু এত দাস-দাসী, সহচরী ইত্যাদি নিয়ে থাকবার স্থান সঙ্কুলান আছে কি না মিগার সেঠ্‌ঠির গৃহে সে সংবাদ নিয়েছো ? তার নিজেরও নিশ্চয় অনেক আছে।'

'তা আছে। এবং এত দাস-দাসীর স্থান হওয়া সত্যিই সমস্যা।'

'তবে ?'

'বিশাখার জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদের নির্মাণ করিয়ে দিচ্ছি। বারাণসী বর্ধকিরা এখানকার কাজ শেষ করেই শ্রাবস্তী চলে যাবে।'

সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু সেঠ্‌ঠি, এতটা কি ভালো করছ ? স্বতন্ত্র প্রাসাদে স্বতন্ত্র দাসদাসী নিয়ে সুখী থাকবে, এ তো রাজবাড়ি নয়, সেঠ্‌ঠি বাড়ি। গহপতির কি এসব ভালো লাগবে ?'

ধনঞ্জয় বললেন, 'আমরা গিয়ে তাঁর পুত্রকে প্রার্থনা করতে যাইনি সুমনা। তাঁরাই সারা মধ্যদেশ ঘুরে আমার কন্যাটিকে সর্বোত্তম বিবেচনা করে, ঝুপ করে তার গলায় আশীর্বাদী হারটি পরিয়ে দিয়ে গেছেন। দূত ব্রাহ্মণদের কাছে নিশ্চয় শুনেওছেন ধনঞ্জয় তার অতিথিদের কীভাবে রাখে। সুতরাং কন্যাকে কীভাবে রাখে সে কথা বলাই বাহুল্য। এমন ঘর থেকে কন্যা নিয়ে যাচ্ছে, মিগার শ্রেষ্ঠীরই তো উচিত স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেওয়া।'

'কী করে জানলে করাননি ?'

'ভালো তো ! করিয়ে থাকলে ভালোই। অধিক থাকলেই বা ক্ষতি কী ? তাঁরটাও থাক, আমারটাও থাক।'

সুমনা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কৃপণং হ দুহিতা।'

'তার সুখের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করছি তবু বলবে দুহিতা কৃপণা ? দুঃখিনী ?' ধনঞ্জয় সকাতরে বললেন।

সুমনা বললেন, 'সেইজন্যেই তো বললাম ! এত ধনসম্পদ ! এমন পিতা ! তবু এই পরম স্নেহের ধন দুহিতাটিকে পর-ঘরে পাঠাতে হয়। তার সুখদুঃখ নির্ভর করে এমন কতকগুলি মানুষের ওপর যাদের এতদিন ধরে সে চেনেইনি। জানেইনি। কী তাদের অভ্যাস, কী তাদের চরিত্র, তারা কী চায়, এইসব জানতে বুঝতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তার ব্যয় হয়ে যাবে। বালিকার অপূর্ব সরলতার স্থান নেবে অভিজ্ঞতাপক্ক সংসারবুদ্ধি। কিশোরী হয়ে যাবে বৃদ্ধা। কৃপণা, বড়ই দুঃখিনী এই দুহিতারা।'

সুমনার বিষণ্ণ মুখ দেখে ধনঞ্জয় কোমলকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু সুমনা, তাকে তো জায়াও হতে হবে। সে যদি তোমার মতো সখিসম্মিত জায়া হয় !'

সুমনা বললেন, 'সে সখিসম্মিত হবে, কিন্তু তার পতিটি যদি সখাসম্মিত না হয়, তোমার মতো !'

মাতা-পিতার বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে বিশাখা মাকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে এসেছিল। তার অনেক কাজ। বারাণসীর নিকটবর্তী বর্ধকী গ্রাম থেকে পাঁচ শতাধিক বর্ধকি এসেছে। সরযূতীরে যেখানে নৌবণিকরা এসে থাকে, বিশ্রাম করে, তারই কাছাকাছি তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। নগরের মধ্যে যে কটি শোভন গৃহ পাওয়া গেছে সেগুলি তো রাজা উগ্রসেনের অনুমতিক্রমে নেওয়া হয়েছেই। তা ছাড়া বেশ কিছু অস্থায়ী বাড়ি প্রস্তুত হবে। এই বর্ধকিরা নিজেদের গ্রামেই গৃহের স্তম্ভ, দ্বার, বাতায়ন, মেঝের জন্য বড় বড় পাটা প্রস্তুত করে আনে। সাকেতের স্থপতিজ্যেষ্ঠক অনুবিন্দ বিশাখার সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের দিয়ে কতকগুলি অস্থায়ী হর্ম্য করাচ্ছেন। কোনটি সপত্নীক মহারাজ প্রসেনজিতের জন্য যাতে তিনি ব্যক্তিগত দাসী ও রক্ষীদের নিয়ে থাকতে পারেন। কোনটি তার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠীর জন্য। পুত্র এবং ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের নিয়ে তিনি থাকতে পারবেন। কোনটি তাঁর বন্ধুস্থানীয়, মহাশ্রেষ্ঠী সুদত্তর। সৈন্যদের থাকবার জন্য অর্ধক্রোশ দীর্ঘ, অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে। সঙ্গেই পানীয় জলের জন্য একটি, স্নানের জন্য আরেকটি পুকুর। এই সমস্ত গৃহের সজ্জা কী হবে, পীঠিকাগুলি কেমন, পল্যংকের কী পরিমাপ, ভোজনপট, ফলকাদি, দীপাধার, পেটিকা বস্ত্রাচ্ছাদন ইত্যাদির পরিকল্পনার ভার বিশাখার। অতিথিশালার সংলগ্ন উদ্যানটিতে শয্যার উপকরণাদি প্রস্তুত হচ্ছে। তূলের আঁশে উদ্যানটিতে যেন কুয়াশা লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। বিশাখার দাসীরা মাঝে মাঝে তত্ত্বাবধান করবার জন্য গিয়ে আপাদমস্তক আঁশ জড়িয়ে এসে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রত্যেকটি গৃহের সংলগ্ন রন্ধনশালা রাখা হয়েছে। সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক পাচক, দাস-দাসী তৈজসাদি। বরানুগামী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যা ইচ্ছা খেতে পারবেন। বিশাখা একটি বৃহৎ খাদ্যতালিকা করেছে, প্রত্যেকটি গৃহের জন্য। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, সায়মাশ, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ফল ও পানীয়। পাচকজ্যেষ্ঠ অতিথিদের রুচি বুঝে খাদ্য পাক করবে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতরা থাকবেন শ্রেষ্ঠীগৃহের অতিথিশালায়, বিশাল সপ্তভূমিক বিমানের বহু কক্ষে। সুমনার মহানসে বহুবিধ পিষ্টক, মোদক, অপূ, শুষ্ক খজ্জ প্রস্তুত হয়ে চলেছে। অপরিমিত দুগ্ধের নবনীত তোলা হচ্ছে, ক্ষীর প্রস্তুত হচ্ছে, ভারে ভারে আসছে, মাংসর জন্য পশু, পাখি। রন্ধনশালার বিভিন্ন ভাগে এসব হচ্ছে। ফোটানো, সিজানো, ভাপানো, পোড়ানো, সাঁতলানো, ভাজার গন্ধে, পাকশালা ম-ম করছে।

নানাপ্রকার শাক—লাউ, কুমড়ো, বার্তাকু, শিম্বি, ঝিঙা, কন্দ, ইত্যাদি কুট্টিতকরণ হচ্ছে। বাটা হচ্ছে নানারকম সুগন্ধি ভোজ্যে দেওয়ার জন্য।

ভদ্দিয় থেকে এসে গেছেন বিশাখার সব জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত ও তাঁদের পত্নীরা। সব ভাই ভগ্নী। পিতামহ মেণ্ডক ধনঞ্জয়ের সঙ্গে গভীর পরামর্শে রত। তাঁর কক্ষ থেকে ধনঞ্জয়কে কেবলই বার হতে দেখা যাচ্ছে। বিশাখার মাতুলগৃহ রাজগৃহ থেকেও ধীরে ধীরে এসে পৌঁছচ্ছেন অনেকে। কিন্তু-আত্মীয় পরিজনের চেয়েও সংখ্যায় বেশি সাকেত এবং তার সন্নিহিত গ্রামগুলির মানুষ। কস্‌সক গ্রামগুলিই তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে কম্মার গ্রাম, কুম্ভকার গ্রাম, কৈবর্ত গ্রাম, তন্তুবায় গ্রাম, নিষাদ গ্রাম, বেণ, রথকার, পুক্কুস, চণ্ডাল—সবাই এই বিবাহোৎসবে কোনও না কোনওভাবে জড়িত, নিযুক্ত। ভোজের নিমন্ত্রণে তাদের কেউই বাদ যায়নি। বর্চ্চকুটিরগুলির মল পরিষ্কার করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে শত শত চণ্ডাল। পথগুলি, দেবালয় ও উদ্যানগুলি সব সময় পরিচ্ছন্ন ও জলসিঞ্চিত রাখার জন্য শত শত পুক্কুস, নিষাদেরা মাংসের জোগান দিয়ে যাচ্ছে, বরাহমাংস, গোমাংস, মেষমাংস, হরিণমাংস, তা ছাড়াও হংস, ময়ূর, বর্তক আসছে রাশি রাশি।

আচার্য ক্ষত্রপাণির সঙ্গে নিভৃতে বহু আলোচনা করে স্থির হল বর্ষা ঋতুর শেষতম লগ্নে কন্যাদান করা হবে। ইতিমধ্যে বরপক্ষ আসছে আসুক। তাঁদের অভ্যর্থনা, আদর যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। মেণ্ডক বললেন, 'মহারাজ পসেনদি কি অতদিন অপেক্ষা করতে রাজি হবেন ? তাঁর রাজকার্য রয়েছে।'

ধনঞ্জয় হেসে বললেন, 'মহারাজ পসেনদিকে যতদূর বুঝেছি তিনি অত্যন্ত প্রমোদপ্রিয় এবং ভোগবিলাসী। আসছেন বাবাতা রাজ্ঞী মল্লিকাদেবীর সঙ্গে। রাজ্য দেখবার জন্য তো তাঁর সুযোগ্য

সেনাপতিদ্বয় রইলই। সর্বার্থক, অন্যান্য অমাত্যরা, মহিষী মগধদেবী এঁরাও রইলেন। আমার তো মনে হয় কিছুকাল বিলাসে আলস্যে কাটাতে পারলে মহারাজ আর কিছু চাইবেন না।'

মেণ্ডক বললেন, 'এ কেমন রাজা তোমাদের পুত্র ? রাজার তো অমাত্য, মহামাত্র, সেনাপতি এ সব থাকবেই, তাই বলে এতদিন শুধু বিলাস আর ভোজনের লোভে রাজকার্য থেকে অব্যাহতি নিয়ে এখানে থাকবেন এক শ্রেষ্ঠী-কন্যার বিবাহে ! আমি এ প্রকার দেখিনি। আমাদের মগধরাজ এরূপ নয়। দেখো, পসেনদির রাজ্য বেশি দিন থাকবে না। রাজ্যসীমা তো বাড়িয়েছেন মহারাজাধিরাজ মহাকোশল। ইনি শুধু ভোগ করছেন। আমাদের মহারাজকে দেখো ! রাজকার্যে কী গম্ভীর ! প্রজাদের সুখ-সুবিধা দেখেন স্বয়ং। অপরাধীদের বিচারের জন্য বিনিশ্চয়ামাত্যের ওপর নির্ভর করেন না। এমন কি মাণ্ডলিক রাজাদের ওপরও নির্ভর করেন না। এই তো ক'মাস আগে সহস্র সহস্র গ্রামণীদের নিয়ে সভা করলেন। ভদ্দিয়র এক গ্রামভোজকের কাছে শুনলাম প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলেছেন। অতি মধুর অথচ দৃঢ় তাঁর আচরণ। প্রজারা ক্রমশই সেনিয় বিম্বিসারের ভক্ত হয়ে পড়ছে। মহা মহা সন্ন্যাসী শ্রমণরাও কিন্তু তাঁর রাজ্যে শান্তি আছে বলে সেখানেই বসবাস করছেন। রাজগৃহে ঢুকতে পশ্চিম দিকের পাহাড়টির তো নামই হয়ে গেল ঋষিগিরি। এত সন্ন্যাসী সেখানে কুটির নির্মাণ করে সাধনা করছেন।'

ধনঞ্জয় বললেন, 'দেব-দ্বিজে ভক্তি রাজা পসেনদিরও কিছু কম নেই পিতা। তিনি যে ভগবান বুদ্ধের ভক্ত শুনেছি। এদিকে পূরণ কশ্যপও থাকেন ওখানেই। পোক্খরসাতি ও তারুকখ এই দুই ব্রাহ্মণকে তো অতিশয় ভক্তি করেন। তবে এ কথা ঠিক, এ রাজা বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তক্ষশিলার স্নাতক, এত বড় বংশে জন্ম, কিন্তু সুন্দরী নারী আর সু-রসাল ভোজ্য পেলে আর কিছু চান না।'

মেণ্ডক বললেন, 'যাক, রাজচরিত্র নিয়ে আলোচনা করে এখন আর কী লাভ ধনঞ্জয়। তোমার ভাগ্য তোমাকে মহারাজ পসেনদির রাজ্যে এনে ফেলেছে। তবে সাকেত তো শুনছি নাকি কোশলের দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে উঠেছে। এ কথা কি সত্য ?'

ধনঞ্জয় গর্বভরে বললেন, 'না পিতা, সাকেত নয়, দক্ষিণ কোশলের রাজধানী কুশাবতী। কিন্তু আপনার পুত্র এখানে এসে বসবাস করবার পর থেকে সাকেতের এতটাই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে যে লোকে মনে করে সাকেতই বুঝি-বা রাজধানী। লোকের মুখে মুখে চারণদের গানে গানে এ কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। হয়ত শীঘ্রই সত্যি হয়ে উঠবে।'

মেণ্ডক বললেন, 'তোমার মতো যশস্বী পুত্র গর্ভে ধারণ করেছেন বলে তোমার জননী দেবী পদ্মাবতী ধন্য। ধন্য আমি, তোমার পিতাও। অন্য পুত্রগুলি আমার সম্পদ রক্ষা করছে ঠিকই। কিন্তু তোমার মতো সাহসী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান তারা কেউ নয়। শুনলাম তুমি সমুদ্র বাণিজ্যেও উৎসাহী। যাচ্ছ নাকি ?'

'এখনও স্থির করিনি।' ধনঞ্জয় সলজ্জে বললেন। আসলে দেবী সুমনা এবং কন্যা বিশাখাকে ছেড়ে অতিশয় বিপজ্জনক কিছু করবার উৎসাহ তিনি অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছেন। যা করেছেন সেই প্রথম যৌবনে, মধ্যযৌবনে। এখন এত সম্পদ, এবং সেগুলি বাড়াবার এত কৌশল তিনি গৃহে বসে বসেই বার করতে পারেন মাথা থেকে যে সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি আর নিতে ইচ্ছা করে না।

মেণ্ডক বললেন, 'সে যাই হোক, রাজা এবং অন্যান্য অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য বন্দোবস্ত কি করেছ তো ?'

'নিশ্চয়ই। [illegible] আনিয়েছি নট, নটক, কুম্ভথুনিক, ঐন্দ্রজালিক, [illegible] এবং হাতির খেলাও দেখানো হবে। [illegible] বেশ্যা, রূপাজীবা ও ভালো ভালো গণিকা। এরা নৃত্যগীতে খুবই কুশলী। সঙ্গে অবশ্যই বংশী, বীণা, মৃদঙ্গ, পটহ বাদকেরা আসবে। অক্ষক্রীড়ার জন্য মণ্ডপ করিয়েছি বিশটি। পিতা, আমাদের ভদ্দিয়র বাড়ির দাসেদের মধ্যে কেউ উচ্চস্তরের ইন্দ্রজাল দেখাক না। পারবে না ?

মেণ্ডক বললেন, 'শল্য আর সুলভকে শিখিয়েছিলাম যত্ন নিয়ে। দু'জনকেই মুক্তি দিয়েছি। তারা এখন কোন দেশে বিচরণ করছে জানি না তো ! তুমি যদি আগে জানাতে দূত পাঠিয়ে দেখতে পারতাম। তোমার কন্যার বিবাহোৎসব শুনলে তারা নিশ্চয়ই সব কাজ ফেলে আসত।'

মেণ্ডক মৃদুমৃদু হাসছেন দেখে ধনঞ্জয় বললেন, 'পিতা আপনি হাসছেন কেন ?'

মেণ্ডক বললেন, 'তোমার কন্যা বালিকা বয়সে আমার কাছে প্রায়ই একটি প্রার্থনা জানাত, তাই ভেবে হাসছি।'

'কী প্রার্থনা, পিতা ?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন ধনঞ্জয়।

'ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল শিখতে চেয়েছিল। ভাবছি দুটি-একটি গুপ্তবিদ্যা শ্রাবস্তী যাবার আগে শিখিয়ে দেবো কি না।' মেণ্ডক ও ধনঞ্জয় দু'জনেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন।

১৬

প্রত্যূষ। স্নিগ্ধ আকাশ। স্নিগ্ধ বাতাস। শ্রীমতীর গৃহ থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে চণক। কাল মধ্যরাতে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথগুলি তাই ভিজে। বেশির ভাগ বিপণিই এখনও খোলেনি। পথ ঝাঁট দিতে শুধু বেরিয়ে পড়েছে কিছু পথমার্জক। রাতের প্রহরা সেরে গৃহে ফিরছে নগরদ্বারিকরা, নগররক্ষকরা। সারা রাত আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে কিছু রসিক ব্যক্তিও এখন ঈষৎ লাল চোখে, বিস্রস্ত বেশবাসে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কোনও কোনও পানাগারের বোধ হয় বিশেষ অনুমতি নেওয়া আছে। সারা রাতই মনে হয় খোলা থাকে। ওখানে থাকে দ্যূতক্রীড়ারও ব্যবস্থা। একটি দীর্ঘদেহী, অত্যন্ত কৃশকায় রুগ্ণ আকৃতির ব্যক্তি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে এলো। দেখেই বোঝা যায় পাশা খেলায় যা-যা পণ রেখেছিল সবগুলিই হেরে গেছে। বোধ হয় সর্বস্বান্ত। এদের তক্ষশিলাতে যেমন দেখা যায়, তেমন রাজগৃহেও দেখা যায়। অসংযমের রূপ সর্বত্র এক। আজ সন্ধ্যাতেই আবার এ ফিরে আসবে, আবার ঋণ নেবে, নিয়ে পণ রেখে খেলবে, হয়ত সামান্য কিছু জিতবে। কিন্তু হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চণক ঘোড়ার গতি দ্রুততর করল। তার লক্ষ্য গৃধ্রকূট। এরা বলে গিজ্ঝকুট। বড় প্রিয় স্থান চণকের। নির্জন। সহজে ওপরে ওঠা যায়। বৈপুল্ল পর্বত বহু বিস্তৃত এবং উঁচুও খুব। বৈভারে তপোদারামগুলি থাকায় রোগীর ভিড় হয় খুব। ইসিগিলি বা ঋষিগিরিতে কয়েক পা অন্তর অন্তরই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের কুটী। তাই গিজ্ঝকুটই চণকের প্রিয় পর্বতশিখর।

পর্বতমূলে পৌঁছবার পর তার মনে হল ঘোড়াটিকে নিয়েই কি কিছুদূর ওঠা যায় না ? ঘুরে ঘুরে ঘোড়া নিয়ে ওপরে ওঠবার পথ অন্বেষণ করছে, এমন সময়ে পেছনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। চকিত হয়ে পেছন ফিরে চণক দেখল একটি অশ্বারোহী সৈনিক। বুকে বর্মজালিকা আঁটা। মাথায় করোটিকা শিরস্ত্রাণ। বেশ সযত্ন রক্ষিত দাড়ি এবং দীর্ঘ পাকানো গোঁফ। চণকের কাছাকাছি এসে অশ্বারোহী একটি বড় গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হয়ে গেলে অশ্বারোহী বলল, 'এ পাহাড়ে অশ্ব নিয়ে আরোহণ করা সমীচীন নয় ভদ্র।'

চমকে ভালো করে তাকাল চণক অশ্বারোহীর দিকে। তারপর নত হয়ে বলল, 'নমস্কার মহারাজ। একেবারে উষার প্রথম লগ্নেই রাজদর্শন ! দিন যাবে ভালো।'

'তুমি আমার ছদ্মবেশ ভেদ করে ফেললে ? এত সহজে ?'

'মাত্র কিছুকাল আগেই আমি গান্ধারের মহামাত্রর কাছে তিরস্কৃত হয়েছি ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারিনি বলে। আজ এখানে থাকলে তিনি সুখী হতেন, অধীনস্থ অমাত্যের কিছু উন্নতি হয়েছে দেখে। কিন্তু মহারাজ আপনি বোধ হয় ছদ্মবেশ অন্তত আমার কাছে গোপন করতে চাননি। না-হলে কণ্ঠস্বরের কথা চিন্তা করতেন।'

বিম্বিসার বললেন, 'আচার্যপুত্র, ছদ্মবেশ তোমার কাছ থেকে গোপন করতে চাইনি এ কথা সত্য। কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পর্কে খুব একটা সতর্কতা আমি কখনওই অবলম্বন করি না। এত শ্মশ্রু-গুম্ফ, মুখ এবং দেহের বর্ণ বদল তার পরেও কণ্ঠস্বর বদলাতে হবে ভাবি না তো !'

চণক নিজের ঘোড়াটিকে বেঁধে ফেলে বলল, 'কণ্ঠস্বর একটি অব্যর্থ নির্ণয়-চিহ্ন। চরেরা কণ্ঠস্বরের চর্চা অর্থাৎ কথনভঙ্গি এবং স্বর-শ্রবণ দুটোই অবশ্য শিক্ষিতব্য বলে মনে করে।'

'হবে', বিম্বিসার বললেন, 'আমার ছদ্মবেশ গ্রহণের প্রয়োজন কমই হয়। যখন হয়, মৃদু স্বরে কথা বলা ছাড়া আর কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি এতদিন। আচ্ছা চণকভদ্র, গান্ধার রাজ্যে কি চরশাস্ত্র খুবই উন্নত ?'

চণক বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ। গান্ধার রাজ্যে অন্তর্কলহ অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে সক্রিয়। কাশ্মীর, মদ্র, ইত্যাদি সন্নিহিত অঞ্চলগুলি থেকে সব সময়ে অতিকুশলী চরেরা যাতায়াত করছে, এতটুকু ফাঁক পেলেই এইসব রাজ্যগুলি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মদ্র না হয় ভিন্ন রাজ্য, কিন্তু কাশ্মীর তো গান্ধারের অন্তর্ভুক্তই। তবু এই অবস্থা ! ওদিকে অসুর, সুমের, পারস্য দেশ থেকে উপরিশ্যেন পর্বত পেরিয়ে বণিকরা যেমন আসে, তেমন আসে চরেরাও। আমি আগেই বলেছি আপনাকে, পারস্যরাজ কুরুস এদিকে লুব্ধ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তাঁর ধারণা এই দেশের মাটিতে সোনার রেণু মিশে আছে। সোনার লোভ বিষম লোভ। এদিকে আবার গান্ধার রাজসভায় অমাত্যদের মধ্যে সবসময়ে একটা ক্রূর প্রতিযোগিতা চলে— এতে অংশ নেন অন্তঃপুরিকারাও। অমাত্য পদ ওখানে একরকম পুরুষানুক্রমিক। রাজার ইচ্ছে থাকলেও নতুন কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে পারেন না।... সত্যি কথা বলতে কি রাজার চেয়ে অমাত্যদের ক্ষমতা বেশি। অতএব...'

বিম্বিসার বললেন, 'চলো আচার্যপুত্র আরও ওপরে যাই। এখানে আমাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে না। শুধু ভদ্র বলো।'

কিছুক্ষণ পর চণক বলল, 'কোনও বিশেষ কাজে বেরিয়েছেন না কি ভদ্র ?'

'না। আজ শুধু মুক্তি। মুক্তির জন্য বেরিয়েছি। আজ সারা দিন ঘুরে বেড়াব। মিশে যাব রাজগৃহের নাগরিকদের সঙ্গে। এই মাত্র।'

চণক লক্ষ করল দু'জন সামান্যবেশী ব্যক্তি, তার পরে আরও দু'জন অনেক দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে আসছে। সে নিশ্চিন্ত হল।

একটি চত্বালের মতো স্থান বেছে বসলেন বিম্বিসার, পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন চণককে। চণক সামান্য নিচে যথাসম্ভব নিকটত্ব রক্ষা করে বসল। বিম্বিসার দুঃখিত মুখে বললেন, 'রাজাদের কি বয়স্য পাওয়ার অধিকার নেই, চণকভদ্র ?'

চণক মৃদু স্বরে বলল, 'বয়সেও তো আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। সামাজিক স্তরভেদ মেনে চলা ভালো মনে করেছিলাম ভদ্র, আর কিছু নয়।' সে উঠে রাজার পাশে গিয়ে বসল।

রাজা বললেন, 'তুমি কি গান্ধার দেশের জন্য খুব চিন্তিত ?'

'শুধু গান্ধার নয়, আমি সমগ্র উদীচ্য, মধ্যদেশ, প্রাচীর জন্যও চিন্তিত ভদ্র। গান্ধার হল সীমান্ত। এই সীমান্ত অতিক্রম করে যদি পারস্যরাজ কুরুসই বলুন, কি অসুররাজই বলুন কিংবা সমুদ্রপারের যবনরাই বলুন— একবার এসে পড়ে, এই ছিন্নভিন্ন অগ্রথিত রাজ্যগুলির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা যতই ভিন্ন হই, আমাদের আকৃতি, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধ্যানধারণা মোটের ওপর একই। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে গঙ্গা-যমুনা, অচিরবতী সরযূতীরে ছড়িয়ে পড়েছি আমরা। কিন্তু উপরিশ্যেন পর্বতের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের ভাষা, পরিধেয়, ভাবনা-ধারণা একেবারেই অন্য। আমার বিচারে আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের শস্য, আমাদের খনিজ, আমাদের বিদ্যার আদানপ্রদান করতে পারি, কিন্তু বিজেতা হিসাবে যদি তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিই, তা হলে সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিবাসী তাদের দাস হয়ে যাব। কেউ বাদ যাব না। গান্ধার কাম্বোজ যেমন বাদ যাবে না, তেমনি বাদ যাবে না চেদি-মৎস্য, কুরু-পাঞ্চাল, কাশী-কোশল, অঙ্গ-মগধ, বজ্জি-মল্ল। কেউ না, কেউ না। গান্ধার-কাশ্মীর-মদ্র কুটিল, স্বার্থান্ধ, অমাত্যে পূর্ণ, তারা স্বার্থের বশে অনেকেই হয়ত বিপক্ষে যোগ দেবে। তবে তারাও রক্ষা পাবে না।'

বিম্বিসার খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'আচার্য দেবরাতও আমাকে বলেছিলেন চক্রবর্তী রাজা হও। তখন আমি সতের-আঠার বছরের কিশোর মাত্র। কিন্তু তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন, একবার তাকালেন বহুদূরপ্রসারী দিগন্তরেখার দিকে। বললেন মাঝখানে মেরুপর্বত তার চারপাশে অকূল বারিধি। সেখানে চতুষ্পত্র ফুলের একটি পাপড়ির মতো ভাসছে জম্বুদ্বীপ। আরও তিনটি পাপড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র, এই দ্বীপের পেছন দিকে আবারও অথই সমুদ্রের ওদিকে চক্রবাল। উত্তরকুরু দ্বীপে কেউ যেতেও পারে না, সেখান থেকে কারও আসার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু অপর গোদান ও পূর্ববিদেহ থেকে জম্বুদ্বীপে কালক্রমে সাম্রাজ্যপিপাসুরা আসবেই। তার আগে জম্বুদ্বীপকে একত্র হতে হবে। তুমি সেই চক্রবর্তী রাজা হও, যে জম্বুদ্বীপকে রক্ষা করবে। আমার এখনও তাঁর প্রতিটি কথা স্পষ্ট মনে আছে, চণক। এখন চণক তুমি বলো এই জম্বুদ্বীপ কী ? এই প্রাচী, মধ্যদেশ ও উদীচী, নাকি উদীচীরও ওদিকে যে বহ্লীক দেশ, বখত্রি আছে— এরাও, এমন কি সুমের বা অসুররাজ্যও। আর বিন্ধ্যপর্বত, বিন্ধ্যই কি এই দ্বীপের দক্ষিণ সীমা ?'

চণক বলল, 'না, বিন্ধ্য কখনও জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ সীমা হতে পারে না। হিমবানের মতো বিন্ধ্য দুরতিক্রম্য নয়। বহ্লীক বা বখত্রি দেশ কিন্তু বেদ অনুসরণ করে না কোনদিন, সুতরাং আমাদের বর্তমান অবস্থায় গান্ধার, কম্বোজ, কাশ্মীরের পশ্চিমে যে সব দেশ আছে তাদের সম্পর্কে আমার কোনও আত্মীয়বোধ নেই।'

বিম্বিসার হেসে বললেন, 'চণক কি খুব গোঁড়া বেদপন্থী নাকি ? যাগ-যজ্ঞ, সাম গান, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন ? বেদই যদি আমাদের মানদণ্ড হয় তা হলে কিন্তু মধ্যদেশ ক্রমশই অ-বৈদিক হয়ে যাচ্ছে, আরও পূর্বের তো কথাই নেই। এ অঞ্চল তো তা হলে জম্বুদ্বীপ হলো না !'

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। তবে বেদ-পন্থা বলতে আমি কিন্তু শুধু যাগ-যজ্ঞই বোঝাচ্ছি না। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আগে দিই। না। চণক যাগ-যজ্ঞে সেভাবে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ করলেই সমৃদ্ধি হবে, সন্তান হবে, দেবতারা তুষ্ট হবেন, পিতৃপুরুষ সুখী হবেন—ঠিক এইভাবে আজকাল বিশ্বাস করতে পারছি না ভদ্র। এ কথা সত্য। কারণ দেখুন, সোমযাগের মতো ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ সময়ের যজ্ঞ তিন পুরুষের মধ্যে একবার তো করতেই হয়, কিন্তু, করলে যজমানের ধনক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি

নেই। যজ্ঞের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে যদি কিছু লাভ হত, যেমন পুত্রেষ্টি যাগের ফলে যদি পুত্র হত তা হলে নিয়োগ-প্রথার প্রয়োজন হত না, ধর্ম-নাটকেরও প্রয়োজন হত না। চিন্তা করুন নিয়োগ প্রথায় স্বামী অথবা শ্বশুরকুলের জ্যেষ্ঠরা নিজেরাই একজন অপর পুরুষকে নিযুক্ত করছেন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য, আর ধর্ম-নাটক প্রথায় নিয়োগ পর্যন্ত করছেন না, পত্নীকে অথবা পত্নীদের স্বচ্ছন্দ-বিহারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। কোন্ প্রকৃতির মানুষের ঔরসে সন্তান জন্মালো তা নিয়ে পর্যন্ত চিন্তা নেই। এই হীন পন্থা না ধরে একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেই তো পারতেন এঁরা। করেন না কেন?' বলে চণক থামল, সে মহারাজের কাছ থেকে উত্তর আশা করছে।

কিছুক্ষণ পর সে-কথা বুঝে বিম্বিসার বললেন, 'ঠিক কথা। অর্থাৎ এঁরা অন্তর থেকে ইষ্টি-যাগে বিশ্বাস করেন না।'

'তার চেয়েও বড় কথা,' চণক বলল, 'এই সব পুরুষরা স্বীকার করে নিচ্ছেন তাঁদের পুত্র-উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। পত্নী নির্দোষ। তাঁরা নিজেরাই হীনবীর্য। পুরুষের শুক্র, নারীর শোণিত মিললে তবেই তো সন্তান জন্ম হবে, পিতা যদি হীনবীর্য বা বীর্যহীন হন্ তাহলে?'

বিম্বিসার চমকিত হয়ে বললেন, 'তোমার যুক্তি তো অব্যর্থ চণক? তা হলে!'

'হ্যাঁ, ভদ্র, বহু পুরুষই জন্মগত কারণে বা অসংযমের ফলে বীর্যহীন হয়ে থাকে সেইজন্যই তাদের সন্তান হয় না, কিন্তু সে কথা আড়াল করে তারা এবং তাদের সমাজ অক্ষমতার দায় তার পত্নীর ওপর চাপিয়ে দেয়। পরের পর পত্নী ত্যাগ করে, বিবাহ করে একটার পর একটা

'আর দেবতা? শ্রৌত যজ্ঞে যে দেবতাদের আবাহন করা হয়

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'আমার মনে নানা সংশয় ভদ্র, সব

পরিষ্কারও হয়নি এখনও। বলতে সাহস পাই না

'অভয় দিলে ?'

'অভয় দিলে বলতে পারি দেবতাদের অস্তিত্বে সেভাবে আজকাল যেন বিশ্বাস হয় না। কে বলুন তো এই ইন্দ্র ? যিনি গৌরব করে বলছেন আমি সালাবৃক দিয়ে যতি অরুর্মুখদের ভক্ষণ করিয়েছি, যিনি বলছেন মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহা পাতক করলেও তাঁর ভক্তের মনে কোনও অনুশোচনা বা দুঃখ হবে না ! এই অতিরিক্ত সোমপায়ী দেবতাকে তো আমার একজন অত্যাচারী রাজা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। মানুষ রাজার যে দশবিধ কৃত্য আছে দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব, তপঃ ও অবিরোধন—এগুলির একটাও কি এই দেবতাদের রাজা পালন করেন ? মানুষ রাজারা যদি ইন্দ্রের মতো সোমপায়ী, ক্ষমতালিপ্সু, পরদারগামী, ক্রোধী, হিংসক, কুটিল, বিশ্বাসঘাতী হন প্রজারা তো বিদ্রোহী হবে, অমাত্যরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাঁকে অপসৃত করতে চাইবে সর্বস্তরের প্রজা। চাইবে না ? বলুন ?'

বিম্বিসার হাসলেন, বললেন, 'অবশ্যই। তবে এ একটা আদর্শ। আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে কি আমরা সবাই পারি ? পারি না !'

'আমি আদর্শের কথাই বলছি মহারাজ। দেবতারা তো আদর্শেরও আদর্শ।'

'মহারাজ নয় ভদ্র। আমি এখন একজন শ্মশ্রুবিলাসী সৈনিক মাত্র।' বিম্বিসার তাঁর দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন।

'ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।' হেসে চণক বলল, 'এ ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের কথাও ভাবুন। অগ্নি অনলের দেবতা, বরুণ জলের দেবতা, আদিত্য সূর্যের দেবতা, এই অগ্নি বা জল ইচ্ছামতো নষ্ট করে দিতে পারে জনপদের পর জনপদ, আবার আমাদের কাজেও লাগে, অর্থাৎ এরা বস্তু। সূর্য প্রতিদিন উদিত হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাও তাই। এরাও যদি বস্তুপিণ্ড হয় ভদ্র ! সুন্দর ! অপরূপ সুন্দর ! মহাশক্তিধর ! কিন্তু নিজেদের ওপর এদের কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে কি ? আপনি প্রার্থনা করে, তপস্যা করে, যজ্ঞ করে অগ্নিকাণ্ড থামাতে পারবেন ? আপনাকে জলের সাহায্য নিতে হবে। বন্যা থামাতে পারবেন ? আপনাকে নদীর পাড় উঁচু করতে হবে ! অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি থামাতে পারবেন ? সূর্যকে রাত্রে এবং চন্দ্রকে দিনের বেলায় উদিত করতে পারবেন ? যতই যজ্ঞ করুন !'

বিম্বিসার নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন, মুখে মৃদু হাসি, বললেন, 'তুমি তা হলে যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস কর না, দেবতাদের প্রতিও তোমার আস্থা নেই। এমন কি তাদের অস্তিত্ব নিয়েও তোমার মনে সংশয় ! কেমন ?'

চণক বলল, 'আপনি হাসছেন ?'

'হাসছি এই কারণে যে, তোমার কথার সঙ্গে আরও কারও কারও কথার মিল খুঁজে পাচ্ছি। বিশেষত তথাগত বুদ্ধর। তুমি কি তথাগতকে দেখেছো চণকভদ্র ? তাঁর দেশনা শুনেছ ?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি।' চণক বলল, তার ভিক্ষু অস্সজির কথা মনে পড়ল, সে জোর করে তাঁর কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাগ-যজ্ঞে সেভাবে বিশ্বাস না করলেও আমি কিন্তু শ্রমণ গৌতমের মতো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না এগুলো।'

'বিশ্বাস করো না, অথচ উড়িয়ে দিতেও পারো না ? আশ্চর্য !'

আশ্চর্য নয় ভদ্র, ভেবে দেখুন যাগ-যজ্ঞ কিন্তু খানিকটা সমাজ-উৎসবের মতো। বড় আকারের সত্র হলে বহুদিন ধরে বহু লোকের সঙ্গে মেলামেশা চলে। ছোটখাটো ইষ্টিযাগ বা পশুযাগ হলেও পরিবারবর্গ, জ্ঞাতিকুটুম্ব এঁরা একত্র হন। কিছু সৎ-চিন্তা করেন। শুচিতা, পবিত্রতা রক্ষা করে চলেন। এর মূল্য নেহাত কম নয়। সামাজিক বিধিমাত্রেই তো কৃত্রিম। সমাজের স্থিতির জন্য কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হয়। আজ যদি আপনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, পুনরাভিষেক বা ঐন্দ্রাভিষেকের আয়োজন করেন, তা হলে তা কৃত্রিম একটি সমাজবিধি হলেও গান্ধার, কম্বোজ, কুরু-পাঞ্চাল, অবন্তী, মিথিলা সব স্থান থেকেই তো রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং নানান বৃত্তির মানুষ আসবেন, মনে করুন কুরুরাজ জনমেজয়ের মহাযজ্ঞের কথা। সেই উপলক্ষে পুরাবৃত্ত, রাজবংশগুলির উদ্ভব, এমন কি বিভিন্ন জনপদের উদ্ভব নিয়েও কত জ্ঞান, কত বিদ্যার আদানপ্রদান হয়েছিল। হয়নি ? এটাই লাভ। বহুজনের কথা জানা, তাদের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, এটাই লাভ।'

'চণক, তুমি কি আমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ছল করে জম্বুদ্বীপকে মগধের রাজচ্ছত্রের তলায় আনার পরামর্শ দিচ্ছ ?'

চণক একটু আশ্চর্য হল। তারপর হেসে বলল, 'আপনার তাই মনে হল ? কিন্তু এ অতি পুরনো উপায়। এখন সময় বদলে গেছে। সময়ের পদধ্বনি শুনতে পান ভদ্র ? সমাজকে বাঁধার জন্য, তার অভ্যাস নির্মাণ করার জন্য যাগ-যজ্ঞ ছোট আকারে থাকে থাকুক। কিন্তু রাজাদের বোধ হয় এখন আর মহাসত্র করবার সময় নেই। চতুর্দিকে রাষ্ট্রগুলি অস্থির হয়ে রয়েছে। নিশ্চিন্তে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম করার সময়ই এ নয়। অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতে হবে।'

বিম্বিসার বললেন, 'তুমি হয়ত জানো, হয়ত জানো না, আমার এক মহিষী বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করে আমার কুল উজ্জ্বল করেছেন। তিনি এখন ভিক্ষুণী। আমি নিজেও উপাসক। তথাগত বুদ্ধ, যাঁকে তুমি শ্রমণ গৌতম বলে উল্লেখ করলে তাঁকে আমি আমার দেখা সব মহামানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। মুখে অবশ্য তা প্রকাশ করি না, আরও অনেক শ্রমণপন্থের তপস্বী আছেন, তাঁদেরও আমি দান করি, তাঁদেরও উপদেশ শুনি। বেদপন্থীদেরও আমার রাজ্যে কোনও অনাদর নেই। কিন্তু পশুযজ্ঞে আমার আর ভেতর থেকে সম্মতি আসে না। ধর্মের নাম করে পশুবধ ! নাঃ সে আমি আর পারি না।'

'আমি আপনাকে পশুমেধ করতে বলছি না মহারাজ।'

'কিন্তু মনুষ্যমেধ করতে তো বলছ ? চক্রবর্তী রাজা হতে হলে তো যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ মানেই নরমেধ ? নয় ?'

'তা সত্যি। কিন্তু সেভাবে নরমেধ কি আপনি করেন না ? চোর, দস্যু, রাজদ্রোহী, ব্যভিচারিণী, এদের মহাদণ্ড দেওয়া হয় না ?'

'তারা তো অপরাধী ? অপরাধের শাস্তি ভোগ করে।'

'প্রত্যন্ত প্রদেশে যখন বিদ্রোহ দমন করতে যান ?'

'সে-ও তো রাজদ্রোহ !'

'যদি আপনার রাজ্য আক্রান্ত হয় ?'

'তা হলে শত্রুবধ করব।'

'শত্রুই হোক, রাজদ্রোহীই হোক, অপরাধীই হোক, সবাই-ই মানুষ। কোনও না কোনও প্রকারে মানুষমেধ আপনি করেই যাচ্ছেন। করতেই হচ্ছে !'

'শোনো চণক, তুমি যত কুযুক্তিই দেখাও, যত উত্তেজিতই করো, দীর্ঘদিন অঙ্গরাজ্য জয় করবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছি। আবার যুদ্ধের কথা আমি ভাবতে পারছি না।'

চণক হেসে বলল, 'আপনাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করছি না মহারাজ। খালি পিতার আশীর্বাদ সফল করে রাজ-চক্রবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করছি।'

'যুদ্ধ না করে, যজ্ঞ না করে কীভাবে সেটা হওয়া সম্ভব, চণক ?'

'সে কথাই অবিরত ভেবে যাচ্ছি। তক্ষশিলা থেকে মগধ আসতে আসতে অবিরত ভেবেছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে যুদ্ধ এখন অবান্তর মনে হয়। কিন্তু যুদ্ধ না করেও একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিপতি কি হওয়া যায় না ? একটু ভাবুন তো মহারাজ ! আর কোনও পথ...'

এই সময়ে চণক দেখল মহারাজ হঠাৎ যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখল একজন পীতবাস পরা ভিক্ষু, খুবই দীর্ঘদেহী এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশান্ত মুখ, খুব দ্রুত উঠে আসছেন। এত দ্রুত উঠে আসছেন অথচ সেই তাড়াটা যেন তাঁর চলনে বা আঁকারে ধরা পড়ছে না। মহারাজ অস্ফুটে বললেন, 'ভগবান তথাগত।'

চণক বলল, 'মহারাজ, আপনি কিন্তু ছদ্মবেশে আছেন। ভুলে যাবেন না।'

'না, ভুলব না, কিন্তু তুমি যাও চণক, উনি কার্তিকী পূর্ণিমার পর যে-কোনদিন যে-কোনও দিকে বেরিয়ে পড়বেন। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না।' বিম্বিসার দ্রুত একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গৌতম উঠে এলেন। তারপর চণকের পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। চণক চলল তাঁর পেছন পেছন। কিছুটা যাওয়ার পর সে ডেকে বলল, 'ভদন্ত, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?'

'আমি কিছু খুঁজছি না ব্রাহ্মণ; আমি পেয়েছি,' সংক্ষেপে বললেন গৌতম, একটু পরে বললেন, 'আমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছি, গিজ্‌ঝকুটের ওপর দিকে একটি চাতালের মতো সমতল স্থান আছে, সেখানেই।'

'আমি সঙ্গে গেলে আপনার অসুবিধে হবে, ভদন্ত?'

'আমার কিছুতেই সুবিধা বা অসুবিধা হয় না আয়ুষ্মন, তুমি আসতে পারো।'

দীর্ঘ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শ্রমণ মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। চণক ভাবল, ইনি যে দেখি, হাঁটার পরীক্ষায় সবাইকে পেছনে ফেলে দিতে পারেন। অদ্ভুত ক্ষিপ্র তো!

অবশেষে তিনটি শিলার মধ্যবর্তী একটি সমতল স্থানে পৌঁছে গৌতম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চণক দেখল পাহাড়ের নানা পাথরের মধ্য দিয়ে দিয়ে একটি বৃদ্ধ এবং একটি তরুণ উঠে আসছে।

তারা পৌঁছতে গৌতম বললেন, 'কেমন ব্রাহ্মণ, এই স্থানটির কথাই বলছিলেন তো?'

বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই স্থানই বটে সমন, আমার এই পিতৃপোষক সুপুত্র পিতার বড় বাধ্য।' তিনি তরুণটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, 'আর কোনও পুত্র আমার দেখাশোনা তো করেই না, কেউ আমার কথায় কানই দিল না। বুঝলে গোতম আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। বৃদ্ধ হয়েছি কখন পুট করে মরে যাব, আর এরা অমনি কোনও অপবিত্র শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আমার অগ্নিক্রিয়াটি করবে। এত সম্পদ আমার, অগ্নিহোত্র রক্ষা করে চলেছি শ্রদ্ধায়, চিরকাল প্রত্যেকটি দর্শযাগ, পূর্ণমাস-যাগ করে এসেছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে শত শত গাভী দান করেছি। এত পুণ্য, তা সত্ত্বেও হয়ত এইটুকুর জন্য অক্ষয় স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হব।'

গৌতম বললেন, 'ব্রাহ্মণ, শ্মশান কীভাবে পবিত্র বা অপবিত্র হয় তা আমায় বলুন।'

'তুমি তো কিছুই মানো না,' ব্রাহ্মণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তোমায় কী বোঝাবো? শ্মশান এমনিতেই অতি অপবিত্র স্থান। হীন জাতির লোককে দাহ করলেই সে শ্মশান আরও অপবিত্র হয়ে যায়। এই বৃষলেরা মরেও আমাদের শান্তি দেবে না। আমার পুত্র তো খুঁজে খুঁজে কোনও শ্মশান পেল না নগরে যেখানে কোনও চাঁড়াল, কি নিষাদ, কি পুক্কুস দাহ হয়নি। ওর প্রশ্ন শুনেই তো শবদাহক চাঁড়ালগুলো হা-হা করে হাসে, বলে কি জানেন? "অরে ব্রাহ্মণ, এইখানে চিতার ওপর যেমন বাঁশের বাড়ি দিয়ে [illegible]-[illegible]র মাথা ফাটাই, বামুন পুরুতের মাথা ফাটাই, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের মাথা ফাটাই, তেমনি চাঁড়ালদেরও মাথা ফাটাই। তফাত তো কিছু রইল না। নিজে মরলেও এই শ্মশানেই পুড়বো, আমার ভাইয়ের পুত হয়ত আমার মাথাখানা ফাটাবে!"'

চণকের হাসি পেল, সে দেখল ব্রাহ্মণের তরুণ পুত্রটি অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌতম বললেন, 'আপনিই উপসাঢ় পণ্ডিত না?'

'হ্যাঁ ইনিই।' পুত্রটি এবার সসম্ভ্রমে বলল।

'আপনারা তো অগ্নিকে খুব মানেন। অগ্নি সব শুদ্ধ করে দেন না?' গৌতম বললেন।

'তা দেন। কিন্তু পরিবেশটিও তো দেখতে হবে! এমনিতেই তো শ্মশান মানেই নোংরা, এখানে নর-কপাল, ওখানে পায়ের হাড়, সেখানে শৃগালের উচ্ছিষ্ট পড়ে রয়েছে। এরূপ স্থানে দাহ হবার কথা ভাবলেই আমার হৃৎকম্প হয়।'

'আপনার মৃত্যুর পর তো আর হৃদয় কম্পিত হবে না আর্য!' গৌতম বললেন।

'রসিকতা ছাড়ো শ্রমণ। হীন জাতির শব যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমি কিছুতেই দাহ হবো না। না! না! সে আমাকে শ্মশানশুদ্ধিক বলে হাসাহাসিই করো আর যা-ই করো।'

'না, না, আমি হাসিনি,' গৌতম বললেন, 'কিন্তু কোনও হীন জাতি মরেনি, এমন স্থান তো রাজগৃহে কেন, সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না ব্রাহ্মণ উপসাঢ়!'

'সে আবার কী? এই গিজ্‌ঝকুটের শিখরেও কোনও বৃষল মরেছে নাকি?'

'ব্রাহ্মণ আপনি নিজেই এই স্থানে অন্তত চতুর্দশ সহস্রবার ভস্মীভূত হয়েছেন। প্রত্যেকবার আপনি ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন না। এ স্থান অনুচ্ছিষ্ট নয়। এ পৃথিবীর আকৃতি কল্পে কল্পে বদলে যায়। এ কল্পে যা তপোভূমি, পরের কল্পে তা আমকশ্মশান, তার পরের কল্পে হয়ত তা বিষ্ঠাক্ষেত্র। ভো ব্রাহ্মণ, পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান নেই যা কখনও না-কখনও নর-কপালে আবৃত হয়নি। আর মৃত্যুর পূর্বে সেই সব মৃতদেহ হীন জাতির ছিল কি উচ্চ জাতির ছিল অগ্নি তাদের গ্রাস করার আগে কখনও জিজ্ঞাসা করেনি, শৃগাল, শকুন এরাও জিজ্ঞাসা করে না।' বলতে বলতে গৌতম আরও উঁচুতে আরোহণ করতে লাগলেন। গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'অগ্‌গোহমস্মি লোকস্‌স। আমি বুদ্ধ, বহু লক্ষ জন্ম পার হবার পর বুদ্ধ জন্ম পেয়েছি। নৈরঞ্জনা নদীতীরে বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বহু তপস্যায়। আমি জানি। আমি দেখতে পাই। তোমাদের আগের শতাধিক জন্ম, যখন হীন জাতি ছিলে, তারও আগের আগের সহস্রাধিক জন্ম, যখন তির্যগ্‌ যোনিতে ছিলে, তারও আগের আগের লক্ষাধিক জন্ম যখন ছিলে পাথর, মাটি, বালির স্তূপ, বালুকণা মাত্র। জড়বস্তু শুধু। চৈতন্য ছিল না, মন ছিল না, প্রাণ ছিল না। বাতাসে উড়তে, জলে ভেসে যেতে, দারুণ রোদে পুড়তে। এটা শুদ্ধ ওটা শুদ্ধ নয় বলা কারও শোভে না ব্রাহ্মণ। যে বলে সে জানে না। আমি জানি।'

সূর্য সেই সময়ে গৌতমের পেছনে ঠিক তাঁর পায়ের কাছে অবস্থান করছিল। গৈরিক সংঘাটিতে আবৃত দেহের তলার দিকটা দেখাচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মতো। ওপর দিকটা দীর্ঘ একটি দীপশিখার মতো জ্বলছিল। তাঁর কথাগুলি যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে চণক এবং অন্য দু'জনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল। উপসাঢ়ের তরুণ পুত্রটি গভীর সম্ভ্রম ও ভক্তিতে তাঁর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জানু মুড়ে বসে পড়ল, বলল, 'আপনি মহামানব, আমরা জানি না, বুঝি না। আমাদের সত্য পথে নিয়ে চলুন ভগবন। আমার এই পিতা বহু বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারি উনি আসলে মূঢ়, মূর্খ। ওঁর মৃত্যুর সময় হয়ে এলো। আপনি ওঁর চোখের সামনে থেকে অজ্ঞানের তমঃ অপসারিত করুন। শুদ্ধিবায়ুগ্রস্ত বলে ওঁকে পরিত্যাগ করবেন না।'

মশা ?

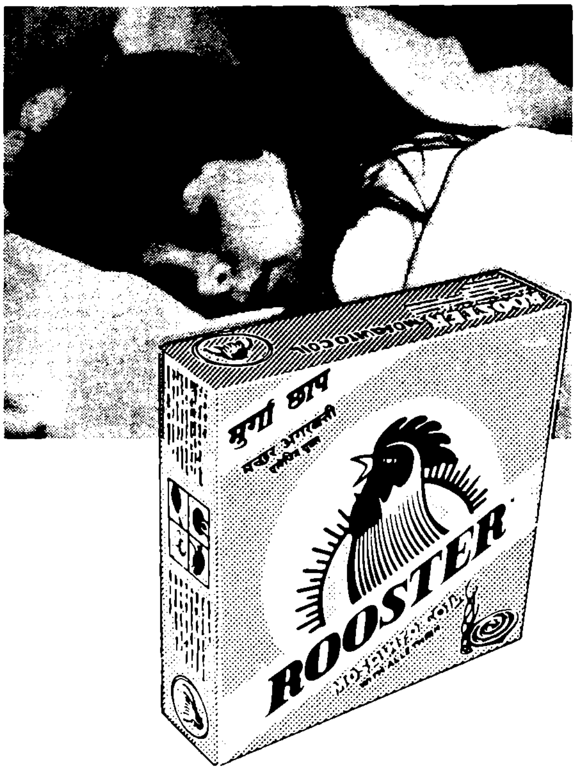

আপনার রাতের সুনিদ্রা
নিশ্চিত করতে আনুন

রুস্টার

অ্যালেথ্রিন যুক্ত মশার ধূপ

উৎপাদক :
সান-আপ বোটানিক্‌স প্রা : লি :
৭৮৮/১, জি.আই.ডি.সি., ভাপি, গুজরাট

RADEUS/SB/837/2/93/BEN

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিও কখন জোড় হাতে বসে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটি বোজা। গালের লোলচর্মের ওপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। গৌতম দাঁড়িয়ে আছেন শিখরে। তাঁর হাত দুটির একটি ওপরে একটি নিচে যেন অভয় দিচ্ছে। তিনি চেয়ে আছেন ওই দুই ব্রাহ্মণের দিকে। কিন্তু চণক বুঝতে পারল উনি এখন ধ্যানস্থ। কনকচাঁপার গুচ্ছের মতো দেখাচ্ছে তাঁর উর্ধ্বাঙ্গ। কখনও নিষ্কম্প দীপশিখা। এদিকে সূর্য পেছনে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ছায়াময় হয়ে যাচ্ছে গৌতমের জানুদেশ, কখনও কটি, কখনও বক্ষোদেশ, তারপর তাঁর গ্রীবা ছুঁয়ে ঠিক মাথার পেছনে অবস্থান করতে লাগল সূর্য। কিন্তু চণক দেখল গৌতমের মুখটিতে ছায়া পড়েনি। যেন সম্মুখ থেকে অন্য কোনও দীপ্ততর সূর্য তাঁকে উজ্জ্বল রেখেছে। দেখতে দেখতে চণক বুঝতে পারল, এ সূর্য গৌতমের ভেতরের। এবং গৌতমের মধ্য থেকে সেই প্রভা তাঁর আর ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছে। সেই সেতু বেয়ে ওই প্রভা গৌতমের শির থেকে প্রবেশ করছে ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্কে, হৃদয়ে। সে এই শক্তিস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে, অথচ পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে। একটা দুর্লভ সৌভাগ্য তার হলো আজকে।

দৃশ্যটিকে সামনে রেখে সে পিছু হঠতে লাগল। মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে পথ, তারপর আবার চলছে। কেন যে সে চলে আসছে সে ভাল বুঝতে পারল না। সে কী ভয় পাচ্ছে ? যেখানে মহারাজ বিম্বিসারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেখানে এসে আর তাঁকে দেখতে পেল না। সামান্য বেশে যে রক্ষীগুলি আশেপাশে ঘুরছিল তাদেরও না। তার অর্থ মহারাজ চলে গেছেন।

চণক এবার দ্রুত নামতে লাগল। এই তা হলে সেই তথাগত বুদ্ধ। বীরপুরুষের মতো আকৃতি। মুখভাবে একাধারে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং গভীর ধ্যানমগ্নতা ! কী অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় ! কেমন বললেন, "আমিই প্রথম, আমিই এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি জেনেছি।" এই উচ্চারণগুলিতে কোনও অহমিকা ছিল না। ঠিক যেন সে বলছে আমি দেবরাতপুত্র কাত্যায়ন চণক। আত্মপরিচয় দিচ্ছে। নিজের গোত্র, পিতৃনাম এবং নিজস্ব নাম জানালে কি তা অহমিকা হয় ? হয় না। এ-ও তেমনি। কিন্তু ইনি সেই স্বপ্নমগ্ন ভিক্ষু অস্‌সজির মতো নন। তিনি যেন মুগ্ধ। পৃথিবীর পরিপার্শ্ব দেখতে পাচ্ছেন না। মগ্ন হয়ে আছেন কী এক উপলব্ধির মধ্যে। গৌতম অন্যরকম। শ্যেন যেমন দৃঢ় নখে পারাবতকে ধরে, পালাবার পথ রাখে না, ইনিও তেমনি নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের প্রত্যয় দিয়ে ব্রাহ্মণ দুটিকে, তাদের ভ্রমাত্মক ধারণাগুলিকে সবলে ধরলেন। সেগুলির টুঁটি ছিঁড়ে ফেললেন যুক্তি আর জ্ঞানের তীক্ষ্ণধার নখ দিয়ে। কী রকম ক্ষিপ্রগতিতে উঠে আসছিলেন ! কীভাবে তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন। "আমি কিছু খুঁজছি না। আমি পেয়েছি।" "আমার কিছুতেই সুবিধা বা অসুবিধা হয় না আয়ুষ্মন, তুমি আসতে পারো।" কথাগুলি তার মনের মধ্যে যেন বারবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল কীভাবে গৌতম গিজ্‌ঝকুট শিখরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন কোনও মহানট। আকাশ তাঁকে পশ্চাৎপট দিল, সূর্য তাঁকে আলো দিল, বাতাস তাঁর কণ্ঠস্বরকে বেগবান, জোরালো করে তুলল। তারপর তাঁর সেই অভয়মূর্তি ! সেই দীপ্ত মুখমণ্ডল ! আচ্ছা উনি কি এই দৃশ্যটির এমন অপূর্ব প্রভাব হবে জেনেই ওভাবে শিখরে উঠে গিয়েছিলেন ! স্বস্তি উচ্চারণের ওই অদৃষ্টপূর্ব ভঙ্গি ! এটি কি জেনেশুনে আয়ত্ত করা ?

হঠাৎ চণকের মনে হল, আচ্ছা সারা রাজগৃহ এঁর ওপর ক্ষিপ্ত। ইনি স্বামীর স্ত্রী, স্ত্রীর স্বামী, পিতার পুত্র-পুত্রী, পুত্র-পুত্রীর পিতাকে কেড়ে নিচ্ছেন। ইনি এঁর শাসনে, এঁর সঙ্ঘে নাকি সবাইকে প্রবিষ্ট করাতে ব্যস্ত। সঞ্জয়ের শিষ্যদের কেড়ে নিয়েছেন। বিখ্যাত কাশ্যপভ্রাতাদের

নিজ সঙ্ঘভুক্ত করেছেন। কই, চণকের প্রতি তো এঁর কোনও আগ্রহ দেখা গেল না! ওই ব্রাহ্মণ দুটিকে উদ্ধার করবার জন্য গোটা গিজ্‌ঝকুটটাই একরকম দৌড়ে উঠেছেন, অথচ চণক, উদীচ্য ব্রাহ্মণ, গান্ধার রাজসভার অমাত্য, তাকে সঙ্ঘভুক্ত করার কোনও চেষ্টা তো করলেন না! কেন? মহাবুদ্ধিধর, তক্ষশিলার বহু পুরুষের পণ্ডিতবংশের কুলপ্রদীপ চণক, তার প্রতি শ্রমণ কোনও আগ্রহই দেখালেন না! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

রাজ-অতিথিশালার দিকে যেতে যেতে চণকের আরও মনে হল— মহারাজ বিম্বিসারের মধ্যে যেন কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে। রাজপ্রাসাদের ভোজনকক্ষে যে মগধরাজের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আর যে ছদ্মবেশী মহারাজের সঙ্গে আজ গিজ্‌ঝকুটে দেখা হল এঁরা ঠিক একই ব্যক্তি নন। সেদিন মহারাজ তাকে আত্মানুসন্ধানী কিংবা ভ্রমণপিপাসু পরিব্রাজক মনে করে হতাশ হয়েছিলেন। তারপর তার পরিকল্পনার কথা শুনে তার পরামর্শ মূল্যবান মনে করেছিলেন। আজ সেই তিনিই অভিযোগ করলেন—চণক তাঁকে যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করতে প্ররোচিত করছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ছল করে জম্বুদ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পরামর্শ দিচ্ছে। পশুহত্যা করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

চণক ভাবল আর এখানে নয়। খুব শীঘ্র বেরিয়ে পড়তে হবে। চণকের যা কাজ, তা চণকেরই কাজ। খুবই অন্যমনস্কভাবে সে অনেকটা পথ পার হয়ে অশ্বশালায় গিয়ে অশ্বরক্ষকদের হাতে চিত্তককে অর্পণ করল। সেই রকম গভীর চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে পার হল বাইরের প্রাঙ্গণ, সোপান বেয়ে উঠল, তারপর কক্ষগুলির সামনের অলিন্দ পার হতে লাগল। শ্রীমতীর গৃহে অতি প্রত্যুষে প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্তে খুব ভাল করে চন্দন-অগুরু মিশ্রিত জলে সে স্নান করেছে। এখন আর স্নানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু হাত পা শরীর মুছে ফেলার প্রয়োজন আছে। এতক্ষণ ক্ষুধাবোধ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে কিছু পান করার আশু প্রয়োজন, সঙ্গে কিছু খাদ্যও। মধ্যাহ্নভোজনের সময় কি হল? সে দাসীদের কিছু শুষ্ক ফল এবং মৈরেয় আনতে বলে নিজের ঘরের দিকে গেল।

ঢুকতেই একটি পীঠিকায় বসাআগন্তুককেদেখে চমকে উঠল চণক। মহারাজ। তিনি কোনও শীতল পানীয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছেন।

মহারাজের ইঙ্গিতে দ্বার বন্ধ করে বসল চণক। বিম্বিসার বললেন, 'আজ আমি রাজ-অতিথির অতিথি। আপত্তি নেই তো?'

চণক বলল, 'সিন্ধুনীর যখন নিজেই নিজের পূজা করতে চায়! আমি মৈরেয় আর কিছু শুষ্ক ফল আনতে বলেছি।'

'শ্রমণ গৌতমকে কী রকম দেখলে চণক?'

'আপনি কেন চলে এলেন মহারাজ?'

'পরে বলছি। আগে তুমি বলো কী রকম দেখলে?'

'ইনি একজন অতি বিরল ঋদ্ধিশালী পুরুষ, শুধু দেখাই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! আমি তো শুনলামও।'

'ধর্মদেশনা শুনলে?'

'ধর্মদেশনা? বোধ হয় না। তবে কিছু শুনলাম। মনে হল ইনি যুক্তিবাদী। পুরনো ধারণার মধ্যে যেসব কুসংস্কার প্রবেশ করেছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিতে চাইছেন। নিঃসন্দেহে মুক্ত মনের মানুষ।'

'আর কিছু?'

'মহারাজ, মুক্ত মনের চেয়ে বড় কথা, বড় গুণ আপাতত আমার কাছে আর কিছু নেই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বিম্বিসার বললেন, 'আচার্যপুত্র, তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি!'

'না মহারাজ।' চণক চিন্তিত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার মনে সংশয়। আপনিই কি আচার্য দেবরাতের সেই শিষ্য, যাঁর সম্পর্কে আচার্য তাঁর মৃত্যুকালে শেষ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন? আপনি কেন চণককে আপনার অর্থধর্মানুশাসক করতে চেয়েছিলেন তা-ও বুঝলাম না। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘন ঘন অমাত্য বদলান। সে কি তাঁদের অক্ষমতার জন্য? না, অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আপনারই অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য?'

বিম্বিসার উঠে দাঁড়ালেন, পদচারণা করতে করতে বললেন, 'চণক, কিছুদিন আমি বড় বিভ্রান্ত, বড় অসহায় বোধ করছি। বুঝতে পারছি, আমার কথাবার্তার মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না।'

চণক কোমল গলায় বলল, 'কিন্তু মহারাজ, যাঁদের কাঁধে গুরুদায়িত্ব, যাঁরা সাধারণ নন, তাঁরা তো চিরকাল একাই। এই একাকিত্ব কী করে বহন করতে হয় আজ গিজ্‌ঝকুট শিখরে শ্রমণ গৌতমকে দেখে শিখেছি।'

বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বিম্বিসার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'নারী, নারীই যত দুঃখ, যত অশান্তির মূল।'

'এ কথা বলবেন না মহারাজ', চণক সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল,'নারী আমাদের জন্ম দেয়, নারী আমাদের প্রেমতৃষ্ণা মেটায়, আমাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে, আমাদের গৃহকে গৃহ করে তোলে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারি না বলে নারী থেকে আমরা দুঃখ পাই।'

'হয়ত ঠিকই বলেছ বন্ধু চণক। কিন্তু, প্রিয়া নারী যখন একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যায়? অপমানের জ্বালাকে কৃতার্থম্মন্যর হাসিতে পরিণত করতে হয়? শূন্য বক্ষের হাহাকারকে যখন গোপন করতে হয়, অথচ পারা যায় না?'

চণক মৃদু স্বরে বলল, 'মহারাজ, পত্নী প্রব্রজ্যা নিলে দুঃখ হয়ত হতে পারে, অপমানের জ্বালা হবে কেন? আমি বুঝি না।'

'আমিও বুঝিনি, আচার্যপুত্র, কিন্তু হল। যখন তিনি কেশগুচ্ছ ফেলে দিলেন, যে সুগন্ধ, অপরিমিত কেশ কতদিন... কতদিন আমি বক্ষে ধারণ করেছি, যখন তিনি পরিত্যাগ করলেন আমার দেওয়া মহার্ঘ বস্ত্র-অলঙ্কার যা তাঁকে মাত্র কিছুদিন উপহার দিয়েছি, মনে হল যেন আমাকেই ফেলে দিলেন, আমাকেই আবর্জনার মতো পরিত্যাগ করলেন! জ্বালা হল। ভেতরে যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করছি সর্বক্ষণ। যখন আমার অন্তঃপুরে ছিলেন যথাযোগ্য সমাদর করিনি, করতে পারিনি। রাজার জীবনে অনেক বিধিনিষেধ বন্ধু, অনেক কূটনীতিতে কণ্টকিত, কিন্তু তিনি মানিনী ছিলেন। একটু সমাদর করলেই তাঁর ভেতরের সেই অভিমান ফণা তুলত। না, এসব থাক। আমি প্রলাপ বকছি।' রাজা চুপ করে গেলেন। চণক অপেক্ষা করে রইল। একটু পরে তিনি আবার বললেন, 'তুমি প্রশ্ন করছিলে না, কেন তথাগত বুদ্ধকে সামনে দেখেও চলে এলাম? এই জন্য। এই জন্য। তাঁর ঋদ্ধিতে, তাঁর অসামান্য রূপবৈভবে, গুণগ্রাম অনুভব করে মুগ্ধ ছিলাম আমি। এখনও আছি। কিন্তু হৃদয়ের সেই জ্বালা তাঁকে দেখলে এখন বেড়ে যায়। আমি সইতে পারি না। তাই তাঁর দর্শন কিছুদিন এড়িয়ে চলছি। তা ছাড়া, তোমার চোখ দিয়ে তাঁকে দেখবার, তাঁকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'কী দেখলেন মহারাজ?'

'একটি অন্য মানুষকে যেন দেখলাম। ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য মানুষ।' রাজা একটু থেমে দ্বিধামিশ্রিত স্বরে বললেন, 'চণক, যে কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারিনি, তা আজ তোমার কাছে প্রকাশ পেলো। রাজা ক্ষত্রিয় বটে। রাজ্যরক্ষার ভার তার ওপর। সেটাই তার মুখ্য দায়িত্ব। সত্য। সবই সত্য। কিন্তু রাজা তো মানুষও!'

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

(ক্রমশ)

চি ত্র ক লা

শততম বছরে মুকুলচন্দ্র দে

আর সামান্য কটা বছর বেশি বেঁচে থাকলে, গত ২৩ জুলাই মুকুলচন্দ্র দে (যিনি মুকুল দে বলেই বেশি পরিচিত), তাঁর জীবনের শততম বছরে পা রাখতে পারতেন। সেকালের পুলিশ অফিসার কুলচন্দ্র দে-র জ্যেষ্ঠপুত্র, মুকুলচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার শ্রীধরখোলা গ্রামে, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাইয়ে। স্মৃতিভারে মেদুর তাঁর এখনও শোকসন্তপ্তা বিধবা বীণা দে (ওঁদের বিয়ে হয় ১৯৩২-এ), একমাত্র কন্যা মঞ্জরী উকিল (জন্ম ১৯৩৬), জামাতা শান্তনু উকিল (শিল্পী সারদা উকিলের পুত্র) ও দৌহিত্ররা মুকুলচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের একটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তার একটি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক মুকুলচন্দ্রের আত্মস্মৃতিমূলক একটি বইয়ের প্রকাশ উপলক্ষে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে। তবে, শততম বছরের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন পরিবারের লোকেরা নিজেরাই। শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুরু তাঁর ছবির প্রদর্শনীর চেয়ে ভালো আর কি দিয়ে হতে পারে?

২৪ জুলাই বিকেলে, শান্তিনিকেতনের ময়ূরাক্ষী হোটেলের স্বল্পপরিসর উকিল-দে আর্ট গ্যালারিতে মুকুলচন্দ্রের ছোট ছোট কিছু ড্রাই-পয়েন্ট প্রিন্ট, কিছু জলরং স্কেচ, দু'চারটি ড্রইং আর দু'চারটি মিশ্রমাধ্যম ছবির একটি ছোট প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। যিনি তাঁর দশ বছর বয়ঃক্রম থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র, ১৯১৩-১৪-তে এক বছরের জন্য সেই বিদ্যালয়েরই কলাশিক্ষক ছিলেন আর ১৯৪২ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন শান্তিনিকেতনের আবাসিক, তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অন্য কোথাও হলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হত।

মুকুলচন্দ্র ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। তাঁর ভাইবোনেদের অনেকেই ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। ভাই মনীষী দে-র শিল্পশিক্ষাও অবনীন্দ্রনাথের কাছেই। আর বোন রানি চন্দ দায়িত্ব না নিলে অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হত কি না সন্দেহ আছে।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে, ১৯১১ সালে, কলকাতায় গিয়ে মুকুলচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাঁর কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন। ১৯১৫-১৬ পর্যন্ত এই শিক্ষানবিশী চলে। ১৯১৫-তে পদত্যাগ করা পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতার সরকারি চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু মুকুলচন্দ্র যে আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন এমন প্রমাণ নেই। ১৯১৫-র আগে 'বিচিত্রা' স্টুডিওরও পত্তন হয়নি। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর আতেলিয়ের সৃষ্টি হয় অনেক পরে। তাই মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে মুকুলচন্দ্র যে তালিম পান তা কোনও রকমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। মুকুল দে'র খ্যাতি প্রধানত ছাপাই ছবির শিল্পী হিসাবে। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও পাঠ যে

তিনি তাঁর ১৯১১ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত কলকাতার শিক্ষানবিশ জীবনে পেয়েছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। তিনি আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন না ; ফলে, ছাপাই ছবির জন্য সেখানে যে সুবিধা ছিল, তার সুযোগ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। চিৎপুরের মুদ্রণশিল্প ও প্রকাশনাজগতের সঙ্গে তাঁর যে কোনও যোগাযোগ ছিল তা মনে হয় না। আর 'বিচিত্রা'-র লিথোগ্রাফিক প্রেসটি তো ১৯১৭-র আগে কেনাই হয়নি। তা ছাড়া, মুকুল দে তো লিথোগ্রাফ করতেন না, করতেন ড্রাই পয়েন্ট, যা ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে ছাপা হয়, প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে নয়।

অথচ, 'কুমারটুলির ঘাটে ধানে বোঝাই নৌকা' ইত্যাদি গোটা দশেক ড্রাই-পয়েন্ট প্রিন্ট-এর রচনাকাল হিসাবে ১৯১৫-১৬ সালের উল্লেখ করা হয়। তবে কি মুকুলচন্দ্র আর্ট স্কুলের ছাত্র না হয়েও সেখানকার ব্যবস্থাদি ব্যবহার করতেন ? অথবা এমনও হতে পারে, ছবিগুলি স্কেচ হিসাবে ১৯১৫-১৬ সালে করা। সে স্কেচগুলি থেকে ড্রাই-পয়েন্ট প্রিন্ট করা হয় অনেক পরে। এমন অনুমানের কিছু কারণ আছে। ১৯১৭-১৮-তে মুকুলচন্দ্র অস্বচ্ছ জলরঙে 'তর্পণ' নামে একটি ছবি এঁকেছিলেন। তার বহুকাল পরে তিনি ওই ছবিটিই আবার এচিং-এ রিপ্রোডিউস করেন। এর থেকে মনে হয়, ছাপাই মাধ্যমের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা কিয়ৎ পরিমাণে হলেও ছিল, যান্ত্রিক রিপ্রোডাকসনের পূর্বকালীন। এই ধারণা অনুযায়ী ছাপাই ছবি হল, অন্য মাধ্যমে আঁকা ছবির প্রচারার্থ রিপ্রোডাকশন। এ ছাড়াও, প্রদর্শনীতে এমন বেশ কতকগুলি ড্রাই-পয়েন্ট প্রিন্ট দেখা গেল যে সবের রিপ্রোডাকশন বিশের আর তিরিশের দশকের 'প্রবাসী', 'মর্ডার্ন রিভিউ' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু ছাপাই ছবিতে তাদের তারিখ দেখা গেল অনেক পরের। হতে পারে, এক সময়ের করা প্লেট থেকে তিনি পরবর্তী কালে নানা সময়ে দরকার মতন ছাপ নিয়েছেন। এ ধরনের কাজকর্ম কিন্তু শিল্পের ইতিহাসের ছাত্রদের বিষম বিপদে ফেলে।

যতদূর মনে হয়, ১৯১৬-১৭-তে জাপান হয়ে মার্কিন মুলুকে পৌঁছনোর আগে মুকুলবাবুর ছাপাই-ছবির করণ-কৌশল, পদ্ধতি-প্রকরণ রীতিমতো শেখা হয়ে ওঠেনি। ১৯১৭-তে চিকাগোতে জে ব্লান্ডিং স্লোন নামে এক এনগ্রেভারের কাছে কিছু দিন শিক্ষানবিশ থাকার পর তাঁর দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ চিকাগো সোসাইটি অফ এচার্স-এর সদস্যপদ লাভ করেন। [illegible] ফিরে আবার অবনীন্দ্র-শিষ্যগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসাবে, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর নানা কাজকর্মে অংশ নিতে থাকেন। লেডি হ্যারিংহ্যামের উদ্যোগে সোসাইটির শিল্পীদের যে দলটি অজন্তা ও বাঘগুহায় গিয়ে সেখানকার ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি সব আঁকেন, মুকুলচন্দ্র সে দলের অন্যতম শিল্পী ছিলেন। ১৯২০-তে বিলেতে গিয়ে মুকুলচন্দ্র ছবি আঁকা শেখার জন্য লন্ডনের স্লেড স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হন। পরের বছর একটা স্কলারশিপ পেয়ে মুকুলচন্দ্র স্লেড ছেড়ে রয়েল কলেজ অফ আর্ট-এ ভর্তি হন। স্লেড আর রয়েল কলেজে পড়ার সময়ে মুকুলচন্দ্র স্যার ম্যুরহেড বোন ও স্যার ফ্রাঙ্ক শর্ট-এর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের কাছ থেকে এনগ্রেভিং, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, একোয়াটিন্ট প্রভৃতি যেসব ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে ছাপা যায় সে রকম ছবি তৈরির কাজ শিখতে শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি ড্রাই-পয়েন্টে ছবির প্লেট তৈরি করে, ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে তার সাদা-কালো ছাপ নিয়ে, ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক কায়দায়, মনীষীদের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি রচনা শুরু করেন। বেশির ভাগ প্রতিকৃতিই পাশ থেকে অথবা $\frac{৩}{৪}$ ভাগ প্রোফাইলে দেখা মুখমণ্ডলের। মুখ্যত রেখায় আঁকা। শিক্ষাশেষে ARCA বা অ্যাসোসিয়েট অফ দি রয়েল কলেজ অফ আর্ট এবং FRSA বা ফেলো অফ দি রয়েল সোসাইটি অফ আর্ট নির্বাচিত হন। হেভেল আর অবনীন্দ্রনাথ, উইলিয়ম মরিসের ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে সাউথ কেনসিংটনীয় কলা-শিক্ষা পদ্ধতিকে ত্যাগ করে এক বিকল্প শিল্পকলা শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, সে শিক্ষায় প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত মুকুলচন্দ্র নির্দ্বিধায় সেই সাউথ কেনসিংটনীয় কলা-শিক্ষা পদ্ধতির সমর্থক হয়ে উঠলেন।

বিলেত থেকেই তদানীন্তন ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে নিয়োজিত হয়ে, মুকুলচন্দ্র ১৯২৮-এ কলকাতার সরকারি চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ওই পদাধিকার বলে তিনি কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের চিত্রকলা সংগ্রহের রক্ষক ও জাদুঘরের অছি পরিষদের সদস্য নিয়োজিত হন। সরকারি চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়টিকে, ১৯৪২ থেকে, সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা মুকুলচন্দ্রের অন্যতম সুকৃতি। বিশ্বভারতী কলাভবন অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই ছাত্রীদের জন্য অবারিত দ্বার। ওই ১৯৪২-এই মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে, সরকারি কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে মুকুলচন্দ্র শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। শান্তিনিকেতন বাসকে ফলপ্রসূ করে, মুকুলচন্দ্র ১৯৪৬ থেকে '৫২ পর্যন্ত বীরভূম জেলা পরিক্রমা করেন। মধ্যযুগ অন্তে বীরভূমে যে সব বাংলা রীতির (চালা ও রত্ন) মন্দির তৈরি হয়েছিল, সে সবের বাইরের দেয়ালের গায়ে যেসব পোড়ামাটির ভাস্কর্যালঙ্করণ আছে (বা তখনও ছিল) মুকুলচন্দ্র তার একটি জরিপ করেন। ওই জরিপের ফল তিনি তাঁর ললিত কলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত, 'বীরভূম টেম্পল টেরাকোটা' নামে বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন। গুরুসদয় দত্ত-র পরে মুকুলচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলার শিল্পকলার এই বিশিষ্ট দিকটি নিয়ে লিখলেন। বিনয় ঘোষ, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাককচ্চিয়ন, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, তারাপদ সাঁতরা প্রমুখদের এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত মুকুলবাবুর পরে। তা ছাড়া এঁদের ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, দেশপ্রেমমূলক বিবরণের সঙ্গে মুকুলবাবুর লেখার গুণগত পার্থক্য এই যে, একমাত্র তিনিই পোড়ামাটির ভাস্কর্যের শিল্পগুণ বিচার করেছেন।

মুকুলবাবু অধিকাংশ সময়েই ছোট আকারের ছবি এঁকেছেন। অস্বচ্ছ জলরঙের ছবি আর ড্রইং যদিও-বা কখনও-সখনও একটু-আধটু বড় হয়ে থাকে (ইম্পিরিয়াল সাইজ কাগজের চেয়ে কখনই বড় নয়), ১৫″×১০″-র চেয়ে বড় তামার বা দস্তার পাতে তিনি কখনই ড্রাই-পয়েন্ট করেননি। ৪″×৪$\frac{১}{২}$″, ৫″×২$\frac{৩}{৪}$″ পাতেও তিনি ক্ষুদ্রাকারে অনেক কাজ করেছেন। ওঁর সব ড্রাই-পয়েন্টই সাদা-কালো। যে সামান্য দু-একটিতে রং দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি মিশ্র মাধ্যমের ছবি। ড্রাই-পয়েন্ট প্লেট থেকে ইনতাল্লিও পদ্ধতিতে সাদা-কালো ছাপ নিয়ে তার পরে তাতে হাতে করে জলরং দিয়ে সেসব প্রিন্টে রং ধরানো হয়েছে। অনেকটা ক্রোমলিথোগ্রাফের মতন। ফলে এগুলিকে ক্রোম-ড্রাই পয়েন্ট বলা যেতে পারে। মুকুলবাবু এচিং করেছেন খুবই কম। তামার অথবা দস্তার পাতের উপর অ্যাসিড-প্রতিরোধক একটি আস্তর লাগিয়ে, সূচিমুখ যন্ত্রের সাহায্যে সেই পাতের উপর কাজ করলে সে কাজের জায়গাগুলিতে আস্তরের স্তর ভেদ করে ধাতুপাত বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর সেই ধাতুপাতকে নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিডে ডোবালে যেখানে অ্যাসিড-প্রতিরোধক নেই, সেখানে অ্যাসিড ঢুকে ধাতুকে তক্ষণ করে। সেই প্লেটটিকে অতঃপর প্রতিরোধক মুক্ত করে, তার ক্ষয়ে যাওয়া অভ্যন্তরে কালি ঢুকিয়ে, তার পরে যন্ত্রের চাপে কাগজের উপর ছাপ নিলে, কাগজে যে ছবি পাওয়া যায় তাকে এচিং বলা

হয়। ড্রাই- পয়েন্ট করার জন্য অ্যাসিডে তক্ষণ করতে হয় না। ড্রাই-পয়েন্ট করা হয়, এনগ্রেভিং-এর মতন করে। তবে এনগ্রেভিং করার জন্য বুরিন নামে যে যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় ড্রাই-পয়েন্ট করার জন্য তার দরকার হয় না। তামার অথবা দস্তার পাতের উপর সূচিমুখ ছেদক দিয়ে পাত খোদাইয়ের কালে, ফালের দু পাশে যে ধাতুর পাড় তৈরি হয়, তা ড্রাই-পয়েন্টের রেখাকে তার বৈশিষ্ট্য দেয়। ছাপাই-ছবির সর্বমাধ্যম পারঙ্গম শিল্পী সোমনাথ হোরের মতে, মুকুলবাবুর ড্রাই-পয়েন্টের রেখা একান্তভাবে মাধ্যমের চরিত্রসম্মত। তা ছাড়া রেখার টানও বেশ সাবলীল। মুকুলচন্দ্র দু ধরনের কাজ করেছেন। এক ধরনের কাজের বিষয়বস্তু বাংলার নিসর্গে সাধারণ বাঙালি নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের টুকরো ছবি। এ সব দৃশ্য, সিনেমার ভাষায়, মিড-শট বা লং-শট দূরত্ব থেকে দেখা। বিস্বশূন্য চিত্রদেশের ভূমিকা এ সব রচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ! এগুলি অবনীন্দ্র ঘরানার ছবি। কিন্তু শিল্পগুরুর কল্পনার ছোঁয়া এগুলিতে অনুপস্থিত। আর অন্য ধরনের ছবি হল প্রতিকৃতি-বিষয়ক। যার সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

মুকুলচন্দ্র চোদ্দ বছর সরকারি চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। মনে হয়, সে সময়ে তাঁর প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব এতটাই বেশি ছিল যে তিনি শিক্ষকতার সুযোগ বড় একটা বেশি পাননি। তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে, ছাপাই ছবির শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন এমন একজনকেও তো খুঁজে পাই না। মুকুলচন্দ্রের অব্যবহিত পরের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সৌভাগ্য শফিউদ্দিন আহমেদ আর হরেন দাসের মতন ছাত্র তিনি পেয়েছিলেন।

শিল্পীর কিছু জাগতিক প্রাপ্তির অধিকার থাকে, যা বেশির ভাগ শিল্পীই পান না। মুকুলচন্দ্র দে সৌভাগ্যবান পুরুষ, তিনি তার সবই লাভ করেছিলেন।

প্রণবরঞ্জন রায়

স ং গী ত

সকলেই রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী নয়

'পথে ও পথের প্রান্তে'র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি।' 'আত্মপরিচয়ে' তিনি নিজেকে বলেছিলেন, বিচিত্রের দূত ; তাঁর কাজ বিশ্বের বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে বিচিত্র রূপে, বিবিধ আঙ্গিকে বাইরে লীলায়িত করা। পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ আসে আর যায়। পঞ্জিকা নির্দেশিত তিথি পালনের মতো তাঁরই নামাঙ্কিত সদনে সরকারি প্রযোজনায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করা হয়। এই স্মরণের উপচার হিসাবেও ব্যবহৃত হয় তাঁরই লেখা কিছু কবিতা, তাঁরই রচিত কিছু গান আর নাটক। যাঁদের এই উপচার নিবেদনে আহ্বান করা হয় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট নামগুলির ফাঁকে ফাঁকে এমনই সব নাম ভিড় করে যাঁদের যোগ্যতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এই সরকারি প্রযোজনায় রবীন্দ্রস্মরণ কলকাতার বৃহত্তম রবীন্দ্রস্মরণ। বাংলাদেশে যেমন সাধারণ মানুষের আনুকূল্যে নববর্ষের উৎসব সে দেশের বৃহত্তম জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে, এই বঙ্গে তা হয় নি। এই বঙ্গে আমরা রবীন্দ্রস্মরণের বৃহত্তম আয়োজনে সরকারের মুখাপেক্ষী। এই সরকারি প্রযোজনায় যে রবীন্দ্রস্মরণ বছরে দু'বার করে হয়ে চলেছে, সেই বৈচিত্র্যহীন থোড়-বড়ি-খাড়া অনুষ্ঠানগুলি দেখলে মনেই হবে না যে অস্তিত্বের নানা বিভাগেই ছিল রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি এবং আতত মানবিক কর্মকাণ্ডের এমন কোনও দিগন্ত খুঁজে পাওয়া ভার যা তাঁর বহুদ্যুতিক প্রতিভায় উজ্জ্বলতর হয়নি। বছরের পর বছর ধরে ব্যতিক্রমহীন পুনরাবৃত্তিমূলক অনুষ্ঠানগুলি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি কথা না বলে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে আপাত-জনপ্রিয়তার সহজ উপাদান রয়েছে এমন কটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপ সীমিত রাখাই সদন-কর্তৃপক্ষ নিরাপদ মনে করেন, কেন না তার বেশি বিশদ আয়তনে ভাবনার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অধিকন্তু এই সব আপাত-জনপ্রিয় ক্ষেত্রগুলি এমনই যে এই ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছেমতো যাকে খুশি প্রোমোট করার যে সুযোগ রয়েছে, সে সুযোগ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আর কোনও ক্ষেত্রে নেই। বর্তমানে বেসুর-বেতাল রবীন্দ্রসংগীত গায়নের সবচেয়ে বড় প্রোমোটার রবীন্দ্রসদন। রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ পরিচিত প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন গায়কগায়িকার অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এমন সব গাইয়েদের দিয়ে একক গাওয়ান যাঁদের দর্শন রবীন্দ্রসদনের বাইরে কোথাও মেলে না। এবার বাইশে শ্রাবণের পরে চার দিন যে-সব গানের অনুষ্ঠান হল তাতেও এমন অনেকে গাইলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান যদি না-গাইতেন 'তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার !' এঁদের অনেকের সম্পর্কে আলোচনা করার অর্থ পত্রিকার বহুমূল্য পৃষ্ঠা নষ্ট করা। তবু রবীন্দ্রসদন আয়োজিত বাইশে শ্রাবণের গীতসভার একটি বিবরণ জানানো প্রয়োজন।

প্রাত্যহিক সান্ধ্য গীতসভার প্রথম পর্বে ছিল একক গান। দ্বিতীয় পর্বে গীতিআলেখ্য। একক গানের বিষয় ছিল শ্রাবণের গান। গীতিআলেখ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনানির্ভর। অমিতাভ ঘোষ প্রথম গানে প্রবীণ গায়কের অনুকরণ নিরাপদ মনে করলেন। দ্বিতীয় গানে বেসুরে বেতালে ও গলা আটকে তিনি বিপর্যস্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কলা হচ্ছে যাঁর গান তাঁর, আর কৌশল হচ্ছে যিনি গান করেন অর্থাৎ গায়কের ; কিন্তু কলাকৌশল যোগ না হলে গান শেষপর্যন্ত 'গান' হয়ে ওঠে না। শমিতা মুখোপাধ্যায়ের গলা তিনটি সপ্তকে সাবলীল। তাঁর কৌশল তারিফ করবার মতো। এবার তাঁকে রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে হবে। পিয়ালি বসু প্রথম গানে স্বরলিপির অনুগত ছিলেন। দ্বিতীয় গান 'কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে' তিনি অন্তরা থেকে ইচ্ছেমতো কেন গাইলেন ! মলয়কুমার রায়ের গলা উঁচু সপ্তকে ওঠে না। 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে' গানে তিনি বাড়তি স্বর দিব্যি জুড়ে গাইলেন। এঁর অপরিণত কণ্ঠে গান ধ্বস্ত হল। মঞ্জু চৌধুরি কোন্ যোগ্যতায়, কোন্ সুবাদে একক গাইলেন, তা সদন কর্তৃপক্ষ জানেন। ইনি অম্লান বদনে যা-ইচ্ছে তাই গাইলেন। কাকলি দত্ত আমাদের হতাশ করলেন। স্বপ্না চক্রবর্তীর তালিম মার্গসংগীতে। তাঁর তালিমে ত্রুটি নেই। তাঁর গলাও ভালো। তবে তালিমের আবেশে আচ্ছন্ন বলেই দুটি গানে তিনি কালোয়াতির ক্ষমতা দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী বিকৃত উচ্চারণে, ধরা গলায়, স্খলিত স্বরস্থান সহ দুটি গান গেয়ে গেলেন। রেশমি মজুমদারের গান শোনা ছিল বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। এঁদের একক গাইতে ডেকে সদন কর্তৃপক্ষ নিজেদের ক্ষতি করলেন। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি গানে তন্ময়তা ছিল। চল্লিশের গায়কদের ট্রেমোলোর রেশ তাঁরও গলায় রয়েছে। সতেজ ও জোয়ারিসমৃদ্ধ কণ্ঠে প্রতীক্ষার অনুষঙ্গে বাঁধা চারটি গান গীতা ঘটক গাইলেন। প্রসঙ্গের অনুক্রমে গাইলে গান থেকে গানে যাওয়া যে সাবলীল হয়, সেটা তিনি বোঝেন। পূর্বা দাম-ও সচেতনভাবেই গান নির্বাচন করেন। কিন্তু 'পুব সাগরের পার হতে' গানে তিনি অ-কারান্ত একটি শব্দ কেন হলন্ত গাইলেন, জানি না। এতে বাণী ও সুরের ছন্দ ব্যাহত হয়। পূরবী মুখোপাধ্যায় মুক্ত ছন্দের চেয়ে তালবদ্ধ গানেই বেশি স্বচ্ছন্দ।

আড়ে ধরে, শব্দসংগতিতে ছেদ ঘটিয়ে, অত্যধিক ইন্টারল্যুড সহ যেভাবে স্বপন গুপ্ত গান্ধারযুক্ত মেঘমল্লারে 'বাদলদিনের প্রথম কদমফুল' গাইলেন তা গানটির রসগ্রহণে সহায়তা করেনি। তাঁর 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে' গানে আনদ্ধবাদ্যে কণ্ঠে লয়ের যুগলবন্দি হল না। সঙ্ঘমিত্রা গুপ্ত শোনালেন চারটি গান। 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়' গানটি গাইয়ের যে বিশেষ বোধ দাবি করে, সেটি তাঁর আছে। গদ্যের চালে লেখা হলেও এই গানে ধ্রুপদের মতো তুক্ ভাগ রয়েছে এবং এর লয়ের মধ্যেও গদ্যের চালটি বোঝা যায়। সুমিত্রা সেন চারটি গান শোনালেন। তিনি বেছেছিলেন শ্রাবণরাত্রির গান। এদিন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হল না। গানের স্বরূপ রইল অনুদ্‌ঘাটিত। অর্ঘ্য সেন শুরু করেছিলেন তদ্‌গত চিত্তে। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানে গলা একটি বিশেষ স্বরে এসে ভেঙে গেল। তিনি আর গাইলেন না। তাজ্জব কাণ্ড করলেন সুশীল মল্লিক। বেসুরো দাপটে তিনি 'ঝরঝর বরিষে' স্থায়ী ও অন্তরা গেয়েই পরের গান ধরলেন। 'অধীরা যমুনা তরঙ্গ আকুলা' থেকে দুটো তুক যে বাকি রইল সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাকি দুটি গানেও তিনি যা করলেন তাতে বলতে হয় 'আর কেন আর কেন....ফুরায়ে গিয়াছে বেলা..।' না হয় আমাদের স্মৃতিতে অম্লান রইল তাঁর এক কালের গাওয়া গান। কিন্তু এখন আর মঞ্চে বসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দেখানো কেন? অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বিকল্পভাবে সাতটি গান গাইলেন। এর মধ্যে সুরান্তরে ষষ্ঠী তালে 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' ছিল যেটি তিনি বছর তেইশ আগে দীর্ঘবাদন ধ্বনিমুদ্রিকায় গেয়েছিলেন। 'সঘন গহন রাত্রি' গানে তিনি পরপর দুবার গাইলেন 'ছায়ালোক হতে মায়াতরণী' যদিও পেছনে বসে একজন গানগুলির পঙক্তি প্রম্পট্ করে দিচ্ছিলেন। শেষ একক গাইলেন সুচিত্রা মিত্র। প্রথমে গাইলেন দুটি গান মিশিয়ে। 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক' আর 'ওই কি এলে আকাশ পারে' গান দুটির তুকগুলি মিশিয়ে গেয়ে তিনি বর্ষার আগমনের ছবি জাগিয়ে দিলেন। তিনি পরপর গাইলেন 'পুব সাগরের পার হতে', 'অনেক কথা বলেছিলেম,' 'আজ কিছুতেই যায় না', 'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে' আর 'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই।' গান যে যথাযোগ্য কণ্ঠের অপেক্ষায় থাকে, সেটা তাঁর গান শুনলে, বোঝা যায়। 'পুব সাগরের পার হতে' যেমন অনুভবের ভিতর থেকে উঠে এল তেমনি সঞ্চারীতে কণ্ঠেই আমরা মেঘের গুরুগুরু শুনতে পেলাম। প্রতিটি গানে সুচিত্রা মিত্র উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ, ঝোঁক আর সুর-লয়-কাব্যবোধের প্রকৃষ্ট যোগে রচিত গানের যে উদাহরণ সেদিন দেখালেন, তা ছিল রীতিমত শিক্ষণীয়। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত তুলনাহীনভাবে বিশ্লেষিত হল সেদিন। পরিচিত এবং বর্ষীয়ান গায়ক-গায়িকারা সচেতনভাবেই অনুষঙ্গের পারম্পর্য রেখে গান নির্বাচন ও বিন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু নতুন গাইয়েরা, যাঁরা সকলেই বয়সে নবীন ছিলেন না তাঁরা বোধ হয় অনেকেই ভেবেছিলেন ভাঙা ও কঠিন গানেই কেল্লা ফতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণের গান কম লেখেননি। প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমনও কিছু গানে শ্রাবণের আবহ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের এই স্মরণ অনুষ্ঠানে কিছু গান পরপর দুদিন গাওয়া হল। সুশীল চট্টোপাধ্যায় সুচিত্রা মিত্র গাইলেন 'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই', সঙ্ঘমিত্রা গুপ্ত ও গীতা ঘটক গাইলেন 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে', মঞ্জু চৌধুরি ও সুমিত্রা সেন গাইলেন 'আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা' এবং যদিও এ গানের দাদরা-নিবদ্ধ সুরান্তর আছে, সেটি কেউ গাইলেন না। শমিতা মুখোপাধ্যায় ও স্বপন গুপ্ত গাইলেন 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে', ইত্যাদি। সদন-কর্তৃপক্ষ গায়ক-গায়িকাদের কাছে গানের তালিকা আগাম চেয়ে পাঠান এবং কোনও গানের যাতে পুনরাবৃত্তি না-ঘটে সেটা দেখে নেন। প্রশাসনিক দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা এবার সেই দেখার কাজটা করেননি। এঁরা নিজেদের গাফিলতির পরিণামে গায়ক-গায়িকাদের বিব্রত ও শ্রোতাদের বিরক্ত করলেন। আধুনিক দুনিয়ায় পাব্‌লিক স্টেজ্ কি সেই ধারণাই রবীন্দ্রসদন প্রশাসনের নেই। গত একশ' বছরে স্টেজ ম্যানেজমেন্টে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, এমন কি দিল্লি ও বোম্‌বেতেও যে আধুনিক স্টেজ গড়ে উঠেছে সে খবরও তাঁরা রাখেন না। এই মঞ্চে সাজসংগতের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে, যাঁরা অনুষ্ঠান করেন তাঁদেরই ব্যবস্থা করতে হয়। এখানে সুষীরবাদ্য হিসাবে হারমোনিয়ম একচ্ছত্র বিরাজ করে যদিও শ্রুতিনির্ভর ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এই বাদ্যটি সহায়ক নয়।

প্রত্যহ একক গায়নের পর একটি করে গীতিআলেখ্য হল। এগুলিতে একক, দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়া হল। প্রথম দিন শান্তিনিকেতন সপ্তকের তিন তরুণ আর চার তরুণী শোনালেন 'ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে' গীতিআলেখ্য। রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্ত্যপ্রেমের তেরোটি গান তাঁরা বেছেছিলেন। এর মধ্যে ছিল 'আজ তারায় তারায়', 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'আবার যদি ইচ্ছা কর', 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' ইত্যাদি। সশ্রদ্ধ ও সুরুচিকর এই বিরতিহীন অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের গলায় ছিল সহজ সুর। দ্বৈত ও সমবেত গানে কণ্ঠের এমন ব্লেন্ডিং কম শোনা যায়। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু থেকে দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু অবধি এক-একটি শোকের অভিঘাতে উদ্‌গত গানে গেঁথে সপ্তস্বরা 'ভরা সাঁঝের সন্ধ্যাতারা' সাজিয়েছিলেন। তাঁরা কিছু নামিদামি গায়ক-গায়িকাদেরও একক গাইতে ডেকেছিলেন। এমন একটি গাম্ভীর্যের অনুষ্ঠানে পাঠ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে যন্ত্রমেলানো, যখন-তখন গায়ক-গায়িকাদের আসা যাওয়া ও কথাবার্তা বলা ইত্যাদি আদৌ আশা করা যায়নি। নামিদামি গাইয়েকে বসালেই অনুষ্ঠান ভালো হয় না, অনুষ্ঠান ভালো হয় সামগ্রিক ঐক্যে। একজন সম্পূর্ণ অফ্ বিটে 'ওহে জীবনবল্লভ' গাইলেন। 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' শোনালো হতাশ্বাসের মতো। 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' যে পরম আশ্বাসের গান সেটা ভুলে কাঁদো-কাঁদো সুরে গাওয়া হল। সমবেত 'আজি বরিষণ মুখরিত' গানে অন্তরা ধরা হল মাত্রা ছেড়ে। ইন্দিরার গীতিআলেখ্য 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'-তে আটটি গান গাওয়া হল। গায়ক-গায়িকারা স্বরলিপির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। সব গানই স্বরলিপির আবৃত্তির ঊর্ধ্বে ছিল, তা বলতে পারলে আহ্লাদ হত। তবে এঁদের শেষ সমবেত 'আমার যে আসে কাছে' শোনা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এঁদের অনুষ্ঠানও ছিল বিরতিহীন, সুরুচিকর ও সুন্দর। গান্ধারের 'এক আলোকের সূত্রে গাঁথা' ছিল ভাষ্য ভারাক্রান্ত। এঁদের একক গান 'আঁধার রাতে একলা পাগল', 'আমার আঁধার ভালো', 'আমার অন্ধপ্রদীপ' এবং সমবেত 'প্রভু তোমার বীণা' ও 'অন্ধকারের উৎস হতে' পরিবেশনে ছিল নিষ্ঠা ও তালিম। এই অনুষ্ঠানটিও ছিল সুরুচিকর। কিন্তু সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত এই সদনের রবীন্দ্রস্মরণে রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের কতটুকু পেলাম! প্রশাসনের কাছে রবীন্দ্রনাথের কোনও প্রত্যাশা ছিল না। স্বাধীন দেশে এধরনের পরিকল্পনাহীন, অক্ষম গাইয়ের আবির্ভাবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বছরের পর বছর একই জাবরকাটা উপস্থাপনার অভিজ্ঞতায় আমরাই-বা কোন্ প্রত্যাশা রাখতে পারি! রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সাধারণের সশ্রদ্ধ চাঁদায় গড়ে ওঠা একটি বেসরকারি সমিতিও রবীন্দ্রনাথের রয়্যালটির অংশ পেয়ে থাকেন। তাঁদের রবীন্দ্রস্মরণ এত নীরব কেন আর মানুষ তাঁদের সম্পর্কে এত অনাগ্রহী কেন?

শোভন সোম

চৌরাসিয়ার প্রয়াস

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা এবং তার সমঝদার দুই ক্ষেত্রেই এখন একটা অনীহা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করছে। এবং সেটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই। তার পরিবর্তে সস্তা চটুল এবং বিদেশি উত্তেজক এক ধরনের বিনোদনমূলক সুর বর্তমান প্রজন্মকে বেপথু এবং পঙ্গু করে তুলছে। এমনতর শঙ্কা থেকেই স্পিক-ম্যাকে নামক একটি সাংস্কৃতিক

হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া

প্রতিষ্ঠান এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে এ-কালের ছেলেমেয়েদের উৎসাহী করে তুলবার জন্য। গত জুলাই মাসে তারা সেন্ট জেমস স্কুল, সেন্ট লরেন্স, সাউথ পয়েন্ট, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ও জোকার আই আই এম-এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তাতে সানন্দে অংশ নেন বাঁশির জাদুকর পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। সেই সব অনুষ্ঠানে তিনি ভারতীয় রাগরাগিণী যুগ যুগ ধরে কী ভাবে আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে আসছে, উপমা সহ আলোচনাও করেছেন।

নিজেই বলেছেন, এমন অনুষ্ঠান যত হয় ততই মঙ্গল। এমনই করে এই প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতকে তুলে না ধরলে, এক সময় এই সম্পদটাই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে হারিয়ে যাবে।

এ বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ এবং ভীতিও কম নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে। বললেন, ও লোগ কাঁহা গিয়া ? যো লোগ গাতা থা, বাজাতা থা, আউর উন লোগো কো পেট্রনাইজ কিয়া ? এই কলকাতা এক সময় তামাম হিন্দুস্থানের গাইয়ে-বাজিয়েদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। আজও নিশ্চয়ই করে। তবে সেটা কামানে কা ধান্দা সে। কিন্তু আমাদের সময় ? আমার আজকের এই খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা তো এই কলকাতাই দিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি, এই শহরের শ্রোতাদের আশীর্বাদ না পেলে শিল্পীই হতে পারবো না।

তো, যখন সত্যি সত্যি এখানে বন্‌শি বাজাবার সুযোগ পেলাম, সে কী থ্রিল, কি ভয়। তখন এমনই সমীহ ছিল এখানকার শ্রোতাদের প্রতি। তার ওপর ছিল কম্পিটিশন। এখানে চান্স পাওয়াটাই তো লাক। তখন কলকাতার দিকে তামাম ইন্ডিয়া তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু কোথায় আজ সেই সব বড় মাপের মানুষ আর প্রতিষ্ঠান ? কোথায় সেই তানসেন, সদারঙ্গ, সুরেশ সঙ্গীত সমাজ, অল বেঙ্গল, অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স আর তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ?

এখন কলকাতায় ডাক পেয়ে আসি, বাজাই, আবার চলেও যাই। ও সব তো প্রোমোট প্রোগ্রাম। আর সেই জমানায় ? আগে থেকেই এসে বসে থাকতুম ডাক পাবার আশায়। সেই সময় এই শহরটা, এই বংগাল ক্ল্যাসিকেল গাইয়ে বাজিয়ে কিংবা ক্ল্যাসিকেল ড্যান্সারদের কাছে যে তীর্থস্থান ছিল, আজ কি তা আছে ? কোথায় সেই কম্যান্ড। আপ বোলিয়ে ? বলে, বাঁশির জাদুকর পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া কৌতূহলী হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর নিজেই ফের বললেন, অবশ্য গোটা হিন্দুস্থানেই এখন এই অবস্থা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রটা বিলাইতি মিউজিকের দাপটে কাঁপছে।

কিন্তু ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা। আর সব কিছুর মতো এখানকার কালচারাল হেরিটেজও স্বতন্ত্র। এমন মিউজিক পাগল লোক আর কোথাও নেই। আজও নেই। সেদিক থেকে কলকাতার ঘরানাই আলাদা। তাবড়-তাবড় ওস্তাদদের মধ্যে কে আসেননি এখানে ? থাকেননি এই শহরে ? কারুর কারুর তো এটা দুসরা ঘরই হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি গুরুতর কথা বললেন : কিছুকাল ধরে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে। একটু-আধটু গানা-বাজানা শিখে, এমন কী বড় মাপের শিল্পীরাও সুযোগ খুঁজে ফোরেনে চলে যাচ্ছে। উ লোগ ইধারসে কুর্তা খরিদ করকে লে যাতে হেঁ, অওর টাই পিনকে নেহি তো খরিদ করকে লে আতে হেঁ। বাহার যানা আজকাল এক ফ্যাশন বন্‌ গিয়া।

হাঁ, বাহার জায়েঙ্গে জরুর। মগর কিস লিয়ে ? না, যাঁহা যাঁহা ইন্ডিয়ান হায় উনকো শুনাও, ফরেনারকো হামারা হেরিডিটি অওর ট্র্যাডিশনাল গানা-বাজানা কা মজা লাগাও। কিন্তু তা তো নয়। ফোরেন কা লেবেল চাই হামারা। এবার আর ক্ষোভ নয়, হাসলেন চৌরাসিয়াজি। হাতের বাঁশিটা কপালে-বুকে ছুঁইয়ে, তাতে একটু সুর লাগিয়ে বললেন, এ ভি হামকো কিতনা দেশ ঘুমায়া। কিন্তু শেষ ঠিকানা তো এই ঘরই।

আসলে মোহ এবং সস্তার চমকটাই এই যুগের পছন্দ। আর সেই জন্যেই সাথ সাথ ভি লে আতা হায় বিলাইতি খিতাব অওর মিউজিক। উস্‌সে কেয়া মজা হায় ? সেটা কি আমাদের ট্র্যাডিশনাল মিউজিকের চেয়েও বড় ?

সেই জন্যেই আমার এই পরিকল্পনা। এই প্রজন্মের কাছে তো আমাদের একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে ? আমি গুরুকুল এবং পরম্পরায় বিশ্বাসী। আর এও বিশ্বাস করি, এই অধিগত বিদ্যা স্রেফ আপনে কামানেকে লিয়ে নেহি। দেনেকে লিয়ে ভি।

কথা শেষ করার আগে তিনি নিজের একটা অমার্জনীয় ত্রুটি সংশোধনার্থে বললেন, শুধু কি এখানকার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা, শ্রোতা এবং অন্য প্রদেশের শিল্পীদের রুজি রোজগারের তীর্থক্ষেত্র এই বংগাল ? এখানকার সেই সব নমস্য শিল্পীদের দান এবং দুর্বার আকর্ষণ ? শুধুমাত্র সমঝদার দিয়েই কি ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে ?

বলতে বলতেই তিনি হাতের কর গুনে প্রবাদতুল্য সব বাঙালি শিল্পীদের নাম করতে শুরু করে দিলেন। এবং এক সময় সেই প্রচেষ্টা অসমাপ্ত রেখে বললেন, বাপরে। সব রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

কিন্তু তার পরেই ফের সেই ক্ষোভ : কাঁহা গিয়া উ লোগ। উনকা ট্র্যাডিশন ?

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নৃ ত্য

প্রবাসী দুই কন্যা

আমেরিকা প্রবাসী দুই বাঙালি কন্যা, সারণী ও সেঁজুতি চৌধুরী, ৩০ জুলাই বিদ্যামন্দিরে ভরতনাট্যম ও কুচিপুড়ি নৃত্যে তাঁদের প্রতিভার যে স্বাক্ষর রাখলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁদের গুরু হিউস্টন নিবাসী রতন পাগা তাঁর শিষ্যাদের পরিপূর্ণ নৃত্যশিল্পী হওয়ার পথে অগ্রসর করার জন্য প্রশংসার দাবি রাখেন। সারণী ও সেঁজুতির 'আলারিপু' যুগল নৃত্যটির পরিকল্পনায় নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। 'সবেরি জেথিস্বরম্' নৃত্যে সেঁজুতির লাবণ্যমণ্ডিত দেহসঞ্চরণে বাজাবুর রামাইয়া পিল্লাই ঘরানার প্রভাব স্পষ্ট। 'জেথি'র ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি ওই ঘরানারই বিশেষত্ব। সারণী অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পরিবেশন করলেন পুরী কল্যাণীতে আধারিত ও আদিতালে নিবদ্ধ 'বর্ণম্'টি। অল্প বয়স ও সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বিরহিণী নায়িকার অভিনয়ে শিল্পী সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নটরাজ বন্দনায় নিবেদিত 'পদম্'-এর রূপায়ণে সেঁজুতি যথাযথ। কুচিপুড়ি নৃত্যে সারণী পরিবেশন করলেন 'শিবস্তোকম্', 'কৃষ্ণশব্দম্' ও 'তিল্লানা'। প্রতিটি পরিবেশনাতেই 'ভেম্পতি চিন্নাসত্যম ঘরানা'র প্রভাব অনুভূত হয়। কখনও কখনও সারণীর নৃত্যে ভরতনাট্যম ও কুচিপুড়ির যুগ্ম প্রভাব অনুভূত হয়েছে।

এন কে শিবশঙ্করণ

না ট ক

কাহিনীতে বিশ্বস্ত নাটক

সম্প্রতি গল্পকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রযোজনার প্রবণতা আবার বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। বেতারে এমন নাটকেরই চল ছিল বেশি। এখন মঞ্চেও ফিরে এসেছে এই ধারা। অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবের অভিযোগ নাবালক বাঙালি নাট্যোৎসাহীও করে থাকেন। কিন্তু গল্পমাত্রই কি নাটক হয়ে উঠতে পারে? "রস" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি অতিবিখ্যাত গল্প। প্রয়োজনবুদ্ধি থেকে রসিয়া মোতালেফের মাজু খাতুনকে বিয়ে, তারপর তারই তৈরি গুড়ের ব্যবসা করে দেনমোহরের

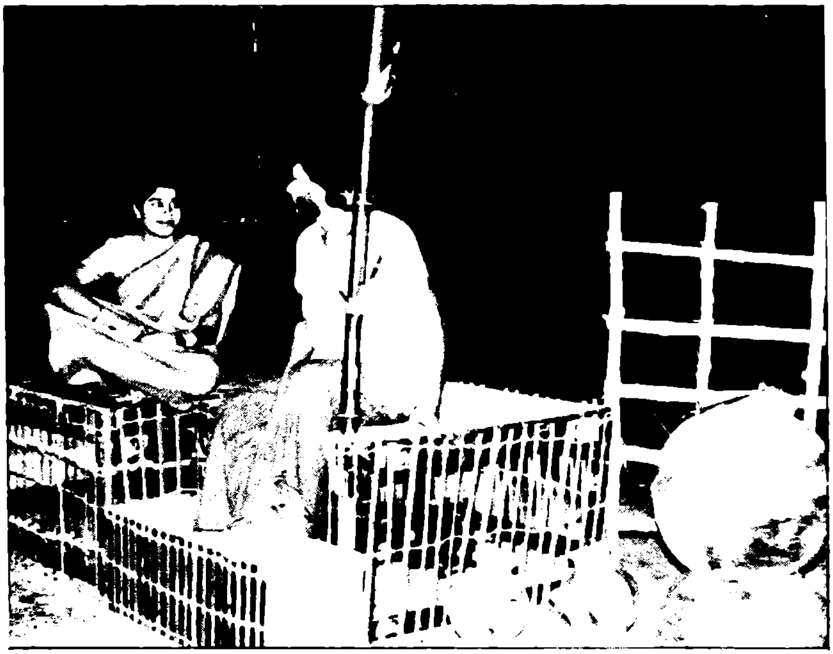

'রস' নাটকের দৃশ্য

টাকা জমিয়ে ফুলবানুকে বিয়ে আর বদনাম দিয়ে মাজুকে তালাক দেওয়া, আবার ব্যবসারই স্বার্থে তখন পরস্ত্রী মাজুর দ্বারস্থ হওয়া : এই হল নাট্য-আখ্যানের মূল কাঠামো। জীবিকায় যে মোতালেফ রসের কারবারী, জীবনে সে যেন রসহীন স্বার্থপর। আবার জীবনে যে ফুলবানু রসের জোগান দিতে পারে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির জীবিকায় সে নিতান্ত ব্যর্থ। জীবন আর জীবিকা, গাছের রস আর মনের রস, নেশার তাড়ি আর নাস্তার গুড় যেন তৈরি করে দুই বিপ্রতীপ জগৎ। এই দুইকে একমাত্র মেলাতে পারে / পারত মাজু খাতুন।

নাটক তৈরি হতে পারত এখান থেকেই। কিন্তু সমকালীন শিল্পীদলের পরিচালক ও নাট্যরূপদাতা অম্বর রায় ততটা মন দিলেন না ভেতর মহলের এই নাট্য-উপাদানে। বরং গল্পের—তার বাহিরমহলের ঘটনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই যেন প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল তাঁর। মূল রচনার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা হলে ঘরে বসে গল্পটা পড়লেই যে অভিজ্ঞতা হতে পারে, তার জন্য নাটক দেখতে যাবেন কেন দর্শক? তাই নাট্যরূপায়ণে আনতেই হয় অন্য কোনও মাত্রা—দৃষ্টিকোণের, সময়সঙ্গতির। সে কথা পরিচালকের অজানা নয়। আর নয় বলেই একালীন নারীবাদী প্রশ্ন বুনে দেওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি করে নেন তিনি। তবে প্রশ্নচিহ্ন থেকে বলিষ্ঠ ইতিবাচকতায় যেতে চান না সম্ভবত। আখ্যানকে দৃশ্যে সাবলীল অনুবাদ করে নিয়েছেন নাট্যরূপান্তরকারী-পরিচালক। বিপত্নীক মোতালেফের অলক্ষ্য অলস জীবন থেকে মাজু-মোতালেফের সুখসমৃদ্ধ দাম্পত্য, মাজুকে তালাক ও ফুলবানুকে নিকাহ্ থেকে রস নিয়ে অর্থীর মতো মাজুর কাছে মোতালেফের ফিরে-আসা নাট্যসন্ধির নিয়ম মেনেই যেন বিন্যস্ত হয়েছে। ফলে আখ্যানের সব সুকৃতির সুযোগ নিতে পেরেছে নাট্য। অভিনয়ে মাজু খাতুনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে তুলেছেন পাপিয়া দে। মরহুম স্বামীর স্মৃতি, মোতালেফের প্রেম ও অকৃতজ্ঞতা, প্রায় প্রতিশোধে রসিয়া সমাজের বাইরে এক মাল্লাকে বিয়ে করা—মাজুর জীবনের সব কটি পর্বান্তরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার অভিনয়ে। মোতালেফের ভূমিকায় পরিচালক যথেষ্ট সহযোগিতা করলেও, চরিত্রটি অনেকটাই সমতল মনে হয়েছে। রসিয়াদের 'তর তুলনা তুই বিবিজান' গানের দৃশ্যটি ভরাট হয়ে উঠেছে পরিচালনার গুণে। তেমনই তালাকের দৃশ্যটি হয়েছে বড়ই গতানুগতিক। স্বপন দাসের মঞ্চ ছিমছাম অথচ খুবই কার্যকরী। আলো এ-প্রযোজনার দুর্বল দিক। অনুভাবের সঙ্গে তার আত্মতা গড়ে উঠল না, যদিও তেমন সুযোগ কম ছিল না নাটকে। পাত্রপাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ মলিন দেখাল, সেও কি আলোর জন্যেই? নাকি সচরাচর বাঙলা নাটকের ছক অনুযায়ী সমকালীন শিল্পীদলও মনে করেন, গ্রামের মানুষমাত্রকেই অপরিষ্কার, অপাট পোশাক পরাতে হবে? যাই হোক, এ-অভ্যাস ত্যাগ করা ভাল।

স্বপন মজুমদার

দীপক দে

সত্যজিতের আরও

আরো সত্যজিৎ/সত্যজিৎ রায়
আনন্দ পাবলিশার্স/কল-৯/১৫০·০০

সত্যজিৎ রায়ের বহুমুখী সৃষ্টিশীলতার দীপ্তি নিয়ে বিগত কয়েক বছরে বহু আলোচনাই হয়েছে। সত্যজিৎ-সাহিত্যের একটি সংকলন প্রসঙ্গে আবারও কিছু কথা বলবার অবকাশ তৈরি হল। সত্যজিৎ রায়ের গল্প ও উপন্যাসের প্রতি বাংলা ভাষার সুপরিচিত সাহিত্যরসিকদের মুগ্ধ সাধুবাদ বর্ষিত হয়েছে অনেক। তাঁর কথাশিল্প নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থ। সে সব রচনায় প্রতিষ্ঠিত অভিমতগুলির সঙ্গে তেমন কোনও অনৈক্য পোষণ করি না। কাজেই নতুন করে একটি প্রবন্ধ ফাঁদবার তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবু যখন 'আরো সত্যজিৎ' নামক সংকলনটির সূত্রে কিছু কথা বলবার সুযোগ এল তখন মনে হল, সত্যজিৎ রায়ের লেখা বিষয়ে ও তাঁর ভাবনা বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা কখনও কখনও মনের মধ্যে যায় আসে— সেগুলি নিবেদন করবার অবকাশ পাওয়া যাবে।

প্রথমে সংকলনটির পরিচয়। প্রকাশকের আগ্রহে স্বনির্বাচিত [illegible] করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। একটি গ্রন্থে নির্বাচিত সব রচনা ধরানো যায়নি বলে পরিকল্পিত হয় দুটি গ্রন্থ। প্রথমটি 'সেরা সত্যজিৎ' নামে প্রকাশিত হয়েছে আগে। 'আরো সত্যজিৎ' নামের দ্বিতীয় গ্রন্থটি এখন আমাদের হাতে। বইয়ের ব্লার্ব-এ বলা হয়েছে যে, রচনাগুলি সবই সত্যজিৎ রায়ের নির্বাচিত। প্রশ্ন জাগে সিনেমা-সংক্রান্ত নির্দেশাবলিকে কেন তিনি গ্রন্থভুক্ত করলেন! তার চেয়েও বিস্ময়কর, 'সন্দেশ' পত্রিকায় চিত্রনাট্য লিখে পুরস্কার পাওয়া তিন কিশোর-কিশোরীর রচনার অন্তর্ভুক্তি। এগুলি তো সত্যজিতের লেখা নয়। বইয়ের ব্লার্ব-এ 'সিনেমার কথা' রচনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "লেখাটি শেষ করে যেতে পারেননি তিনি, কিন্তু যে ক'টি কিস্তি ছাপা হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়, তা উদ্ধার করে এনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই সংকলনে।" এই ভাষা থেকে কিন্তু মনে হয় এই লেখাটি অন্তর্ভুক্ত করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সত্যজিৎ রায় প্রয়াত হবার পর। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রকাশকেরা। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে, শেষ মুহূর্তে কয়েকটি অতিরিক্ত রচনা সংযোজন করেছেন সন্দীপ রায়। হয়তো সত্যজিৎ রায় অসম্পূর্ণ লেখাটি সংকলনভুক্ত করবার অনুমতি দিতেন না। যাই হোক, স্পষ্ট করে নির্দেশ করার দরকার ছিল— কোন্ লেখাগুলি তাঁর নিজস্ব নির্বাচন আর কোন্‌গুলি নয়। সম্পাদনা [illegible] —সংকলনভুক্ত লেখাগুলি প্রথম কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল তা জানানো হলে ভালো হত।

এবার লেখার কথা। সংকলনের সর্বশেষ লেখাটি 'ভিড়' নামের একটি কবিতা। ভিড়ের দৃশ্য। দৃশ্য হিসেবে কলকাতার পথের যথাযথ চিত্র, কিন্তু কবিতা হিসেবে খুব উচ্চশ্রেণীর বলা যায় না। প্রথম স্তবক:

বাপ রে কী ধাক্কার ধুম দেখো চৌমাথে/
কাতারে কাতারে লোকে গুঁতোগুঁতি
মাতামাতি,/ফুলবাবু বেচারি মুখখানি
পেঁচার-ই/রদ্দায় গোঁত্তায় প্রাণ যায় ফুটপাথে।

সত্যজিৎ রায় তুলনাহীনভাবে কবি হয়ে উঠেছিলেন চলচ্চিত্রের দৃশ্য রচনায়। সিনেমার প্রয়োজনে সুর বসানো গানগুলিতে কথা ও সুরের ঘটেছে সুন্দর মিলন। কখনও কখনও তাঁর সংলাপ রচনাও যেন কবিতা-ই। কিন্তু কিছু ননসেন্স্ রাইম্-এর চমৎকার অনুবাদ-কৃতিত্ব সত্ত্বেও সুর-বর্জিত, চলচ্চিত্র-সংযোগ বর্জিত মিলান্তক কবিতা রচনার ব্যাপারে তাঁর কল্পনা আকাশের পাখি হতে পারেনি। 'ভিড়' সম্ভবত সে কথাই প্রমাণ করবে।

'প্রবন্ধ' পরিচয়ে যে দুটি লেখা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে সে দুটি কোনও মৌলিক প্রবন্ধ নয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র সুবিখ্যাত খাতা সম্পর্কে একটি সচিত্র পরিচিতি এবং তুতানখামেন-এর সমাধি-খনন ও তার পরে সেই খননকারী অভিযাত্রীদলের কয়েকজনের রহস্যময় মৃত্যু সম্পর্কে একটি বিবরণ। এই দুটি বিষয় নিয়ে বিশ্বের একাধিক ভাষায় একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। ছোটদের বোঝার মতো করে সহজ সুন্দর ভাষায় রচনা দুটি লিখিত, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কোনও কৃতিত্ব নেই এখানে—না চিন্তায়, না অনুসন্ধানে। সিনেমা সংক্রান্ত আর একটি লেখা আছে সংকলনটিতে। 'পথের পাঁচালী'-র শুটিং-অভিজ্ঞতার কিছু লিপিচিত্র। সত্যতাগুণে ও বর্ণনাগুণে চমৎকার। 'মঙ্গলই স্বর্গ' নামে একটি অনুবাদ গল্প আছে। মূল কাহিনীর লেখক রে ব্র্যাডবেরি। বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে মঙ্গলগ্রহ অভিযান; কিন্তু আসলে তার চেয়ে অনেক গভীর এক মরণোত্তর রহস্যবলয় গল্পটিকে ঘিরে আছে। সত্যজিৎ রায় চারটি রূপকথার গল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'কানাইয়ের কথা' এখানে সংকলিত। এই রূপকথাটির বয়নে তাঁর প্রতিভাসিদ্ধ আধুনিক মনের ছাপ আছে। চিরাচরিত রূপকথার কাঠামোয় রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা আর রাক্ষস থাকে। কোথাও কোথাও থাকে গরিবের ছেলের রাজ্য পাবার গল্প। সত্যজিৎ রায়ের চারটি রূপকথার

তিনটিতেই গরিবের ছেলে রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্ব পেয়েছে ; দুটি গল্পে আছে রাক্ষস। কিন্তু এই সংকলনের 'কানাইয়ের কথা' একটু অন্যরকম। এখানে রাজা আছে ; রাক্ষস নেই। এক বিদেশি জাদুকরের অশুভ মায়ায় রাজার মধ্যেই জেগে উঠেছে অত্যাচারী রাক্ষসের মূর্তি। এখানে রাজপুত্র আছে, কিন্তু সে রাজকন্যার খোঁজে তেপান্তর আর সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে পক্ষিরাজ ছোটায়নি। সে অত্যাচারী বাপের হাত থেকে গরিব প্রজাদের বাঁচাতে চায় বলে রাজার হাতেই কারারুদ্ধ। কানাই নামের ছেলেটি গরিব বাপের রোগ সারাবার চেষ্টায় এক অলৌকিক শক্তিমান, আপাত-নিরীহ বুড়োর সহায়তা পেয়ে যায়। সেই অত্যাচারী রাজার রাজ্যে এসে সে রাজপুত্রকে মুক্ত করেছে, রাজাকে জাদুকরের মায়াপাশ থেকে ছাড়িয়ে এনে ভালো করে তুলেছে। রোগ-সারানো গাছের পাতা দিয়ে নিজের বাবা ও দেশের প্রজাদের অসুখ সারিয়েছে। অবশেষে রাজপুত্র রাজা এবং সে নিজে মন্ত্রী হয়ে বসেছে।

এই গল্পটি পুরনো দিনের আদি রূপকথাগুলি সম্পর্কেও একটু ভাবায় আমাদের। প্রচলিত রূপকথাগুলি সবই অ্যাডাল্ট থিম-এর উপর গড়ে উঠেছিল। সেখানে রাজাদের থাকে একাধিক রানি—কেউ প্রিয়, কেউ অ-প্রিয়। সেখানে থাকে নারীর সন্তানহীনতার দুঃখ, এক রানির সন্তান হলে অন্য রানিদের ঈর্ষা এবং অকাতরে শিশুহত্যার প্রয়াস। আবার রাজকন্যার রূপের কথা শুনে বা রূপ দেখে পাগল হওয়া রাজপুত্রদের গল্পে যৌবনোন্মেষের স্পষ্ট ইঙ্গিত। যে কালে বালক ও কিশোরদের জন্য কোনও আলাদা সাহিত্য ছিল না—সেই কালেই আদি রূপকথাগুলির স্বতঃসৃষ্টি—কোনও এক বিস্মৃত রাজতন্ত্রের যুগে। এবং সেগুলি আসলে প্রাপ্তবয়স্কদেরই গল্প। কিন্তু 'কানাইয়ের কথা' পুরোপুরি আধুনিক কালের বালকপাঠ্য রূপকথা। রাজপুত্র এখানে রাজকন্যা খোঁজেনি, জনসেবায় মন দিয়েছে ; বিদ্রোহী হয়েছে অত্যাচারী পিতার বিরুদ্ধে। বন্ধু বেছে নিয়েছে গরিবের ছেলেকে। সত্যজিৎ রায়ের অন্য তিনটি রূপকথাতেও এসব লক্ষণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু 'কানাইয়ের কথা'-ই সবচেয়ে সুনির্মিত মনে হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরকম দু-চারটি কিশোর গল্প পাওয়া যায়।

'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসটি এই সংকলনের অন্তর্গত। এমন একটি নিটোল সম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস বেশি লেখা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। বড়লোকের ছেলে কিশোর বাবলু দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত হল, স্মৃতি হারাল দুর্ঘটনায় ; তারপর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটি অদ্ভুত মানুষের। তার নাম ছিল অরুণ মুস্তফি। পথের আকর্ষণে আর জীবন-শিল্পের টানে সে আপিস ভাঙার টাইমে, ফিয়াট গাড়ি হাঁকিয়ে বি বি ডি বাগ থেকে বালিগঞ্জে ফেরার জীবন ত্যাগ করে এক পথিক-জীবন বেছে নিয়েছে। পথে পথে ঘুরে সে নানারকম খেলা দেখায়। তার নতুন নাম হারুন অল রসিদ। তার কাছে আশ্রয় পেয়ে যায় বাবলু, সেই আশ্রয়ে থেকে চিনে নেয় জীবনের অন্য পিঠ। আর্টিস্ট হারুন অল রসিদ স্মৃতি-হারানো ছেলেটির দ্রুত নাম বানিয়ে বলা দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল— 'যে লোকটা ঝড়াকসে নিজের একটা নাম বানিয়ে বলতে পারে সেও আর্টিস্ট। এসো, হারুনের সঙ্গে হাত মেলাও ফটিকচাঁদ পাল।' শিল্প যে এক অর্থে মিথ্যার নির্মাণ—সেই সত্য এই দুটি বাক্যে পরিণত পাঠকের চিত্তে উদ্ভাসিত করে তোলেন সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসের শেষে হারুনের আরও একটি অনবদ্য উক্তি আছে। সে উক্তি জীবন-শিল্পের মনোহরণ রূপের প্রতি

ডি. এম. প্রকাশিত অভিধান গ্রন্থমালা :
'আনন্দ পুরস্কার' বিজয়ী
সুভাষ ভট্টাচার্যর
আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান
বিদেশী নামের উচ্চারণ
ডি. এম. লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণী/কলকাতা-৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছেলেধরা ৩০, সরস গল্প ৩৫,
আশাপূর্ণা দেবী
ব্যাপারটা কী হলো ২০,
লীলা মজুমদার
মামাদাদুর ঘোড়াবাজী ২৫,
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
দারোগাবাবুর দুঃখ ১৫,
দুই মেরু ২০
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিত ২০,
সরস গল্প : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০
শক্তিপদ রাজগুরু
বিদিশার সংসার ৪০,
অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
কল্লোল। ৫এ—এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কল-৬

NEW BOOK! FIRST EVER PUBLISHED!!
The Works of Swami Abhedananda
Parts I & II
(An Abridged Edition of the Complete Works of Swami Abhedananda)
Compiled and Edited by
SWAMI PRAJNANANANDA
An apostle of Bhagavan Sri Ramakrishna, Swami Abhedananda delivered innumerable lectures all over the world. He pioneered the Vedanta Movement in three continents alone after Swami Vivekananda. All his speeches, lectures and writings are already published in the form of COMPLETE WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA in Ten Volumes.
We now feel relieved of our bounden duty to offer to the reading public at large a handy edition in TWO PARTS only giving most of the lectures and writings of Swami Abhedananda in an abridged form at the rock bottom price for the few copies of its First Edition only. Rush your order before the stock is exhausted.
Medium 8vo Size. Offset Printing. With Coloured jacket. Hard Board Bound with full Rexine.
1400 PAGES. SUBSIDISED PRICE: Rs. 300.00 ONLY
POSTAGE EXTRA: Rs. 25.00
RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
19A & B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

শিল্পী সত্যজিতের নম্র নমস্কার। —'আর্টিস্ট কি শুধু এক রকম হয় ?... শুধু বলের খেলাতেই কি আর্টিস্ট ? বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা— কতরকম খেলা আর কতরকম আর্টিস্ট হয় জানিস ? যখন বড় হবি তখন জানতে পারবি, কোন্ খেলাটা কী স্টাইলে খেলতে হবে তোকে।' হারুন অল রসিদের ছোঁয়ায় বাবলুর ভেতরকার ফটিকচন্দ্র পাল হয়ে উঠেছে জীবন-শিল্পের রঙে রেখায় মুগ্ধ আর একজন মানুষ। সকলে এমন মানুষ হয় না। বাবলুর বাবা শরদিন্দু সান্যাল তেমন মানুষ নয়। ছেলেকে খুঁজে দেবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও, যেহেতু হারুন সে ঘোষণাটি সংবাদপত্রে পড়েনি, সেই সুযোগে টাকাটি তাকে শরদিন্দু সান্যাল দেয়নি। বাবলু পেয়েছে জীবনের আরও একটি শিক্ষা— জেনেছে তার বাবার মতো মানুষদের স্বরূপ। এখানে ছোট একটি প্রশ্ন মনে আসে। 'ফটিকচাঁদ' চলচ্চিত্রের জন্য যে চিত্রনাট্য করেছিলেন সত্যজিৎ রায় তাতে দেখা যায়, শরদিন্দু সান্যাল প্রাথমিক অনিচ্ছা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখেছিল। সেই চেক পকেটে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিল বাবলু। হারুন অবশ্যই সে টাকা গ্রহণ করেনি— 'তুই যে আমার ভাই রে ফটকে, ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয় ?' উপন্যাসের বাবলু জেনেছে, তার বাবা অনুদার, কথা রাখে না, প্রায় প্রতারক। কিন্তু সিনেমার শরদিন্দুর হৃদয়-পরিবর্তন ঘটল কেন ? সম্পন্ন পরিবারের বহু ছেলেমেয়ে এবং তাদের বাবা-মা— যারা এই চলচ্চিত্রের দর্শক, তাদের মন রাখার জন্য কি ? ছোটদের সামনে অভিভাবকের ইমেজ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ? উদ্দেশ্যটি অন্যায্য নয়। ছোটদের মনে বাবার সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জাগে এমন কিছু একটি কিশোর-চলচ্চিত্রে না দেখানোই হয়তো ভালো। কিন্তু গল্পে তা হলে কেন তেমন হল না ! এমন মনে হয়, সাহিত্যিক সত্যজিতের শৈল্পিক নিরাসক্তি যতটা অমোঘ, চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ সেই তুলনায় দর্শক-মনোরঞ্জনের দাবির কাছে কোথাও কোথাও একটু আপোস করেছেন। সে জন্যই 'অতিথি' গল্পের তিন সন্তানের জননী, নিতান্ত মধ্যবিত্ত, প্রৌঢ়া সুহাসিনী 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রে অত্যন্ত ধনীগৃহে, ত্রিশের কোঠা না পেরনো, নৃত্য-গীতপটীয়সী যুবতী হয়ে দাঁড়ায়। একাধিক নয়নলোভন দৃশ্য-সংযোগ যার ফলে সম্ভব হয়েছে। 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রে আজকের সভ্যতা সম্পর্কে অনেক সঙ্গত প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঠিকই— কিন্তু ছবিটিতে মধ্যবিত্ত দর্শকের নানাবিধ ইচ্ছাপূরণ-উপাদানের সমন্বয় দৃষ্টি এড়ায় না। পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাওয়া পর্যন্ত যার দৃষ্টান্ত।

এই সংকলনে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে বড় গল্প আছে একটি— 'একশৃঙ্গ অভিযান' ; আর ছোট গল্প তিনটি। বিজ্ঞানমনস্ক কল্প-কাহিনীর ধারা পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ পুরনো। বাঙালি লেখকেরা যখন থেকে এ-জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেছেন তখন থেকেই বিদেশি প্রভাব গৃহীত হয়ে এসেছে এই জাতীয় রচনায়। আলাদা করে সেগুলিকে আর চিহ্নিত করা যায় না এখন। বিজ্ঞানভিত্তিক কল্প-কাহিনীর ক্ষেত্রে সেগুলি স্থির-উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, অদৃশ্য হওয়া, অভিনব সব যন্ত্র ও যন্ত্রমানব, নানারকম অভিযান, মহাকাশ ও গ্রহান্তর যাত্রা, সময়কে এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া, বস্তুর আকারগত পরিবর্তন ইত্যাদি। শঙ্কুর কাহিনীগুলিতেও এইসব উপাদানের প্রয়োগ ঘটেছে। গিরিডিবাসী, বাঙালি বৈজ্ঞানিক শঙ্কু একটি চমৎকার চরিত্র-সৃষ্টি। তাঁর ছোট বাড়ি, বাগান

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর
ধর্মের নামে ১৮ টাঃ
(স্বদেশে ও বিদেশে পুরস্কারপ্রাপ্ত)
রুশদি ও ডঃ কভুরের কাহিনী বোমা হলে 'ধর্মের নামে' এ্যাটমবোমা। ঝড় তোলা বই। পড়ুন : আজও ৬০০ বছর আগের তাজা রক্ত, মা কালীর স্তনদুগ্ধ, মল দিয়ে ওষুধ তৈরি, দেবতাদের ব্যভিচার, অবতার ও বাবাদের ব্যবসার কৌশল ও যৌনাচার, বিখ্যাত মন্দিরের চাঞ্চল্যকর ঘটনা, রামমন্দির-বাবরি মসজিদের গোপন ইতিহাস, অলৌকিকতার নামে ম্যাজিক, দেশদ্রোহিতা, বুজরুকি
প্রাপ্তি : নাথ, দে, শৈব্যা, বুক সাপ্লাই, বুক ফ্রেন্ড, রবী, রেল-স্টল

সুভাষ রচনাবলী ১—৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ ২১০
নন্দ মুখোপাধ্যায় **সুভাষচন্দ্র ও নাৎসী সরকার** ৪০
সমর গুহ
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ২০
কমলা দাশগুপ্ত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ৪০
জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ ১২০
জয়শ্রী হীরক জয়ন্তী গ্রন্থ ৬০
নেতাজী ও অনির্বাণ রচনার পরিবেশক
জয়শ্রী প্রকাশন। ১৮এ টেমার লেন, কলি-৯

বহুদিন বাদে প্রকাশিত হল
যোগীবর রামদয়াল মজুমদারের
গীতা-পরিচয় মূল্য ৩০ টাকা
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা-১

প্রকৃত অর্থে প্রাপ্তবয়স্কদের বই
বিজ্ঞাপন ছাড়াই এক যুগ ধরে বেস্টসেলার
ক্ষিতীশ সরকার অনূদিত/সত্য চক্রবর্তী চিত্রিত
সহস্র এক আরব্য রজনী
১২০ টাকার বই শেষ ॥ নতুন প্রিন্ট আসছে
দাম : ১৪০ টাকা
প্রেম-বিজ্ঞানের একমাত্র সচিত্র বই
কামসূত্র : বাৎস্যায়ন
নতুন প্রিন্ট ॥ দাম : ৭৫ টাকা
গিওভানি বোকাচ্চিও-র
হানড্রেড রোম্যান্টিক নাইটস
চিরঞ্জীব সেন অনূদিত/সত্য চক্রবর্তী চিত্রিত
দাম : ১০০ টাকা
মৌসুমী প্রকাশনী : ১৫ কলেজ রো :
কলকাতা-৯ ফোন : ২৪১-৩৭৫২

শম্পা বুক হোম
৯ এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা - ৯
হইতে প্রকাশিত
ডঃ সনাতন গোস্বামীর
বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়
বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস, তত্ত্ব, রসকাব্য ও নানা বৈচিত্র্যের পরিচয় সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ
কাপড়ে বাঁধাই - ৮০.০০
কাগজে বাঁধাই - ৬০.০০
মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্র লাল রায়)-২৫.০০
বলিদান (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)-৩৬.০০
প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি - ৭৩
পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন কলি- ৯
মহাজাতি প্রকাশন ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি-৭৩

আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত
বঙ্গানুবাদ : সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী
ন্যায়বিন্দু ৩৫
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত
চৈনিক পরিব্রাজক
ফা-হিয়ান ৩৫
সম্পাদনা ❑ ডঃ বারিদবরণ ঘোষ
গোপালচন্দ্র রায়
ভৌতিক কাহিনী ২৫
গীতিকণ্ঠ মজুমদার
বীরভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে ২৫
অরুণকুমার মজুমদার
আমিন পিয়ারীলাল ৩৫
(সেটেলমেন্ট বিভাগের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস)
সাহিত্যশ্রী ❑ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলি-৯

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত
গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা
সিরাজদ্দৌলা নাটক সম্বন্ধে আকর্ষণীয় আলোচনা। ৩০ টাকা

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর
খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রাবন্ধিক লিখেছেন ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর। ২২ টাকা

রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান
সাজাহান নাটকের পটভূমি বিশ্লেষণ করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক। ২৫ টাকা

সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত
দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত
দীর্ঘ ভূমিকাসহ মূল নাটক। ২৫ টাকা

সাহিত্য টীকা
সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ২২

পুস্তক বিপণি । ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

এবার **ছুটি ছুটি**-তে
ছোটদের জন্য যে কোনও পূজাসংখ্যার চেয়েও আকর্ষণীয় উপহার
৫৬০ পৃষ্ঠার বই মাত্র ৫০ টাকায়
[চোখ-জুড়নো অলঙ্করণে অফসেটে ঝকঝকে ছাপায় ৮৬টি গল্পের সংকলন, যেটি সব সেরা হাসির গল্প, সব সেরা ডাকাতের গল্প ও সব সেরা কিশোর গল্পের অখণ্ড গ্রন্থন]

সব সেরা ছুটির গল্প
[সুলভ সংস্করণ]

লেখক তালিকা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ● ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ● যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ● উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ● শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ● প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ● সুকুমার রায় ● যোগীন্দ্রনাথ সরকার ● রাধারাণী দেবী ● গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ● খগেন্দ্রনাথ মিত্র ● প্রেমেন্দ্র মিত্র ● শিবরাম চক্রবর্তী ● লীলা মজুমদার ● আশাপূর্ণা দেবী ● সমরেশ বসু ● বিমল কর ● দিব্যেন্দু পালিত ● নলিনী দাশ ● মহাশ্বেতা দেবী ● সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ● নবনীতা দেব সেন ● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ● শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ● বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ● শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ● অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ● হিমানীশ গোস্বামী ● সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● দুলেন্দ্র ভৌমিক ● তারাপদ রায় ● ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ● রতনতনু ঘাটী ● অধীর বিশ্বাস ● উজ্জ্বলকুমার দাস প্রমুখ। *প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

আপনার বাড়িতে যিনি কাগজ দেন বা স্থানীয় বইয়ের দোকান থেকে আজই আপনার প্রিয়জনের জন্য বইটি সংগ্রহ করুন।
রাজ সংস্করণ মূল্য : ৮০ টাকা

অধিক সংখ্যক বিক্রীত আমাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরাজি :
বিবেকানন্দ কথামৃত ৩০/ **গৃহীর গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ** ৩৫/
সত্যজিৎ পরিক্রমা ৫০/ **জন্মদিন জন্মদিন** ৪০/
বিল্লি লাফাও বিলাই লাফাও ২০/ **এক ডজন গোয়েন্দা** ২৫

বুলবুল প্রকাশন
বুলবুল প্রকাশন
১৮/এল, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আর পরীক্ষাগার ; তাঁর ভৃত্য, তাঁর বেড়াল আর প্রতিবেশী অবিনাশবাবু— সব কিছু নিয়ে এক অসম্ভবের রাজ্যেও তিনি একান্ত এক বাস্তব চরিত্র রূপে প্রতীয়মান হন। অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক হলেও শঙ্কু ভাবাবেগবর্জিত নন। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করে, নতুন কোনও আবিষ্কার তাঁকে আগ্রহী করে ; মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যে তিনি বিস্মিত হন। সব কিছুর ওপর তিনি এক শুভ বোধকে স্থান দেন।
মানবজাতির যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা, সেখানে প্রাণপণে তা রোধ করবার চেষ্টা করেন। এই মানুষটিকে পাওয়া যাবে এই গল্পগুলিতে।
সঙ্গে আছে গল্পের বিচিত্র আকর্ষণ।
বিজ্ঞানীদের সভা, বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংযোগ ও পারস্পরিক রেষারেষি, বিজ্ঞানের শক্তি মানুষকে ক্ষমতালোভী করে তোলে কতখানি— তাও দেখিয়েছেন লেখক।
'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু', 'ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার' ইত্যাদি গল্পে প্রায় গোয়েন্দা-কাহিনীর মতো উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত হয়।
'একশৃঙ্গ অভিযান' কাহিনীর স্বাদ একটু আলাদা। একটি চমৎকার অভিযানের শেষে এমন এক স্থান খুঁজে পান শঙ্কু ও তাঁর সহযাত্রীরা, যেখানে মানুষের যুগসঞ্চিত কল্পনার প্রাণীরা বাস্তব রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ফিনিক্স পাখি, রক পাখি, ড্রাগন, ইউনিকর্ন, ঐরাবত, পারিজাত বৃক্ষ, রাক্ষসের ডেরা—সবই দেখা গেছে সেখানে। ছোটদের কল্পনার পক্ষে কাহিনীটি একটু দুরূহ। বড়দের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিও যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়া দরকার কোনও কোনও ক্ষেত্রে। —'এ ছাড়া উপকথার পাখির মধ্যে গ্রিফন দেখেছি, পারস্যের সিমুর্ঘ, আরবদের আঙ্কা দেখেছি ; রুশদের নোর্ক আর জাপানীদের ফেং ও কির্নে দেখেছি। সরীসৃপদের মধ্যে চোখের চাহনিতে ভস্ম করা ব্যাসিলিস্ক দেখেছি।' তবু এসব না জানলেও রসগ্রহণে বাধা ঘটবে না ; কারণ, অভিযান-বিবরণটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সত্যজিৎ রায়ের ছেনি-কাটা ভাষায় নেপাল ও তিব্বতের পথের বৈচিত্র্য, পর্বত-আরোহণের রোমাঞ্চ, পথের বিপদ আর মানবচরিত্রের চমৎকার ঝলক 'একশৃঙ্গ অভিযান'কে মনোহর করে তুলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে জানা সত্যজিৎ-সাহিত্যের একটা আকর্ষণ। এই সঙ্কলনে শঙ্কুর গল্পগুলিতে নেপাল ও তিব্বত ছাড়া জার্মানি ও মিশরের সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে কিশোর পাঠকদের।
বিভিন্ন দেশ, বিচিত্র মানুষ ও বহুবিধ জ্ঞানের উপকরণের সমন্বয় তাঁর গোয়েন্দা-গল্পগুলিতেও। ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'সত্যজিতের সাহিত্য' গ্রন্থে 'বাদশাহী আংটি' উপন্যাসে কয়েকটি উপাদানের ব্যবহার নির্দেশ করেছেন যেগুলি সত্যজিতের গোয়েন্দা-কাহিনীতে বারবার এসেছে। ১, ভ্রমণ— অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বেড়িয়ে আসার আনন্দটাও যেন পাওয়া যায় গল্পগুলিতে। ২, দুষ্প্রাপ্য কোনও মূল্যবান বস্তু— এটি অবশ্য গোয়েন্দা-গল্পের চিরকালীন উপাদান। ৩, কোনও অভিনব সংগ্রহশালা—এই লক্ষণটি সত্যজিতের অন্য ধরনের ছোট গল্পেও পাওয়া যায়। ৪, হেঁয়ালি— সামগ্রিকভাবে এই লক্ষণটিকে আমরা ভাষার উপভোগ্য কারিগরি বলতে পারি— বর্ণমালার খেলা। তাঁর অনেক গোয়েন্দা-গল্পের নামের মধ্যেও যেটা পাওয়া যায়। উপভোগ্য ঠিকই, কিন্তু নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু লঘু হয়ে গেছে কখনও কখনও।
ছোটদের ভালো লাগবার মতো করেই তাঁর গোয়েন্দা-নায়ককে তৈরি করেছেন সত্যজিৎ। দীর্ঘদেহ, চাবুক-শরীরের অতিগুণসম্পন্ন যুবক। ক্ষিপ্র মেধার সঙ্গে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তার। সেই সঙ্গে কিশোর সহচর আর চিত্তাকর্ষক ও ঈষৎ কমিক লালমোহন গাঙ্গুলীর মতো সঙ্গী। ছোটদের ভালো লাগা কোথাও বাধা পায় না। তাদের কাছে এরকিউল পোয়ারো বা এমন কি শার্লক হোমস্-এর মতো ঈষৎ রহস্যময় চরিত্রও যে ততটা প্রিয় হবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। ফেলু মিত্তিরের চরিত্রচিত্রণে ছোটদের হিরো-ওয়র্শিপ মানসিকতাকে কাজে লাগানোর একটা ব্যাপার আছে।
লালমোহন গাঙ্গুলী সম্পর্কে অনেকেরই অভিমত এই যে, তিনি একজন সাধারণ মাপের বাঙালি। ফেলুর অসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তাঁর প্রতিন্যাস। আমার কিন্তু তাঁকে খুব সাধারণ মাপের বাঙালি বলে মনে হয় না। তিনি অত্যন্ত বিক্রয়-সফল লেখক, প্রচুর অর্থ অথচ তিনি টাকা খরচ করা সম্পর্কে খুবই উদার, বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়াতে সদাই উৎসুক, অন্যের গুণ স্বীকারে এবং নিজের ভুল স্বীকারে সর্বদা অকুণ্ঠিত, নিরহঙ্কার, হাসিমুখ, খুশিমন, সাদাসিধে এই মানুষটির মতো ক'জন বাঙালি হয় ? কখনও কখনও মনে হয় ফেলু মিত্তিরকে ঘিরে যে একটি ঈষৎ অতিমানবিক, আরোপিত 'হ্যালো' ছড়িয়ে দিয়েছেন লেখক, তার কৃত্রিমতা কাটাবার জন্যই লালমোহন গাঙ্গুলীর সৃষ্টি। ঠিক সাধারণত্ব দেখাবার জন্য নয়।
ফেলুর চরিত্রচিত্রণে অনেকেই মৌলিকতা দেখেছেন। অবশ্যই ফেলু কারও অনুকরণে পরিকল্পিত নয়। তবু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জয়ন্ত এবং বিমল— দু'জনের সঙ্গেই ফেলুর

একটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। এই দুটি যুবকও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। অতীব সবল শরীর, সাহস, দৈহিক পটুত্ব, খানিকটা ভালো খাবার সম্পর্কিত উপভোগ— এই সবেতেও কি একটু মিল নেই? হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পর্কে সফিস্টিকেশন-এর অভাবের অভিযোগ তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ওই সফিস্টিকেশনটুকু ফেলু মিত্তিরের অতিরিক্ত গুণ। ফেলুদার গল্পগুলিতে একাধিক বালক চরিত্রের সংযোজনও ছোটদের আকর্ষণের একটি কারণ। এই সংকলনের 'সমাদ্দারের চাবি' গল্পে আছে তেমনি একটা বালকের কথা। সাধন সেন। যার নামের বর্ণগুলিতে সা ধা নি সা নি এই সুরের বর্ণলিপি আছে— সেই সূত্র ধরে রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছে ফেলু। সত্যজিৎ রায়ের গল্প-ভুবনে কোনও বালিকা নেই। এ কথার উল্লেখ করেছেন অনেকেই। আমরাও সে কথা স্মরণ করি আর একবার। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের সমাজে 'ছেলেদের' প্রতি যে পক্ষপাত চলে এসেছে— এই বালিকা-উদাসীনতা কি তারই একটি প্রকাশ? সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্য প্রায় নারী-বর্জিত।

গোয়েন্দা-গল্পের মূল শক্তি কিন্তু ডিটেকশন-এ। সব দেশের সার্থক গোয়েন্দা-গল্পের মতোই সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পেও কখনও ডিটেকশন অত্যন্ত ক্ষুরধার ও চমকপ্রদ; কোথাও কিছুটা গতানুগতিক। দু-চারটি দুর্বল গল্পও আছে। কিন্তু আমাদের সামান্য আপত্তি থেকে যায় অন্য একটি ক্ষেত্রে। দু-চারটি ডিটেকটিভ গল্পে (এই সংকলনে তেমন গল্প নেই) সত্যজিৎ রায় রহস্যের গ্রন্থিবন্ধনে, গ্রন্থিমোচনে এবং বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় রূপে জাতিস্মরত্ব, হঠাৎ করে পাওয়া কোনও রহস্যময় শক্তি (যেমন 'নয়ন রহস্য' গল্পে), হিপনোটিজ্‌ম্ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। আমরা জানি, সত্যজিৎ রায় একাধিক জায়গায় বলেছেন যে, এগুলি সম্পর্কে তাঁর মন কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে নেয়নি। এগুলি থাকতে পারে, হয়তো বা আছে। অন্য ধরনের গল্পে তিনি বহু ধরনের অলৌকিক সংঘটনকে ব্যবহার করে জমাট গল্প লিখেছেন। অন্য ধরনের গল্পের ক্ষেত্রে আমার আপত্তি হবে না। অতিপ্রাকৃত রসের গল্প লিখতে এবং উপভোগ করতে গেলে এই প্রকল্পটি মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু গোয়েন্দা-গল্পের ক্ষেত্রে যদি এসবের অনুপ্রবেশ ঘটে তা হলে প্রাকৃতিক ভিত্তিই হয়ে পড়ে দুর্বল। ... পূর্ব-জন্মের স্মৃতি আর হিপনোটিজ্‌ম-এর শক্তি গোয়েন্দা-গল্পের উপাদান হবে তা হলে কেন নয় জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী, স্বপ্নদর্শন, দৈব নির্দেশ? তবে এরকম গল্প খুবই কম লিখেছেন সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ ছোট গল্প—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সম্ভারে স্থান পাবার যোগ্য সেগুলি। কিন্তু তাঁর অনেকগুলি ছোটদের গল্পই ঠিক ছোটদের জন্য নয়। বহু আলোচিত একটি প্রসঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ছি আমরা। ছোটদের আর বড়দের সাহিত্য বলে আলাদা কিছু আছে কি না। অবশ্যই আছে। ছোটদের জন্য লেখা যে-কোনও রচনাই বড়রাও উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু বড়দের জন্য লেখা সব কিছু ছোটরা উপভোগ করতে পারে না শুধু নয়, তা করতে দেওয়া উচিতও নয়। জানি, এমন কথা অনেকে তুলবেন যে, ছেলেবেলায় বড়দের বইও তাঁরা পড়েছেন—তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি ইত্যাদি। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়নি বলে কারও ক্ষেত্রেই হবে না— এমন নয়। এসব ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রকার ও ব্যাপকতা সব সময়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অন্তত, দূরদর্শনে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন— যা বড়দের জন্য তৈরি অথচ ছোটরা অবাধে দেখে—তাতে বিশ্ব জুড়ে শিশুদের ক্ষতিই হচ্ছে— এটাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

সত্যজিৎ রায় স্বরচিত গোয়েন্দা-গল্পের ক্ষেত্রে বয়স্ক-উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন— 'বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোট বড় সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। আমার যদি কোনও কৃতিত্ব থাকে তবে সে হল এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণ। তবে এমন কোনও ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।' (সাক্ষাৎকার, টেলিভিশন পত্রিকা, অগাস্ট, ১৯৯০।) 'বয়স্ক উপাদান' নামে একটি স্বতন্ত্র উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সত্যজিৎ রায়। ছোট গল্পগুলিতে এই উপাদানের মিশ্রণ কিছু বেশিই।

নর-নারী সম্পর্ক তথা যৌন বিষয় একটি বয়স্ক-উপাদান যা সত্যজিৎ রায়ের তিনটি মাত্র ছোট গল্পে ব্যবহৃত—'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', 'পিন্টুর ডায়রি' এবং 'ময়ূরকণ্ঠি জেলি'। এই তিনটি গল্প এবং 'সবুজ মানুষ'—যে গল্পের মূল বক্তব্যটিই ছোটদের চিন্তার আওতার বাইরে— সত্যজিৎ রায়ের সম্পূর্ণ বয়স্ক-পাঠ্য গল্প বলে চিহ্নিত। এগুলি এই সংকলনে নেই। কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলির মধ্যেও ছোটদের জন্য পরিকল্পিত উপাদান কতটুকু? ধরা যাক এই সংকলনের 'বারীন ভৌমিকের

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার নিশান উড়িয়েছিলেন যে অনন্যসাধারণ মানুষটি, উপন্যাসের আধারে সেই টিপু সুলতানের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, জীবনে-যুদ্ধে আত্মত্যাগের আশ্চর্য কথকতা— প্রকাশিত হলো
দ্বৈপায়নের নতুন ঐতিহাসিক উপন্যাস
টিপু সুলতান ৮০.
চার কালার অফসেট প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী
জাহানারা রোশেনারা ৩৫.
মডার্ন কলাম ❑ ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

বিভূতিভূষণের জন্ম-শতবার্ষিকীতে
অমর শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করুন
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য রচিত
বিভূতিভূষণ/তারাশঙ্কর : ব্যক্তিরূপ
নিজে পড়ুন : পড়ান : উপহার দিন
পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অশনি সংকেত, ইছামতীর মত চিরন্তন সৃষ্টির কারিগর বিভূতিভূষণ (অপু) এবং কবি, বিচারক, দুইপুরুষ, গণদেবতার স্রষ্টা তারাশঙ্কর (শিবনাথ) মানুষ কেমন ছিলেন জানুন। রচনার বিশিষ্টতায় গল্পের আমেজে হৃদয়ের ছোঁয়াটুকু মহান্ শিল্পীদের পাঠকের খুব কাছে এনে দিয়েছে। সমকালের অন্যান্য সাহিত্যকর্তা মানিক বন্দ্যো, মনোজ, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ এবং আরও অনেকে হাজির। গবেষকদেরও এ জাতীয় ঘনিষ্ঠ স্মৃতিকথার সাহায্য নিতেই হবে ॥ পঁচিশ টাকা ॥
ইস্পাতের স্বাক্ষর, অ্যালবার্ট হল-এর স্রষ্টা
গৌরীশঙ্করের নবতম গল্প-সংগ্রহ
এর নাম সমাজদেহ পঁচিশ টাকা
চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ/১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রিট, কল-৭৩

প্রকাশিত হলো :
বেদুইন-এর
কাজলদীঘির হাসপাতাল
৩০.
লেখকের : সিয়া একটি গোপন চক্র ২৪.
মানবাত্মার সন্ধানে ৪০. উলঙ্গ বুভুক্ষা ৩০.
বন্দীর কারাগার ২২. পথে প্রান্তরে ৩৫.
অন্তরে রাধা ২৮. অতঃ কিম্ ৩০.
হ্যানয় থেকে সায়গন ২০.

প্রকাশিত হয়েছে : কালকূট-এর
জনক ৩০.০০
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
রহস্যভেদী বাসব (চম) ৫০
লেখকের : রহস্যভেদী বাসব
(১-৭ খণ্ড, প্রতি খণ্ড ৪০.০০)
জানু ভানু কৃশানু ৪০. রক্তাক্ত খাইবার ৩৫.
মরণ দোলায় দোলা ৩৫. লিঙ্কনের শেষ বিচার ১২
সাহিত্য প্রকাশ, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

তিপ্পান্ন বছর পর প্রকাশিত হয়েছে

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-সংখ্যা

রবীন্দ্র-তিরোধানের অব্যবহিত পরে প্রখ্যাত লেখকদের শ্রদ্ধার্ঘের সংকলন শনিবারের চিঠির রবীন্দ্র-সংখ্যা—যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। লেখকসূচীতে আছেন : অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, অতুল বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস ছাড়া আরও কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল এই স্মরণ-সংখ্যাটি। অনেকগুলি বিরল ফটো ও আঁকা ছবি এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ যুগের পাঠকেরা এই দুর্লভ সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ তাঁদের সংগ্রহে অবশ্যই রাখবেন। ৪০.০০

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

চিরায়ত সংকলন

রঞ্জনকুমার দাস সম্পাদিত

শনিবারের চিঠি

গল্প-সংকলন ১০০

বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে নানা বিষয়বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল এক আশ্চর্য এবং অভিনব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে শনিবারের চিঠি। শুরু থেকে শনিবারের চিঠির আসর সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য হয়েছে। দীর্ঘ জীবনে এই পত্রিকা প্রত্যক্ষ করেছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রতিক দাঙ্গা, দেশবিভাগজনিত নানা সমস্যা ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি। প্রবন্ধ-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-ব্যঙ্গ-কার্টুন ও সম্পাদকীয় রচনায় শনিবারের চিঠিকে দীর্ঘকাল যাবৎ সমৃদ্ধ করেছেন সমকালীন বঙ্গসাহিত্যের দিকপাল রথী-মহারথী সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দ। সুদীর্ঘ ষাট বছরের শনিবারের চিঠি থেকে প্রভূত পরিশ্রম সহকারে প্রখ্যাত গল্পলেখকদের নির্বাচিত একটি করে গল্প নিয়ে এই চিরায়ত গল্প-সংকলন প্রকাশিত হল।

প্রকাশের পথে

শনিবারের চিঠি

ব্যঙ্গ-সংকলন

আনুমানিক মূল্য ১০০

আবার পাওয়া যাচ্ছে

শরৎ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

(জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

নাথ পাবলিশিং C/O নাথ ব্রাদার্স

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ব্যারাম' গল্পটির কথা। কেউ কেউ এই গল্পটিকে একটি অসামান্য নির্মাণ বলেছেন। সেই অসামান্যতা পরিবেশ বর্ণনায়, চরিত্র উদ্ঘাটনে ও ভাষার প্রয়োগে সত্যিই আছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর অসম্ভব কৃত্রিমতা গল্পটির একটা দুর্বল জায়গা, তাতে সন্দেহ কি ? দু'জন ক্লেপটোম্যানিয়াক্-এর দেখা হল চলন্ত ট্রেনে। একজন চুরি করে নিল অপরজনের ঘড়ি। তারপর সে এই রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়েছে। বেশ কিছুকাল পরে আবার সেই দুই ব্যক্তির দেখা হল সেই ট্রেনেই ! ঘড়িটি সে ফেরত দিয়ে দিল অপর ব্যক্তিকে। কিন্তু অপর ব্যক্তিটিও একই রোগগ্রস্ত। সে এক ফাঁকে চুরি করে নিয়েছে প্রথম ব্যক্তির কিছু কিছু জিনিস। এই হল গল্প। অসম্ভব সমাপতন-জনিত প্লট সংগঠনের কষ্ট-কল্পনা বাদ দিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়— ছোটরা কী পাবে এই গল্প থেকে ? তারা জানবে চুরি করা একটা অসুখও হতে পারে। এই জ্ঞান থেকে তাদের মনে চুরি করা সম্পর্কিত প্রতিরোধ দুর্বলও হয়ে পড়তে পারে। বালক তার বন্ধুর একটি সুদৃশ্য খেলনা বা কলম চুরি করে ফেলবার পর অসুখের অজুহাতে নিজেই নিজেকে ভাবতে পারে নির্দোষ। দুই ক্লেপটোম্যানিয়াক পরস্পরের জিনিস চুরি করেছে—কৌতুক হিসেবেও এটাকে তেমন সূক্ষ্ম রুচির নিদর্শন বলা যায় না। মানুষের অসুখ নিয়ে কিসের কৌতুক ? আবার দুঃখের গল্পও হয়ে ওঠেনি এটা। হলে বরং খারাপ হত না। গল্পটির বিবৃতিগুণ খুবই সুন্দর। সেদিক থেকে বয়স্ক পাঠকদের কিছুটা উপভোগ্যতা সঞ্চারিত হয়—এইমাত্র। 'বাতিকবাবু' গল্পে এক ব্যক্তি সংগ্রহ করে এমন সব বস্তু যার সঙ্গে কোনও-না-কোনও অপরাধ জড়িয়ে আছে। মনশ্চক্ষে সে সেইসব অপরাধের ছবি দেখতে পায়। এইভাবে একটি আংটি সংগ্রহ করবার উত্তেজনায় সে নিজেই আংটির মালিককে হত্যা করে। তারই লাঠিতে লেগে থাকে আংটির মালিকের রক্ত। কাজেই তার লাঠিও এখন সংগ্রহশালায় রাখার উপযুক্ত। আগাগোড়াই ঈষৎ অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ মাখা একটি গল্প। নির্মাণও চমৎকার। কিন্তু এই গল্পটি কিংবা 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও'— যেখানে কেবল মৃত মানুষদেরই ছবি আঁকা হয়— ছোটদের খুব বেশি আনন্দ দেবে বলে মনে হয় না। পরিবর্তে তাদের মনে জমিয়ে দিতে পারে কিছু ভয় ও কুসংস্কার। তবে ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনা চিরকালই থাকে, তবু ছোটদের জন্য ভূতের গল্প লেখা হয়ে আসছে চিরকাল। ছোটরা ভয়ও পায়, আবার উপভোগও করে খানিকটা। গগন চৌধুরীর স্টুডিও-তে সেই উপভোগ্যতার দিকটাও আছে। 'বাতিকবাবু'-তে অপরাধ-মনস্কতা সেই উপভোগ্যতা কিছুটা ব্যাহত করেছে ছোটদের ক্ষেত্রে। বড়রা ঠিকই উপভোগ করবেন। সাহিত্য নিশ্চয়ই নীতিবাগীশ হবে না। তবু ছোটদের জন্য লেখবার সময়ে ছোটদের মন তৈরি করবার একটা দায়িত্ব কি থাকে না লেখকের ? সাহিত্য থেকে কি ছোটরা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিখবে না ? শিখবে না কোনও মানুষকে ছোট না ভাবতে ? অতিরিক্ত ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, লোভ না করতে শেখা ; সাহস, দয়া, পশুপাখির প্রতি সদয় ব্যবহার— ইত্যাদি আজকের বালক-বালিকারা সাহিত্য থেকেই শিখবে প্রধানত। জীবন তো তাদের ছোট পরিবারের সদা-তৎপর রক্ষণাবেক্ষণ আর বিপুল ক্লাসের পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প থেকে বালক-বালিকারা কখনও সেরকম শিক্ষা পায় না এমন নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— 'সত্যজিৎ রায়ের গল্পে বাইরে থেকে ভিতর থেকে কোথাও থেকেই কোনও উপদেশ নেই।' (গল্পের দর্পণে সত্যজিৎ রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপ্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬।) এরকম কথা বলেছেন আরও কেউ কেউ। কিন্তু সর্বাংশে কথাটি মানতে পারি না। 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর' একটি স্পষ্ট নীতি-সমুজ্জ্বল গল্প, যার নীতিকথাটি হল : টাকা দিয়ে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায় না। 'খগম্' গল্পের অতিপ্রাকৃত রসের অপরূপ শিল্পায়নের সঙ্গে সাপটির প্রতি অকারণ নিষ্ঠুরতার শাস্তির ব্যাপারটাও জড়িত। এই সংকলনেরই 'অনুকূল' গল্পটি থেকে গৃহভৃত্যের প্রতি আচরণ বিষয়ে ছোটদের চোখ খুলে যেতে পারে। 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'ও সরল ভালো মানুষদের সম্পর্কে বালকদের ভাবাতে পারে। 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাস থেকে আজকের বাংলার বাবলুরা হারুন আর ফটিকচাঁদদের চিনে নেবে— এটাই তো এক বিরাট নীতিশিক্ষা। কিন্তু এই সংকলনের কয়েকটি গল্প থেকে সেরকম কোনও অনুভূতি ছোটরা পাবে না— পাবে কিছুটা কুসংস্কার-জড়ানো ভয়ের ভাব। 'ভুতো' আর 'অনাথবাবুর ভয়' গল্প দুটিও এই জাতীয়। গল্পগুলির বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। গল্পগুলি ছোটদের সংকলনভুক্ত করাতেই আমাদের সামান্য আপত্তি। তাঁর অনেক ছোটদের গল্পে খুব স্বাভাবিকভাবে জুয়া খেলার প্রসঙ্গ এসেছে। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট' একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রচনা। অঙ্কন-প্রতিভা আর মানব-স্বভাবের প্রসন্নতা মিলে গল্পটিকে নতুন এক রস দিয়েছে। 'অঙ্ক

স্যার গোলাপীবাবু আর টিপু' গল্পটির কল্পনা-সৌন্দর্য মনে গেঁথে যায়। এই জাতের গল্পে অ-লৌকিক থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে কুসংস্কার জড়িয়ে থাকে না। আজকের ছোটদের পাশাপাশি আজকের অনেক বড়দের জন্যও একটু উপভোগ্য উপদেশ আছে গল্পটিতে। 'শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত' বিশেষভাবে ছোটদেরই ভালো লাগবে। সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের বিপুল জনপ্রিয়তা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে সে বিচার করা এখনই সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর তুলনাতীত জ্যোতির্ময়তা সম্ভবত তাঁর সাহিত্যিক মূর্তিকে এখনও কিছুকাল অনেকখানি বাড়তি আলো জোগাবে। আমরা আরও লক্ষ করি— সমসাময়িক সমাজ ও নাগরিকতার নির্যাস তাঁর গল্পগুলিতে খুব বেশি। এ-জাতীয় লেখা সমকালে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সময়টি চলে গেলে কালোত্তরণে সব সময়ে ততটা সফল হয় না সেই লেখনী-চারণ। স্বকালের জনপ্রিয়তার হৃৎস্পন্দনটি খুব চমৎকার বুঝতেন সত্যজিৎ রায়। যে কারণে যৌন উপাদানটি ছাড়া অন্যান্য বয়স্ক উপাদান সমন্বিত গল্পগুলির সব ক'টিকেই ছোটদের সংকলনভুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর গ্রন্থ। তার ফলে ছোটরা ও বড়রা মিলে তৈরি হয়েছে এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের বহু ছোট গল্প আছে যেগুলিতে যৌনতার উপাদান নেই। কিন্তু সেগুলি ছোটদের সংকলনভুক্ত করে কখনও প্রকাশ করেননি তাঁরা। সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ ষাটের দশকে। জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি বিস্তৃত বাজার ওই দশকেই বাংলার প্রকাশনার জগৎকে অধিকার করতে শুরু করেছে। উচ্চ মধ্যবিত্তের রুচির অনুসারী 'পপুলার' সাহিত্যের একটি পরিষ্কার ধারণাও ওই সময়েরই উৎপাদন। পপুলারিটির দাবিতে সত্যজিৎ রায় নীতির সঙ্গে কখনও কখনও আপোস করেছেন তার একটি প্রমাণ থেকে গিয়েছিল কিশোরদের জন্য নির্মিত 'ফটিকচাঁদ' চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বড়দের জন্য তৈরি 'পিকু' ছবিটি একত্রে পরিবেশিত হবার ব্যাপারে তাঁর সম্মতিতে। সাহিত্যের আলোচনাতেও সেই আপোসের প্রসঙ্গ একটু এসে যায় তাঁর সংকলনগুলির পরিকল্পনায়। অ-গভীর জনপ্রিয়তার উপাদান কত মসৃণভাবে রচনাভুক্ত করতে পারেন তিনি তার প্রকৃষ্ট একটি নিদর্শন এই সংকলনের 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'— যেন কৌশলে উপস্থাপিত একটি মারদাঙ্গা হিন্দি সিনেমা।

সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহেই এক সফল সাহিত্যিক। তবে বড়দের রুচি ও বুদ্ধির কাছে যতটা আকর্ষক তাঁর রচনার আবেদন— গোয়েন্দা গল্পগুলি বাদে— ছোটদের কাছেও ততখানি কি না তার বিচার হবে আরও কিছুকাল পরে কালের তুলাদণ্ডে। কলকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালিজীবনের রসবৈচিত্র্যের রূপবিভঙ্গ পাই তাঁর গল্পে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবিও যেন বাঙালির দেশভ্রমণের বর্ণনা। তার চেয়ে বেশি, তার চেয়ে গভীর কোনও উপলব্ধি বয়স্ক পাঠকের জন্য তিনি রেখেছেন যে কয়েকটি গল্পে, সেই কয়েকটির জন্যই তিনি চিরকালের সাহিত্যিক থাকবেন হয়তো।

সুমিতা চক্রবর্তী

●

ভাষান্তরিত কবিতা

অন্য দেশের কবিতা/ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ২৫.০০

ফর ইউ নীরা : লাভ পোয়েমস অব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(অনু) সুরভি ব্যানার্জি
রূপা অ্যান্ড কোং/ কল-৭৩/ ৯৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একসময়ে বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন প্রচুর, আর এখন তাঁর কবিতাই বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে— এই আশ্চর্য ও উপভোগ্য দ্বৈতের মধ্যে রয়ে গেছেন বর্তমান আলোচক, এটা তাঁর সৌভাগ্য। সৌভাগ্য, কেননা তিনি সুনীলের সমকালীন, তাই তার উত্থান, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পর্বগুলি সগর্ব পর্যবেক্ষণের বিষয়। 'অন্য দেশের কবিতা' নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে বইটি এখনকার আলোচ্য তার কবিতাগুলি 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুরোধে তিনি একসময়ে লিখেছিলেন। কাছাকাছি সময়ে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে কবিতাগুলি গ্রন্থিত হয়ে দুই মলাটের মধ্যে স্থায়ী হয়। এখন, ১৪০০ বঙ্গাব্দে, সেই বইটির আনন্দ সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের করায়ত্ত হল। একশো বত্রিশ পৃষ্ঠার এই ছিমছাম কাব্যগ্রন্থে রয়েছে ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, স্প্যানিশ ও রুশ কবিতার অনুবাদ, পাঁচটি গুচ্ছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সূচনাতে সেই বর্গের কবিতা সম্পর্কে সুনীলের ঈর্ষাজনক গদ্যে লেখা একটি করে পরিচিতি

রঙিন ফটোগ্রাফি শিক্ষার বই
অশোক দে'র
ফটোগ্রাফি ডার্করুম ৪৫
রূপা, দে বুক, বিশ্বাস, শৈব্যা নাথ ব্রাদার্স, কলি-৭৩
ফটো হাউস ১৭৩/২ বিধান সরণী, কলি-৬

প্রাণাচার্য
রক্তচাপের প্রাকৃতিক চিকিৎসা ১৫
পারিবারিক বায়োকেমিক চিকিৎসা ২৫
অর্ঘ্য দাশ
গোরখপুর রহস্য ১৬
এই আমার কলকাতা ১৬
কলাচিহ্ন :
দঃ গোবিন্দপুর, দঃ ২৪ পরগনা ৭৪৩৩৫৩, পঃবঃ

গ্রীক ভাষায় **ডিনোস** মানে ভয়ঙ্কর, আর **সোরস** মানে গিরগিটি...
শুধু জুরাসিক পার্ক নয়
আরও আরও অজস্র রোমহর্ষক ঘটনার জীবন্ত দলিল
অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের
চুপ ! ডাইনোসররা এসে গেছে ১৫/-
প্রাপ্তিস্থান : **সন্ধ্যা প্রকাশনী**, ৫৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

অপুর পাঁচালী
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
বিভূতিভূষণকে সাধারণ বলে মনে হয়, বুড়ো হাজরা, কাছিমদ্দি, নালু পাল বা হাজারি পরোটার সঙ্গে বেশভূষায় সমগোত্রীয় বলে ভুল হয় — হেটো মেঠো গরীব ঘরেই তার দরদী প্রদীপ হাতে প্রবেশ। পথের কথা, আকাশ মহাকাশ থেকে তৃণভূমি, প্রাচীন থেকে অনাগত দূরভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিশ্বচরাচর এই শিল্পীর গতিপথ। তাই তিনি সাধারণ হয়েও অসাধারণ। তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও স্নেহের দরদে শিল্পী স্বকীয় জ্ঞান, উপলব্ধির সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রকৃতি—মানুষের জগতে হাত ধরে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেছেন এমন লেখকের এই গ্রন্থটিকে বিশাল সাগরসদৃশ মনোলোকে দিক প্রদর্শী আলোকস্তম্ভ বলা যায়। বিভূতি প্রসঙ্গে হাজারো লেখা প্রকাশিত হওয়া উচিত— হবেও। কিন্তু তাঁকে চিনতে হলে এই 'অপুর পাঁচালী' পড়তেই হবে। দাম : ৪০
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

সদ্য প্রকাশিত হলো
বিমল কর **দ্বন্দ্ব** ৩২
শক্তিপদ রাজগুরু **বন বাংলো** ৪০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় **রাতপাখি** ৩৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ **নাগমিথুন** ৩৫
শ্রীপারাবত **রাজ রাজেশ্বরী** ৩০
আলবার্তো মোরাভিয়া **ফ্যান্সিড্রেস পার্টি** ৩০
বরুণকুমার চক্রবর্তী **বিশ্বসেরা গল্প গাথা** ৩০
সৌরেন দত্ত সম্পাদিত **গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনী** ২৫
শ্রীপারাবত **রাত মোহানার রহস্য** ২৫
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিঃ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ফোন : ২৪১-০৩৬২

৯৫ বছর পরে 'পুনর্মুদ্রিত হলো
কবি নবীনচন্দ্র সেনের একমাত্র উপন্যাস ভানুমতী ২০
১২৫ বছর পরে প্রকাশিত হলো—প্রতাপচন্দ্র ঘোষের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস
বঙ্গাধিপ পরাজয় ৭০
অজিত পুততুণ্ডর—মননশীল উপন্যাস
অবিচ্ছিন্ন ৪০
দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস (৪ খণ্ড) ৪৮০
নবধারা/অমৃতধারা ৮ পটুয়াটোলা লেন, কল-৯

বাল্মীকি রামায়ণ
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ অনূদিত
স্বচ্ছ আধুনিক বাংলা গদ্যে সপ্তকাণ্ডের অনুবাদ। শব্দার্থ, রামায়ণে উল্লিখিত স্থানের পরিচয় ও মানচিত্র, অনুপম চিত্র রেখাচিত্রে অলংকৃত।
২ খণ্ডের মূল্য ৩০০ টাকা
এককালীন গ্রাহক মূল্য ২০০ টাকা। গ্রাহক হয়ে প্রথম খণ্ড (বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড) এখনই সংগ্রহ করুন।
জয়শ্রী প্রকাশন। ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

বাঈজি জীবনের অন্ধকার জগতের কাহিনী
চিত্রগুপ্ত-র
গহরজান ৪০.০০
আদালতের নথি থেকে উদ্ধার করা
সত্যাশ্রয়ী জীবনালেখ্য
শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯।

সম্প্রতি প্রকাশিত
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা
ও
বিভূতিভূষণের উপন্যাস
সাহিত্যায়ন :
১/১ বি, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বেস্টবুক্স্-এর জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তরল সোনা পেট্রোলিয়াম ২৫ টাকা
ডঃ দেবব্রত চন্দ্র
কালো হীরে : কয়লা ৩০ টাকা
ডঃ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়
সমুদ্র : শংকা ও আশংকা ৪০ টাকা
ডঃ জগৎজীবন ঘোষ ও ডঃ রমেন মজুমদার
মানুষের মস্তিষ্ক ২০ টাকা
ডাঃ সুনীল ঠাকুর
হাড়ের হরেক রোগ ৫০ টাকা
ডঃ অপরাজিত বসু
বুড়ো মানুষ একদিন প্রতিদিন ২৫ টাকা
বারিন ঘোষ, অলোক ভট্টাচার্য ও মনোজকুমার মান্না
ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ৩৫ টাকা
বেস্ট বুক্স্, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

আছে, যা উপলব্ধিজাত এবং কদাচ পাণ্ডিত্যের উপলখণ্ডে ব্যাহত নয়।

কবিতার অনুবাদ, বিশেষত বিদেশি কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে, সুনীল তাঁর নিজস্ব ধরনে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন বইয়ের গোড়ায় 'অন্য দেশের কবিতা : বিংশ শতাব্দী' শিরোনামে। মন্তব্যগুলি উত্তেজক, কারও কারও পক্ষে নিশ্চিত বিতর্কযোগ্য ; কিন্তু অনুবাদকের আত্মপক্ষ হিসাবে অপরিহার্য। এমন কয়েকটি বাক্য আমি চাই পাঠকরা প্রথমে পড়ে নিন।

"১. মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা, গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এ জন্য আমি নিজেকে তেমন অপরাধী হিসেবে মনে করি না ; তার প্রথম ছোট কারণ, শব্দের সৌকুমার্য যখন ভাষান্তরিত করা অসম্ভব, তখন মূল ভাষা জানার প্রশ্ন জরুরি নয়। ২. আমি এ দায়িত্ব নিতে যে পরান্মুখ হইনি, তার কারণ আগেই বলেছি, এ-কাজটাকে আমি খুব গুরুতর মনে করি না। আমি নিজে যেমন অনুবাদ কবিতার কাছে বিশেষ কিছু দাবি করি না, যা দাবি করি, তা আমার পক্ষেও পরিবেশন করা সম্ভবত শক্ত নয়। এখানে বিশেষ কোনো প্রতিভা বা মেধার প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম। ৩. ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে লাভজনক, কিন্তু সম্মানজনক নয়।পরভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে এ-রকম উদাহরণ এ পর্যন্ত দু' তিনজন মাত্র, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে এখনো একজনও নয়।"

সুনীল কীভাবে পাঁচটি পরভাষার কবিতাবলি অনুবাদ করেছেন, সেই তাঁর অনুবাদপদ্ধতি সম্পর্কে যা বলেছেন তাও বেশ চমকপ্রদ। বলেছেন :

"আমার অনুবাদের পদ্ধতি এইরকম : আমি প্রথমে মূল কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে যত দূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করেছি, তারপরে প্রুফ দেখার সময় মূল কবির কথা প্রায় ভুলে গিয়ে, রচনাটি যাতে বাংলায় সুসহ হয় এইজন্য বেপরোয়াভাবে শব্দ কেটেছি ও বদলেছি।"

অনুবাদকের এমন প্রগলভ আত্মপক্ষের পর সমালোচকের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। তিনি বিতর্কের চাবিকাঠি ব্যবহার না করে স্বচ্ছভাবে কবিতাগুলি পড়েন এবং পড়তে ভাল লাগে। 'অন্য দেশের কবিতা' পাঠের এটাই নিট লাভ যে, রচনাগুলি কবিতা হয়ে উঠেছে এবং সুখপাঠ্য। পড়তে পড়তে অবশ্য এমন অনেক কবিতা পাই যা ইংরেজি বা একাধিক বাংলা অনুবাদে পড়েছি। তাতে বর্তমান পাঠে কোনও বিঘ্ন বা রসঘটিত প্রত্যবায় হয় না। এ বই নির্ভয়ে সকলকে পড়তে বলা যায়। ভারহীন, স্পষ্ট ও দ্যোতনাময় অনুবাদ। এতে আছে পাঁচ দেশের পাঁচ ভাষার কবিতা, কিন্তু পাঁচমিশেলি নয়। কবিতা চয়নে অনুবাদক সতর্ক। তাঁর নির্বাচিত কবিরা সবাই বিংশ শতাব্দীর। যদিও অনেকের জন্ম উনিশ শতকের ষাটের দশকে। আবার এমন কিছু কবি আছেন যাঁরা এ শতাব্দীর চল্লিশের বা তার পরের কবি। রাশিয়ার এফতুশেংকো কিংবা ভজনেসেনস্কির সাড়া-জাগানো কিছু কবিতা যেমন সুনীল রেখেছেন তেমনই অকটাভিও পাজ, ইনগেবর্গ বা খমানও গৃহীত হয়েছেন। ফরাসি, রুশ, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান ও জার্মান কবি বলতে সচরাচর আমরা যাঁদের আধুনিক পর্বের মানুষ বলে জানি, সুনীল তাঁদের সমাদর করেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক কালে বাংলা অনুবাদ-কবিতার শাখাটি বেশ সমৃদ্ধ এবং তার মূলে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র আদি প্রবর্তনার পর বহুজন তৎপর। শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জনের অনূদিত সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত' তো বিখ্যাত। বিচ্ছিন্নভাবে নানা সময়ে নানা জন বিদেশি কবিতা, এমন কি কোনও একজন কবির অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন। পল ভালেরি, পল এলুয়ার, সাঁ-ঝঁ প্যার্স, জুসেপ্পে উনগারিতি, রিলকে, বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ, লোরকা, পাবলো নেরুদা ও মায়াকভ্স্কির প্রচুর কবিতা আমরা বাংলা অনুবাদে পড়েছি। একসময়ে বরিস পাস্তেরনাকের কবিতার বঙ্গানুবাদ বেশ সাড়া তুলেছিল। তার কারণ অনেকটা রাজনৈতিক, কিন্তু তাঁর নির্ভেজাল কবিত্ব সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। এফতুশেংকোকে নিয়ে একসময়ে শোরগোল হয়েছিল। সুনীল ১৯৬০ সালে লেখা ভজনেসেনস্কির জনপ্রিয় একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সংকলনে এটাই সম্ভবত সর্বাধুনিক কবিতা। কিন্তু ১৯৬০ সাল তো ১৯৯৪ সালে বেশ পুরনো। দুঃখ সেটাই। 'অন্য দেশের কবিতা' বইটির প্রস্তুত সংস্করণ হতে পারত আর একটু নধর। ইংলন্ডীয় ও মার্কিন কবিকুল অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। পড়তে ইচ্ছে করে সুনীলের অনুবাদে হালফিল ল্যাটিন অ্যামেরিকান কবিতা। তবু আপাতত যথালাভ। বিশেষভাবে উল্লেখ করব প্রত্যেক দেশের কবিতার আগে সেই দেশের কাব্যান্দোলন সম্পর্কে সহজ বোধগম্য পরিচিতি সংবলিত গদ্য। কবিদের পরিচায়ক ছোট ছোট রচনাগুলি মর্মস্পর্শী। বইতে একটাই ত্রুটি। সব কবিদের জন্মসাল উল্লেখ নেই এবং কবিদের কালক্রম মেনে কবিতা সাজালে ভালতর হত। কবিদের কারও কারও জন্মসাল না থাকায় বিপত্তি ঘটে। যেমন জার্মান কবি ওকোপেঙ্কো সম্পর্কে অনুবাদক লিখছেন : 'তাঁর বয়স এখন ৩৬, এই কবিতাটি ২৯ বছর বয়সে

লেখা।' এখন বলতে কোন্ বছর ? ১৩৭৩ সালে না ১৪০০ সালে ?

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাহান্নটি প্রেমের কবিতার সংকলন For You Neera । চকচকে ঝকঝকে বই, চিত্রশোভিত, বর্ণময় জ্যাকেট। বইটি হাতে নিলেই মন ভরে যায়। আধুনিক বাংলার একজন অগ্রণী কবির কবিতার ইংরাজিতে অনুবাদগ্রন্থ বেরিয়েছে এটা ভাবতেই বেশ ভাল লাগে। এটাও বোঝা যায় কবি হিসেবে সুনীল কতটা প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব পেয়েছেন। তাঁকে যাঁরা প্রথম কবিতা রচনা প্রকাশের সময় থেকে জানেন তাঁদের পক্ষে এটা আহ্লাদের বিষয়। তা ছাড়া এমনিও প্রধান বাঙালি কবিদের ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের আন্তর্জাতিক ও সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে। বাংলা কবিতার প্রচার দরকার। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় তাই একটা কাজের কাজ করেছেন। ভরসা করি শুধু সুনীল-অনুবাদেই তাঁর কাব্যপ্রীতি শেষ হবে না।

বইয়ের নাম For You Neera হলেও বাহান্নটি অনূদিত কবিতার সবই নীরা বিষয়ক নয়। তবে নীরা বিষয়ক কবিতা অনেকগুলি আছে, যা লিখে একসময়ে সুনীল বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কে এই নীরা ? সুনীল এবং সুরভি এ ব্যাপারে ভূমিকায় দু-এক কথা লিখেছেন, তার অনেকটাই আমরা আগে থেকে জানি। তবে সুরভি যখন লেখেন, 'Neera remains a perpetual enigma... Distant, inpalpable and at times abstract, yet far too tangible and concrete to be as idealized as Petrarch's Laura or Dante's Beatrice' তখন উচ্ছ্বাস মনে হয়। যাই হোক, সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ মোটামুটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। সুনীলের মূল কবিতা পাশাপাশি নিয়ে, মিলিয়ে পড়ে, তবে এ কথা লিখছি। তবু যাঁরা এসব কবিতা আগে বাংলায় পড়ে অভ্যস্ত তাঁদের কিছু অস্বস্তি লাগে। একটি নমুনা দেওয়া যাক অনুবাদকের অসহায়তার : 'নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি/ খেলা করে/ কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক/ সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো/ সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে।'

'The birds in her sari frolic on her smiling breasts/ A wave surges and swerves in a trica from her hips and waist/ She holds up towards the dusk her glowing smile/ the sparkling inscape of this world.'

কিছু করবার নেই, অনুবাদের এই মুশকিল। সংসারের সারাৎসার বলতে বাঙালি পাঠকের মনে যে অনুষঙ্গ জেগে ওঠে অনুবাদে কি সেটা আসে ? hip বললে কি শ্রোণী বুঝব আমরা ? দাঁতের আলো সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরা একেবারে সুনীলের নিজস্ব কবি-ভাষা, সে কি আর glowing smile-এ ধরা যায় ? এইরকম, তবু মন্দ কি ? অনুবাদককে আমি সাধুবাদই দেব। বইয়ের শেষে glossary-তে Swarnakumari and Pratibha সম্পর্কে সুরভি লিখছেন Sisters of Rabindranath । হ্যাঁ, স্বর্ণকুমারী তাঁর ভগ্নী, কিন্তু প্রতিভা ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী। ভবিষ্যতে সংশোধনযোগ্য।

সুধীর চক্রবর্তী

●

ব্যাঘ্রপ্রেমিক সেই আশ্চর্য মানুষ

দ্য লিজেন্ড অফ দ্য ম্যানইটার/ অর্জন সিং
রবিদয়াল পাবলিশার/নতুন দিল্লি-৩/১৮০·০০

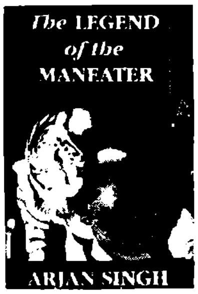

দুধওয়া ! এই আশ্চর্য নামটি প্রথম শুনি প্রয়াত পক্ষিতত্ত্ববিদ অজয় হোমের মুখে। প্রায় ষোল-সতের বছর আগে। অজয় হোম বলেছিলেন, 'এত পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বেড়াও, পারলে একবার দুধওয়া দেখে এসো।' যাওয়া হয়নি, কিন্তু অনুসন্ধান শুরু করি। কোথায় দুধওয়া, কিভাবে সেখানে যেতে হয় ? জানা গেল উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চল লখিমপুর-খেরী জেলার অন্তর্গত, একেবারে ভারত-নেপাল সীমান্তে। এককালে ওই হিমালয়ের পাদদেশে, বা লখিমপুর-খেরী জেলার অনেকটা পর্যন্ত ছিল ঘন গভীর অরণ্য এলাকা। তরাই অঞ্চলের একটা অংশ। ব্রিটিশ আমলেই বাণিজ্যলোভী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি পড়ে লখিমপুর-খেরীর জঙ্গলের অরণ্যসম্পদের দিকে, দামি গাছ কেটে আনার প্রয়োজনে বসানো হয় রেল লাইন। সাতাত্তরে আমি যখন খোঁজ নিচ্ছিলাম তখন কলকাতা থেকে সুবিধেজনক হলো সরাসরি ট্রেনে লক্ষ্ণৌ চলে যাওয়া। উত্তর রেলের যে ব্রডগেজ লাইন গেছে লখনউ থেকে বেরিলি সেটি নয়, উত্তর-পূর্ব রেলের অন্য একটি মিটার গেজ লাইন গেছে সীতাপুর, পিলভিট হয়ে বেরিলি। সেই লাইনে পৈলানী স্টেশন ১৯১

প্রামাণিক তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ
সুহাস মজুমদারের
● **নারীর মূল্য ও ইসলাম** ২৫
● **হিন্দু, মুসলমান ও তসলিমা নাসরিন** ১০
● **জেহাদ** (সম্প্রসারিত ২য় সংস্করণ) ১৫
গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধান সরণি, কলি-৬

অরবিন্দ পোদ্দারের
বঙ্কিম-মানস
বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মননে বঙ্কিমের অবদান অবিস্মরণীয়। মনোজগতে তাঁর ভূমিকা অবিতর্কিত। লেখকের মনের দর্পণে কীভাবে বঙ্কিম অনুরণিত হয়েছেন, গভীর অনুরাগে বঙ্কিমের সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে খুঁজেছেন তরুণ অনিসন্ধিৎসু গবেষক। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর সেই পরিশ্রমলব্ধ সমালোচনা। দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার পর মুদ্রিত হলো নতুন সাজে। ৪০ টাকা।
পুস্তক বিপণি । ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলি-৯

এবার পুজোয়
কিছু নূতন ও দুঃষ্প্রাপ্য আমাদের প্রকাশিত পুরাতন বই পাওয়া যাবে। এছাড়া আমাদের পরিবেশিত আরও কিছু বই পাওয়া যাবে।
৩রা অক্টোবর থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত পুস্তক সংগ্রহকারীরা তাঁদের নির্বাচিত পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন। পূজা স্টলের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারেও বই দেওয়া হচ্ছে।
ভাষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ
ড. সিরাজুদ্দিন আমেদ-এর
রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ১২৫.০০
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলি-৭

"বিষয়ের বিচিত্র বিন্যাস, অনাড়ম্বর কথনশৈলী, পরিমিতিবোধ্য এবং অন্তর ভঙ্গি বুঝিয়ে দেয়, তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা রক্তের মধ্যেই আছে।" সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
দেবকুমার বসুর
নির্বাচিত গল্প
প্রকাশিত হল ॥ দাম : ২৫ টাকা
লীলা মজুমদার অনূদিত
সচিত্র টারজান সমগ্র
কুমার অজিত চিত্রিত দাম : ১৫০ টাকা
ছোটদের আরব্য রজনী
সত্য চক্রবর্তী চিত্রিত দাম : ৫০ টাকা
মৌসুমী প্রকাশনী ॥ [illegible]

কিলোমিটার ; সেখানে নেমে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন ধরতে হবে। ঝিকঝিক আদ্যিকালের প্যাসেঞ্জার, তবে মাত্র চারটি স্টেশন পরেই দুধওয়া জংশন। দুধওয়া থেকে একটা লাইন চলে গেছে উত্তর-পশ্চিমে বনের শেষ প্রান্তে গৌরীফাঁটায়, উত্তর-পুবে আর একটা লাইন গেছে চন্দনচৌকি। দু দিকেই এরপর নেপাল। করবেট ন্যাশনাল পার্কের মতো দুধওয়াতে টুরিস্টদের ভিড় হয় না ; এত যে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিরা, তাদেরও এই ঝক্কি-ঝামেলা পোষায় না। অরণ্যের আদিম রূপ, বন্য পশু আর বিচিত্র গাছ-পাখি দেখতে যান শুধু সামান্য কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ আর অরণ্য-প্রেমী। এই লখিমপুর-খেরী জঙ্গলেই Dudhwa wild life Sanctuary যিনি গড়ে তুলেছিলেন প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ; এককালের দুর্ধর্ষ শিকারি, পরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণবাদী—অর্জন সিং। ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয়েছে এই প্রকৃতিপ্রেমিকের এক অনন্যসাধারণ আত্মকথা, যার সমালোচনা সূত্রেই এই গৌরচন্দ্রিকা। বাংলার সুন্দরবনের মতই লখিমপুর-খেরীর গহন অরণ্য প্রধানত বাঘের জন্য প্রসিদ্ধ। আশির দশকেও ওই অঞ্চলে বাঘের হাতে মানুষের প্রাণ হারানোর ঘটনার সংবাদ মাঝে মাঝে কাগজে বেরুত। বাঘের অনুষঙ্গে জিম করবেটের মতো আমাদের প্রায় অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় অর্জন সিং-এর নাম। বাঙালিরা বলতে ভালোবাসেন অর্জুন সিংহ, যদিও সঠিক উচ্চারণ অর্জন সিং। তাঁর স্মৃতিচারণের নামটিও চমৎকার— The legend of the Man eater। ব্যাঘ্রপ্রেমিক আশ্চর্য এই মানুষটির কাছে এটাই তো স্বাভাবিক। খাসা ইংরিজি, অত্যন্ত সুশোভন কাগজ-বাঁধাই-ছাপার কাজ, আকর্ষক রঙিন আর সাদা-কালো চিত্রাবলি সব বাহ্য, এমন সুখপাঠ্য বই পড়তে পাওয়া যেন এক অভিজ্ঞতা। আমি তো সালিম আলির The Fall of the Sparrow-এর পর এত চমৎকার আত্মজীবনী পড়িনি। সব চরিত্র, বনের পশু, নানা ঘটনাবলি যেন জীবন্ত, হয়ে চোখের সামনে ধরা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা না উল্লেখ করে পারছি না। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্রবীণ ভ্রমণকাহিনীকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বই 'দুধওয়া'। নাতিদীর্ঘ বইতে পড়লাম, তিনিও দুধওয়ার নাম আগে শোনেননি। লেখক লখনউ থেকে মোটরে, বনবিভাগের এক উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে, সীতাপুর লখিমপুর, গোলা গোকর্ণ, মৈলানি হয়ে অরণ্যে গেছেন সারদা নদী পার হয়ে। ইচ্ছে থাকলেও অর্জন সিং-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি ; তবে অভয়ারণ্য ঘোষণা করার নেপথ্য নায়ক হিসেবে অর্জন সিংকে প্রাপ্য সম্মান জানিয়েছেন শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদবাবু। এই সম্মান অর্জন সিং-এর অবশ্যই প্রাপ্য। ১৯৫৮-তে লখিমপুর-খেরীর জঙ্গলের ৬২ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল নিয়ে সোনারিপুর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ঘোষিত হবার পরের বছরই অর্জন সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গাড়লেন। সুহেলী নদীর ধারে তৈরি করলেন এক মস্ত ফার্ম, নাম Tiger Haven —বাঘেদের অভয় আশ্রম। সোনারিপুর স্যাংচুয়ারির আয়তন বেড়ে হয় ২১২ বর্গ কিলোমিটার। এবং নাম পালটে হয় দুধওয়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। অবশেষে ১৯৭৭-এর ১ ফেব্রুয়ারি অর্জনের প্রচেষ্টাতেই ভারত সরকার দ্বারা ওই অভয়ারণ্য 'ন্যাশনাল পার্ক' বা জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়, আয়তন বেড়ে হয় ৬১৩ বর্গ কিলোমিটার। এই অভয়ারণ্যে বাঘ ছাড়াও আছে বারাশিঙ্গা, গণ্ডার (অন্য জায়গা থেকে আনা), ভালুক, সম্বর, লেপার্ড, নীলগাই এবং অজস্র প্রজাতির সাপ ও পাখি। বিশেষ দ্রষ্টব্য বাঘ, গণ্ডার এবং বারশিঙ্গা হরিণ—যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে গোন্ড। এই দ্বাদশ শৃঙ্গ হরিণ আর কোথাও নেই। এই হরিণ আর অবশ্যই বাঘ সংরক্ষণই অর্জন সিং-এর অক্ষয় কীর্তি।

একজন অভিজাত পরিবারের সন্তান অর্জন (জন্ম উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর শহরে, ১৯১৭-র ১৫ আগস্ট) কিভাবে হয়ে উঠলেন দক্ষ শিকারি, আবার সেই শিকার কিভাবে রূপান্তরিত হলেন ব্যাঘ্র তথা প্রকৃতি-প্রেমিকে, সে কথা অনুপম ভঙ্গিতে শুনিয়েছেন অর্জন সিং বর্তমান বইতে সতেরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে। শিকারকাহিনী তো কতই লেখা হয়, বন্য প্রাণীদের চরিত্র সংশোধন, নরখাদকদের স্বভাব বদলানোর এমন একসপেরিমেন্ট খুবই চিত্তাকর্ষক। আর এক বিখ্যাত সংরক্ষণবাদী John Aspinall এই বইয়ের 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছেন। তাতে জানিয়েছেন : 'A scion of a princely house, Arjan Singh is a reformed hunter. The great work that he has done and the example that he has set, has fully expiated his early transgressions. Who else has put a tiger and an Indian Leopard born in zoos back to the wild and then seen them breed? A remarkable pioneering achievement'। স্মরণযোগ্য যে, অর্জন সিং তাঁর কৃতিত্বের জন্য ১৯৭৬-এ The World life Fund-এর স্বর্ণপদক পেয়েছেন, যা আর কোনও এশিয়াবাসী পাননি।

বাঘ আর নরখাদক বাঘদের সম্পর্কে ভ্রান্ত

বিমল কর
অতঃপর ৪০
শেষ বেলার গল্প ৪৫
খেলাঘর ২৫
চুম্বক চিকিৎসা ৩৫
পুনশ্চ ও অনাবৃত্ত ৩৫
ভাস্কর রাহা সম্পাদিত
রহস্য কাহিনী
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা ২০
নিখিলচন্দ্র সরকার
সাজাও আলোয়
ধরিত্রীরে ৪০
সমরেশ মজুমদার
যুগল মিলন ৪০
ফুলবাহার ৩০
জীবনযাপন ৩০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
দূরের মালঞ্চ ৩০
অমিতাভ বসু
প্রেমপত্রে জন কীটস্ ১৬
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বারবার ফিরে আসি ৪০
আলপনা আর শিখা ২৫
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে ৩৫
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সুখের আড়াল ২৫
সময় ২৫
আমাদের অন্যান্য বই
প্রবোধকুমার সান্যালের
হাসুবানু ৫০
বনস্পতির বৈঠক ১০০
ডঃ দীপক চন্দ্র সম্পাদিত
হরিবংশ ১০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক
রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম শতবর্ষে
দীপায়নের শ্রদ্ধার্ঘ
চারখণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে

নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ

রমেশচন্দ্র সেন

নির্বাচিত সংগ্রহ ॥ প্রথম খণ্ড
উপন্যাস ❑ শতাব্দি
ছোটগল্প ❑ ডোমের চিতা। মৃত ও অমৃত। তারা তিনজন। একফালি জমি। ভিখারীর জন্ম। রাজার জন্মদিন।

নির্বাচিত সংগ্রহ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড
উপন্যাস ❑ গৌরীগ্রাম
ছোটগল্প ❑ প্রেত। সাদাঘোড়া। ভাত, অফিসের ধুতি। দু-ধারা। হারানি। অন্তর ও বাহির।

নির্বাচিত সংগ্রহ ॥ তৃতীয় খণ্ড
উপন্যাস ❑ কাজল
ছোটগল্প ❑ যৌবন। কোষ্ঠাকী পাশা। বিয়োগান্ত। খোসা। সুয়ার্ডজিন। কাশ্মিরী তুষ। সাকির প্রথম রাত্রি। পদ্মা।

নির্বাচিত সংগ্রহ ॥ চতুর্থ খণ্ড
উপন্যাস ❑ মালঙ্গীর কথা। পূর্বরাগ
ছোটগল্প ❑ তাতু হাকিম। কৈলাস। রাজা। টাইমটেবিল। লটারীর টিকিট। জেন্টলম্যান এণ্ড কোম্পানি। বেঙ্গল অর্ডিনান্স নাম্বার ফোর। অল ইন্ডিয়া হাসব্যান্ড কনফারেন্স।

দীপায়ন : ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯

ধারণার অবসান, আর সেই সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য লেখক কলম ধরেছেন। শুভানুধ্যায়ীরা আত্মজীবনী লিখতে বলাতে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নেন। লেখকের মূল বক্তব্য : মানুষই বাঘকে মানুষখেকোতে পরিণত করে। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ১৯৭২ থেকে সিংহের পরিবর্তে যা আমাদের জাতীয় পশু সেই বাঘ সম্পর্কে বহু বিষয়েই তো প্রাণিবিজ্ঞানী বা প্রকৃতিবিদদের মধ্যে মতের মিল নেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে। যেমন 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' স্বতন্ত্র প্রজাতির অনেকে ভাবেন, তা তো ঠিক নয়; এরা ভারতীয় ব্যাঘ্র প্রজাতিরই অংশ। সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা অবশ্য দুধওয়া থেকে আলাদা, সেখানে মানুষখেকোর চরিত্রও ভিন্ন। অর্জন এর আগেও বাঘ নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছিলেন, যেমন 'টাইগার হ্যাভেন', 'তারা, আ টাইগ্রেস', 'টাইগার! টাইগার' ইত্যাদি। বর্তমান বইটির আত্মজৈবনিক চরিত্র ছাড়াও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। লেখকের নিজের ভাষায় : 'This book is written with a definite purpose—it aims to spread the message that wildlife, and in particular the tiger and other predaters, must be protected far more effectivly than at present. This is essential not only because animals are wonderful in themselves, but because their presence in the wild is the surest way of stemming environmental degradation'। এ বিষয়ে কিন্তু দ্বিমত নেই। বাংলা ভাষাতেই বাঘ নিয়ে অনেক বই আছে—বিশ্বনাথ বসু, কল্যাণ চক্রবর্তী ও রতনলাল ব্রহ্মচারীর তিনটি ভালো বইয়ের কথা এখনই মনে পড়ছে—[illegible] বইটি পড়লে পাঠকরা উপকৃত হবেন।

আগেই লিখেছি অর্জন সিং অভিজাত বংশের সন্তান, অথচ যাকে বলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো তা তাঁর হয়নি, তাঁকেও নানাভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই বললে তা হাস্যকর ও মিথ্যে হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, [illegible] কি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও [illegible] তাঁকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে লড়তে হয়েছে। [illegible] অনুপ্রাণিত [illegible] ভিন্ন মাত্রার সার্থক [illegible] রণধীর সিং আলুওয়ালিয়া [illegible] কাপুরথালার রাজা, [illegible] মহারাজা রঞ্জিত সিংহের [illegible] সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশ [illegible] সাহায্য করার প্রতিদানে [illegible] যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান [illegible]) বাহারাইচ জেলায় [illegible] হরনাম সিং, রণধীরের [illegible] সিংহাসন থেকে [illegible] হয়েছিলেন—পরে [illegible] শিখধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান [illegible] লেখক এক দিকে [illegible] পূর্বপুরুষদের কথা, [illegible] পরিবেশ, এই শতকের [illegible] প্রেক্ষাপট, বাল্য ও [illegible] চেনাশোনা মানুষদের [illegible] ছোটবেলা থেকে [illegible] অভিজ্ঞতা, পশুপাখির [illegible] ব্যবহার শিখে [illegible] কথা।

তো, এভাবেই [illegible] পিতামহ স্যর [illegible] যশবীর (১৮৮৯-১৯৫১ [illegible] প্রাক্তন ছাত্র, পরে [illegible] সার্ভিসের সদস্য [illegible] স্বাধীন ভারতের [illegible] পাই দাদা [illegible] বোন [illegible] ব্রিটিশ অফিসার [illegible] বলরামপুর [illegible] নৈনিতাল-দেরাদুনের [illegible] গ্র্যাজুয়েট [illegible] যোগ দিয়ে শেষ [illegible] যুক্তপ্রদেশে এসে কৃষি ফার্ম [illegible] কথা। [illegible] সঙ্গে [illegible] (পৃঃ ২০-২১)। [illegible] ক্রিকেটার ও [illegible], তার শিকারিজীবন এই [illegible]। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক [illegible] একজন পশু হত্যাকারী থেকে [illegible] সংরক্ষণবাদী হয়ে ওঠার কাহিনী! [illegible] স্বীকার করছেন : 'Killing no Longer gave me a sense of achievement' (পৃঃ ৫৫)। ততদিনে তিনি ঘাঁটি গেড়েছেন [illegible] হওয়াতে, গড়ে তুলেছেন 'টাইগার হ্যাভেন'। চতুর্থ অধ্যায়টির শিরোনাম 'শিকার', [illegible] মর্মস্পর্শী এবং অকপট, তাই [illegible] দেয়। তাঁর মতে হান্টিং [illegible] স্পোর্টস হতে পারে না। তাই [illegible], 'Sport Killing must be declared illegal' (পৃঃ ৬৪), অথবা 'Man has no right to destroy what he cannot create' (পৃঃ ৬৬)। এই অহেতুক প্রাণিহত্যার নামই তো শিকার, যার পিছনে মানুষের ইগো কাজ করে। এই জন্য নেপালের মতো

[illegible] বিদেশে সাহিত্যে পুরস্কৃত
[illegible] ভট্টাচার্যের
[illegible] রসিক শরৎচন্দ্র ৩০
[illegible]
নির্বাসিত সাহিত্য
[illegible] ৮০ ১ম ৫০ ॥ ২য় ৪৫
[illegible] ও টেগার্ট ২৫
[illegible]

কবি বিনয় মজুমদারের
[illegible] আমাদের প্রণাম
[illegible] বিনয় মজুমদার সংখ্যা
[illegible] এই অমূল্য সংখ্যাটি অবশ্যই
[illegible]। প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম
[illegible] জন্মদিনে ১৭ই সেপ্টেম্বর '৯৪
[illegible] গ্রামে সবার উপস্থিতি কাম্য।
[illegible] মণ্ডল রোড কলকাতা-২

"দশ দিগন্ত" সিরিজের পর
[illegible] "পঞ্চালিকা" সিরিজ
[illegible] শ্রীপারাবত-এর
পঞ্চালিকা
[[illegible] উপন্যাস : আমি সিরাজের বেগম, [illegible], স্বর্ণালী সন্ধ্যা, জনমে জনমে, শতরূপে শতবার] ৪১৫ পৃষ্ঠার বই ॥ দাম : ৬০ টাকা
প্রতি খণ্ডে ১০টি করে উপন্যাস :
এখন পাওয়া যাচ্ছে
দশ দিগন্ত ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/১০০
দশ দিগন্ত ॥ সমরেশ বসু/৮০
দশ দিগন্ত ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়/৮০
দশ দিগন্ত ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়/৮০
দশ দিগন্ত ॥ আশাপূর্ণা দেবী/৮০
দশ গোয়েন্দা রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন/৬০
মৌসুমী প্রকাশনী ॥ ১এ কলেজ রো ॥
কলকাতা-৯ ফোন/ ২৪১-৩৭৫২

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কিশোর অপু
পথের পাঁচালী অপরাজিত ও কাজল-এর
সচিত্র কিশোর সংস্করণ ॥ দাম ৫০
অন্যান্য ক্লাসিক গ্রন্থসমূহ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান ৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ৭৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাঙলার ডাকাত ৭৫
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ৫০

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকৃতি-সমৃদ্ধ দেশে আজ বন্য পশু প্রায় বিলীন। ব্রিটিশ প্রভু ও দেশীয় রাজা-মহারাজা, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীকে লেখক করেছেন তীব্র শ্লেষ-মিশ্রিত সমালোচনা। বলা বাহুল্য, শিকারপ্রেমী মানুষেরা লেখকের বক্তব্য মানবেন না। তবে অর্জন বলবেন : মানুষ মানুষকে মারলে তা হত্যা আর বনের পশু মারলে তা শিকার ? তা-ও প্রশংসা করতে হবে ?

বর্তমান বইয়ের পঞ্চম প্রবন্ধটি মূল রচনা, যাকে ইংরিজিতে বলে টাইটেল এসে। বাঘ মানেই কি মানুষখেকো ? এ বিষয়ে অজস্র ভ্রান্ত ধারণা দূর করার ক্ষেত্রে অর্জন সিং তীক্ষ্ণ যুক্তি, সহজ বিশ্লেষণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অসামান্য মমত্ববোধ নিয়ে যেভাবে কলম ধরেছেন, তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। 'দ্য লিজেন্ড অফ দ্য ম্যানইটার' প্রবন্ধটি সামনে রেখে শেষের এক ডজন রচনা পড়লে লেখককে পৃথিবীবিখ্যাত 'বর্ন ফ্রি'-র প্রবক্তা জয় ও জর্জ অ্যাডামসন বা নরমান কার কিংবা ভারতে প্রবাদ-প্রতিম জিম করবেট বা কেনেথ স্যানডারসনের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করে। বিভিন্ন কারণে বাঘ মানুষখেকো হতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মনে পড়ছে করবেট সাহেবও 'ম্যানইটার্স অফ কমায়ুঁ' বইতে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। বাঘকে মানুষখেকোতে পরিণত করার পিছনে মানুষের দায়িত্ব নিয়ে অর্জন সিং জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। একটা কথা শুধু বলার আছে। স্যানডারসন, স্টুয়ার্ড-বেকার, জর্জ শালার, ডানবার ব্রান্ডার প্রমুখ বিদেশি এবং কৈলাস সাংখালা, ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভারতীয় লেখকদের রচনাদির পরিচয় বইতে থাকলে ভালো হত। তা ছাড়া কিছু পরিসংখ্যানেরও প্রয়োজন ছিল।

জিম করবেট সাবধান করেছিলেন যে, যদি ভারতে নির্বিচারে বাঘ মারা হয়, তা হলে 'India will be poorer by having lost the finest of her fauna'। তবে মানুষ এই ক্ষমাহীন ভুল কাজ করে যে চরম ক্ষতি করেছিল, তা নিজেরাই বুঝতে পেরে ১৯৭২-এ মেনে নেয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ-আইন, প্রকৃতি রক্ষাকল্পে তৈরি করে ব্যাঘ্র-প্রকল্প বা 'প্রোজেক্ট টাইগার'। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। সাধারণ মানুষ পরিবেশ, প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতন না হলে যে লোভী চোরাশিকারি বা পোচার, বাণিজ্যলোভী ব্যবসায়ী, ধূর্ত রাজনীতিবিদ এবং নানা অসাধু মানুষদের ঠেকানো যাবে না, অর্জন তা পরিষ্কার করে লিখেছেন। তাঁর এ অধিকার আছে। সরকারি বন্য-বিভাগের নানা গাফিলতিরও তিনি সমালোচনা করেছেন। তবে সংরক্ষণ আজ সর্বস্বীকৃত, কেউ-কেউ হয়তো আর্ম-চেয়ার কনসারভেশনিস্ট ; তবে অর্জন সিং তা নন। ভারতের অর্ধশতাধিক জাতীয় উদ্যান এবং আড়াই শো অভয়ারণ্যের মধ্যে পনের-ষোলটি ব্যাঘ্রপ্রকল্প সংরক্ষণের কারণেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দুধওয়া ন্যাশনাল পার্কের কথাই স্বাভাবিকভাবে শুনিয়েছেন অর্জন এবং সেই সঙ্গে বারেবারে এসেছে তাঁর প্রিয় 'তারা'র কথা, টাইগার হ্যাভেনের কথা। বাঙালি পাঠকদের কাছে অবশ্য ওড়িশার সিমলিপালের প্রয়াত সরোজ রায়চৌধুরী ও তাঁর পোষা বাঘিনী খৈরী যত পরিচিত, অর্জন ও তাঁর পোষা বাঘিনী 'তারা' (যার জন্ম চিড়িয়াখানায়, পোষ মানান অর্জন এবং পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়) তত পরিচিত নয়।

এর পর ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মাকানপুরী, বিষেণপুরী, টিরকোলিয়া, নাগরোল-নেওরা, বরাউছা নালা, ঘোলা, সালুকাপুর, বাংগাঝালা

পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ
হলিডে হোমের খোঁজ খবর
৩০.০০ ডাকে নিলে ৪০.০০ পাঠান
সংকলক : অজয় মণ্ডল
পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স, দে বুক স্টোর, কথা ও কাহিনী, শৈব্যা পুস্তকালয়, বুক সাপ্লাই এজেন্সী
মিত্র পাবলিশার্স ৮১বি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে
অনন্য গবেষণা গ্রন্থ
হোমিওপ্যাথি ও আধুনিক বিজ্ঞান
ডাঃ পরমেশ বসু
মূল্য ৪০ টাকা
বিশ্বকোষ পরিষদ
৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

চার্লি চ্যাপলিনের
এই যে আমি
২ খণ্ড ১০০
অনুঃ অর্ণব রায়
মন্দ্রিতা সেনগুপ্তর
এভারেস্টের কাছে অপরূপা অন্নপূর্ণা
• ট্রেকিং ম্যাপ সহ •
কসমো স্ক্রিপ্ট ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রকাশিত হয়েছে
ছোটদের সেরা গল্প বই
এক ঝুড়ি গল্প ১৮
যাঁদের গল্প আছে : শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সঞ্জয় ঘোষ।
অধুনা প্রকাশনী, ৪৯ মিলন পার্ক, গড়িয়া, কলি-৮৪
পরিবেশক : দে বুক স্টোর, কলি-৭৩
সকল বিশিষ্ট দোকানে পাওয়া যায়।

নীলগ্রীব সিংহ'র
স্যার ডেরেকের নোটবুক
অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞান গল্প, ২০
বুলুমাসীর পেতাত্মা
রসঘন ছোটগল্প, ২৫
গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধানসরণী, কলি-৬

৪১ তম নলজাতকের কলকাতায় আগমনের হোতা ডঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীকে অনামিকার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।
নলজাতিকা দুর্গা ও ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী আলোচনা এবং নলজাতক প্রক্রিয়ার চরমতম রূপদানের কল্পনাসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ রচনা
রঞ্জিতকুমার সিংহ-র
মহাশূন্যে নলজাতক ২৫.০০ টাকা
আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের জন্য বিশেষ ছাড় বিক্রয়মূল্য ১৮
অনামিকা পাবলিশার্স
১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯

কবি বিনয় মজুমদারের ষাট বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি
বিনয় মজুমদারের ডায়েরি ২৫
ভূমিকা লিখেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদনা : অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়
অন্য সাম্প্রতিক প্রকাশনা :
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উর্বর উর্বশী : উৎসের অতিক্রমণ ও মৌলিক নির্মাণ ২০ সুমিতা চক্রবর্তী
ভালবাসার নীরব শব্দেরা ১২ কমল মুখোপাধ্যায়
শিলীন্ধ্র প্রকাশন ৩, টি. এন. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৯০
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, পঁচিশে

ওশো (রজনীশ)
তার সবচেয়ে বিতর্কিত বইর বঙ্গানুবাদ
"সম্ভোগ থেকে সমাধির দিকে" ২৫
প্রাপ্তিস্থান : চেতনা রজনীশ ধ্যান কেন্দ্র
২৮ চৌধরী লেন, কলিকাতা-৪
দূরভাষ ৩৩-৫০০২

পূজার ছুটিতে ছোটদের মনমাতাতে এলো
আনন্দ উৎসব ৩৫
সম্পাদনায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রবিদাস সাহারায়
সত্যজিৎ রায়, বিমল মিত্র, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোঃ, শীর্ষেন্দু মুখোঃ, সঞ্জীব চট্টোঃ, বিমল কর, সমরেশ মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অনীশ দেব, অদ্রীশ বর্ধন।
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গল্প, *নারায়ন দেবনাথের* কমিকস।
অনিল ভৌমিকের সম্পূর্ণ নতুন একটি ফ্র্যান্সিস কাহিনী
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

ইত্যাদি এলাকার মানুষখেকো বাঘ নিয়ে অর্জন সিং রোমহর্ষক অথচ সত্য ঘটনা শুনিয়েছেন। এখানেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য নরখাদক সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা। তবে কেউ কেউ এতটা মাতামাতি হয়তো পছন্দ করবেন না। বিশেষত আমাদের সুন্দরবনের অভিজ্ঞতায়। এ কথাও কেউ কেউ বলেন, 'মানুষ মেরে বাঘ বাঁচানো আদৌ উচিত কিনা' ভেবে দেখা দরকার। অর্জন সিং-এর বইটি পড়ে মনে হলো প্রকৃতি, মানুষ ও বন্যপ্রাণী সকলেই তো রক্ষা পেতে পারে। বন্যেরা বনে সুন্দর, মানুষ সভ্য সমাজে—এই হোক না আধুনিকতার আদর্শ।

গৌতম নিয়োগী

●

দর্শন বিজ্ঞান যুক্তি

এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে/ সুজন দাশগুপ্ত
আনন্দ পাবলিশার্স/কল-৯/১৫.০০

গোলকদার কমপিউটার ক্লাস
পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত
আনন্দ পাবলিশার্স/কল-৯/২৫.০০

আমার মা সব জানে/ অম্রীশ বর্ধন
আনন্দ পাবলিশার্স/কল-৯/৪০.০০

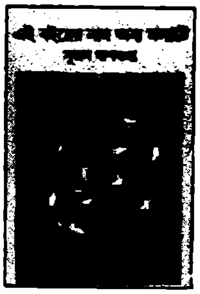

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পরিচিন্তন মানুষের এক ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি। সে এই বিশ্বচরাচর ও তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের বিষয় চিন্তা না-করে পারে না। এককথায় বলা যায় দার্শনিকতা মানুষের স্বভাবধর্ম। তাই গ্রিক দার্শনিক Aristotle বলেছেন : আমরা দর্শনচিন্তা করব কি করব না সেটা কথা নয়, দর্শনচিন্তা আমাদের করতেই হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটা নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি— যাকে তার দর্শন বলা যায়— সেটা, তার সকল বিচার, ভাবনা, চিন্তা ও চেষ্টার মূলে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই দর্শন মূল্যযুক্ত হবে তখনই যখন তা সর্বজনীন বুদ্ধির দাবি মেটাতে পারবে। জীবন ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত মৌল প্রশ্নগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর তার মধ্যে পাওয়া যাবে। দর্শনে যথেচ্ছ কল্পনার স্থান নেই, দর্শনচিন্তা অভিজ্ঞতার তথা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়, দর্শনের ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের চেয়ে প্রশস্ততর হলেও বিজ্ঞানের মতো দর্শনের প্রণালীও আগাগোড়া যুক্তিমূলক মানব-অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেখিয়ে দেওয়া দর্শনের অন্য আর এক লক্ষ্য। অথচ অন্য দিকে লজিক বা যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে চিন্তার নিয়ামক সূত্রাবলি এবং শুদ্ধ চিন্তার আকার-প্রকার বিষয়ে সমীক্ষণ। লজিকের প্রশ্ন— নির্ভুলভাবে চিন্তা করতে হলে আমাদের কি ধরনের চিন্তা করা উচিত। এই দুই বিদ্যার পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় : বস্তু-স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে দর্শন, এবং শুদ্ধ বা যথার্থ চিন্তা আলোচনা করে যুক্তিবিদ্যা। অন্যভাবে বললে বলা যায়, দর্শনের বিষয়বস্তু হল সত্তা এবং যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু যুক্তি বা চিন্তার শুদ্ধ রূপ।

লজিক বলে জগতের কোনও কিছু সম্বন্ধে যদি নির্ভুলভাবে চিন্তা করতে হয় তা হলে চিন্তাকে উপযুক্ত যুক্তিগত ভিত্তি তথা প্রমাণের ওপর স্থাপন করতে হবে। কোনও যুক্তিপ্রমাণ কেন অবলম্বনীয় সেটা বুঝিয়ে বলা লজিকের কাজ। তাই Mill যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হল প্রমাণের মূল্যায়ন সংক্রান্ত চিন্তা-প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা কোন কোন নিয়মের ওপর নির্ভর করবে, যুক্তিবিদ্যা তাই নির্ণয় করে থাকে।

তবে সত্যি সত্যি আমরা এক ধন্ধে পড়ে যাই সুজন দাশগুপ্তের বইটি হাতে নিয়ে। কায়দা করে বইয়ের নাম খোঁজানোর অছিলায় আমাদের মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে চলে যায় বইয়ের ভেতরে। একদম গহীনে। সেখানে রয়েছে সমস্যা ও তার নানান সমাধান,এম. সি. এশারের ছবি, নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার চক্করে, দৈনন্দিন জীবনের প্যারাডক্স, রেমন্ড স্মালিয়ানের মজাদার ধাঁধা এবং দুটি জনপ্রিয় ধাঁধার খেলনা। প্রত্যেকটি রচনা আমাদের এক অদ্ভুত অনুভূতিতে পৌঁছে দেয়। পড়তে শুরু করলে গড়গড় করে এগিয়ে নিয়ে চলে। সুন্দর ব্যঞ্জনা এবং পরিবেশন। কিন্তু হঠাৎ করে থেমে পেছন ফিরে তাকাতে চাইলে কিছুক্ষণের জন্য থমকে পড়তে হয়। কেননা পড়ার সময়ে যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, এখন যেন সেরকম মনে হয় না। বাধো বাধো ঠেকে। ঠিক-ঠিকভাবে হিসেব মিলতে চায় না। তবু মজা রয়েছে, মনকে আনন্দ দেয়। ভাবতে শেখায়। তৃপ্ত করে এবং শেষে পৌঁছে দেয় দার্শনিক সত্যের মুখোমুখি। অবশ্য সে জায়গায় পৌঁছে আমরা সব সমস্যাকে যুক্তির তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে জব্দ করতে পারি না। তবু সমস্যা সেও সমস্যাই। তাকে সমাধানও করতে হয়। এর জন্য চাই স্বচ্ছ ও মুক্ত মন। যুক্তির অপপ্রয়োগ থেকে যেমন প্যারাডক্সের সৃষ্টি হয় তেমনি সুপ্রয়োগও সেখান থেকে বাদ পড়ে না। বিশ্বাস, অনুমান এবং যুক্তির ওপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তাকে অস্বীকার করা খুবই শক্ত। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। একদম সঠিক বলার সাহস হয় না। অর্থাৎ যে কথা আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে মনে হলেও সত্যবিরোধী নয়, Contrary to opinion, বিজ্ঞান বা দর্শনের জগতে প্যারাডক্সের যথেষ্ট মূল্য, এ ছাড়াও রয়েছে ধাঁধার নিছক আনন্দ। আমাদের ভেতরের যুক্তিবুদ্ধিকে শানানো করে দেয়। বুদ্ধি বা চিন্তা থেকেই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি। মানুষের মনে কতকগুলো স্বতঃপ্রমাণ ধারণা ও সূত্র ভেতরে ভেতরে গাঁথা থাকে। এগুলো বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। সহজাত। অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নয়। মানুষের মনের মধ্যে ওতপ্রোত। এই সমস্ত সুস্পষ্ট স্বচ্ছ ধারণা থেকে যুক্তিক্রিয়ার সাহায্যে অবরোহ পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত আকর্ষণ করা হয়, তাকে বলে জ্ঞান। জ্ঞানবিদ্যা সাধারণভাবে জ্ঞানোৎপত্তির আলোচনা। এই বিদ্যা মানুষের জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত ও সীমা বিচার করে। লজিক বা যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে চিন্তার যথার্থ আকার বিষয়ে। লজিকের বিচার্য বিষয়— কোনও আকারে চিন্তাকে সাজালে ভ্রমপ্রমাদমুক্ত হয়।

দর্শন মানুষের জ্ঞান-স্পৃহার ফল-পরিণতি। বিজ্ঞানও তাই। উভয়ের উদ্দেশ্য সত্যসন্ধান অর্থাৎ যুক্তিসম্মত সুশৃঙ্খল জ্ঞান। এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা আবিষ্কারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাকে সুবোধ্য করতে সচেষ্ট। বাস্তবিক মানব-সংস্কৃতির আরম্ভযুগে দর্শন ও বিজ্ঞানের এলাকা ছিল অভিন্ন।

প্রাচীন মনীষীগণ দর্শনকে জড় জগতের জ্ঞান থেকে ভিন্ন কিছু মনে করতেন না। তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের উপলব্ধি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ক্রমান্বয় অগ্রগতি। চলমান বাস্তব দৃশ্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তৎপর করে তুলছে। আর এই আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে দার্শনিক তাগিদ বা প্রবৃত্তি।

প্রত্যেক শাস্ত্রই ক্রমান্বয়ে কতগুলো সম্প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং সেগুলো প্রথিত করে নির্দিষ্ট বিষয়ের এক সুসংহত জ্ঞানে পৌঁছায়। তেমনিভাবে জগৎ-জীবন সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় সম্প্রত্যয়ের বিচার-বিবেচনা দ্বারা দর্শন এক সংগঠিত চিন্তা অর্থাৎ শাস্ত্র হয়ে ওঠে। মানব-অভিজ্ঞতার বা বিশ্ব চরাচরের কোনও একটি দিকও বাদ পড়ে থাকে না এই শাস্ত্র থেকে। John Cavid-এর ভাষায় There is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of

reality, which lies beyond the domain of philosophy or to which philosophical investigation does not extend.
অতএব লেখক যতই কারিকুরি করে বইয়ের নাম লিখতে গিয়ে আমাদের ধন্ধে ফেলুন না, আমরা সে নাম খুঁজে পাই, আবার পাইও না।

গোলকদার অবশ্য সে ধরনের কোনও ধন্ধ নেই। কেননা তিনি গবেষণাগার নিয়ে ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, তিনি একজন দুঁদে প্রযুক্তিবিদ। অনেক দায়িত্ব মাথার ওপর। গবেষণাগারের সাহায্যে এই প্রযুক্তিবিদ অনেক সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট।
পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত গোলকবিজয় রাহার মতো একজন তরুণ তুখোড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভীষণ উপকার করেছেন। এ উপকার শুধুমাত্র আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয়, তরুণ ছাত্রছাত্রী যারা কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় কিংবা প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত তাদের প্রত্যেকেরই জন্য গোলকদার কমপিউটার ক্লাসে যোগদান করা অত্যন্ত লাভজনক।
যন্ত্রগণকের সূত্রপাত থেকে তার ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ, সুন্দর সহজ অতি পরিচিত সমস্ত উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর উপায় গোলকদার অন্য আর এক বিশেষ গুণ। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়।
অ্যাবাকাস থেকে শুরু করে প্রথম যন্ত্রগণকের আবিষ্কর্তা মিস্টার পাসকেল [১৬৪২ সালে আবিষ্কারের সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮], গণিতজ্ঞ চার্লস পি ব্যাবেজ [আধুনিক কমপিউটারের রূপকার] সবাইকে গোলকদা তাঁর আলোচনায় এনে হাজির করেছেন।
বর্তমান পৃথিবীর যে-কোনও বিষয় যে-কোনও কাজ আমরা যেভাবেই করতে চাই না কেন, কমপিউটার ছাড়া সে ভাবনা ভাবা সম্ভব নয়। দ্রুততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে নিজেকেও দ্রুততর করে তুলতে হবে। তা না হলেই পিছিয়ে পড়া অনস্বীকার্য। ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সংক্ষেপে যাকে আই টি বলা হয়, আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। 'ইনফর্মেশন নিয়ে একটা গোটা ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প চলছে সারা দুনিয়ায়।' তাই ইনফর্মেশন বা তথ্যের আদান-প্রদান রক্ষা আর তার ব্যবহারের জন্য নতুন বিজ্ঞান সূচিত হয়েছে। সেই ইনফর্মেশন টেকনোলজির মূল বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কম্পিউটার।
পৃথিবী যেভাবে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরাও ক্রমবর্ধমান। তাই কম্পিউটারই বা পেছিয়ে থাকে কি করে। একের পর এক সেখানেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। নিত্যনৈমিত্তিক কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কম্পিউটার একের পর এক প্রজন্ম শেষ করে অন্য প্রজন্মে প্রবেশ করছে। কাজের নিয়ন্ত্রণ, সুযোগ-সুবিধা, সময় পরিমাপ সবকিছুকে মাথায় রেখে মানুষের উদ্ভাবনা এক থেকে অন্য, তারপর আর এক অন্যে পৌঁছচ্ছে।
প্রযুক্তিগতভাবে কম্পিউটার প্রজন্মের বা জেনারেশন-এর ইতিহাস সময় ভাগ করলে দাঁড়ায় ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রথম প্রজন্ম। দ্বিতীয় প্রজন্ম ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৃতীয় প্রজন্ম। তারপর থেকে চলছে চতুর্থ প্রজন্মের

●

মানুষের কল্পনার শেষ নেই। নিয়ত এই কল্পনার জাল বোনা চলছে। কেউ কেউ বলেন, বেশি কল্পনাপ্রবণ হওয়া ভাল নয়। কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক আবার ঠিকও নয়। কেননা ইমাজিনেশন বা কল্পনা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়।

●

সময়কাল। এর পর আমরা পঞ্চম প্রজন্ম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছি এবং সে ব্যাপারেও আমাদের অনেকটা পথ-পরিক্রমা হয়ে গেছে। ভাল্‌ভ, ট্রানজিস্টর, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এবং লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পৌঁছানোর মূল সূত্রসংকেত।
বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন ভবিষ্যতের কম্পিউটার একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে চলতে পারবে অর্থাৎ প্যারালাল প্রসেসিং। 'মানুষের মস্তিষ্কের মতো এরাও সমান্তরালভাবে কাজ করতে পারবে।'
মানুষের কল্পনার শেষ নেই। নিয়ত এই কল্পনার জাল বোনা চলছে। কেউ কেউ বলেন, বেশি কল্পনাপ্রবণ হওয়া ভাল নয়। কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক, আবার ঠিকও নয়। কেননা ইমাজিনেশন বা কল্পনা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই বোধ হয় বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন, কল্পনা মোটেও প্রবণতা নয়, উদ্ভাবনার সূত্র।
গোলকদার কম্পিউটার ক্লাস করেছে এরকম কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই এই ক্লাসে যোগ দিতে পারার জন্য ভীষণ খুশি। তবে আরও খুশি হবে গোলকদা যদি কম্পিউটার নিয়ে আরও ক্লাসের সংখ্যা বাড়ান। ওদের মধ্যে একজন আবার জোর গলায় জানিয়েছেন, এটা শুধুমাত্র আমাদের অনুরোধ নয়, আবদার। গোলকদাকে কম্পিউটারের আরও কিছু ক্লাস নিতেই হবে।

পৃথিবীতে অন্তহীন বিষয়। অসংখ্য প্রশ্ন এবং তার যুক্তি। অবশ্য কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে যার ব্যাখ্যায় কোন 'অথবা' থাকে না। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয় এবং সে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন অনেক সময়েই করা হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে ছোটরা সে বাপারে কোনও বালাই মানে না। উল্টোপাল্টা যে-কোনও বিষয় নিয়ে দুমদাম প্রশ্ন করে বসে। বেশির ভাগই এ ধরনের সমস্যা ঘরে বসে যাঁকে সামলাতে হয়, তিনি হচ্ছেন মা।
অতএব হাতের কাছে এধরনের বই থাকলে যথেষ্ট সুবিধা। অদ্রীশ বর্ধন 'আমার মা সব জানে' বইয়ে সেইরকমই কিছু বিষয় নিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্ল্যাক হোল, আইনস্টাইন, গীতা, শব্দ— এইরকম আঠাশটি বিষয়কে ভিন্ন-ভিন্নভাবে সাজিয়ে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তর সাজিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রচেষ্টা। এইভাবে আরও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে গ্রন্থের সংযোজন হলে অনেকেই উপকৃত হবে। তবে বয়ঃক্রম ধরে বিষয় নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি এবং বৈজ্ঞানিক। যদিও আমাদের দেশে সে জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রবণতা যথেষ্ট কম।
বিষয়কে ধরে বিষয়ের বিন্যাস।
সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনা। যাদের জন্য লেখা হচ্ছে তাদের জন্য ভাবনা-চিন্তা করা। পরিবেশ, পরিস্থিতি, কোনও কিছু বাদ পড়বে না সেই রচনায়। সামগ্রিকভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। কেননা ছোটরা মোটেও ছোট নয়। উত্তরকালে সেই হবে একজন দেশের নাগরিক। তাদের সুচিন্তা করার এবং সঠিকভাবে পথ দেখানোর দায়িত্ব সবটুকু নির্ভর করে যাঁরা তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।
শিশুর প্রাথমিক উন্মেষ হয় গৃহপরিবেশে। পরিবারই শিশুর আত্মবিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র, প্রথম শিক্ষার স্থান। শিশুর অভিভাবন, সহানুভূতি ও অনুকরণক্ষমতা আছে। এর সাহায্যে তার অনুভূতি, আচরণ, ভাবনা সঞ্চারিত হতে থাকে। সে বিভিন্ন ভাবনার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায়। কৌতূহল হয়। সে যাচাই করতে শেখে। বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা জন্মায়। শিশুর ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে এই সময় থেকে।
দেবব্রত মল্লিক

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

একটি শতাব্দের সেতু পেরিয়ে সোজা হেঁটে চলে গেলেন তুষারকান্তি ঘোষ। উনিশ শতকের নাগরিক সংস্কৃতির দীপ্তিমান প্রতিভূ ছিলেন ; ধুতি পানজাবি বা লম্বা কোট, মাঝখানে সিঁথি, সোনার চশমা, ঘাড়ে শাল। অতীব আড্ডাপ্রিয় এবং আসর জমাতে অদ্বিতীয়। এসব তো বাইরের সজ্জা। বিশেষ গুণ ছিল তুষারকান্তির গ্রন্থসংগ্রহ এবং সংগীতপ্রিয়তা। শিশুসাহিত্য এবং বহু পুরনো কিশোর পত্রপত্রিকার সংকলন করেন ; আর বিশেষ একধরনের, যাকে বলা যায়, বটতলামার্কা বইপত্তরেরও তিনি অনুরাগী ছিলেন। তবে সর্বাধিক বিস্ময় হয়ত, তাঁর সাংগীতিক জ্ঞান। কণ্ঠে সুর ছিল আমৃত্যু, প্রাচীন বাংলা গান বিশেষত টপ্পা এবং কীর্তন গানে তাঁর দক্ষতা, পরিবেশনে এবং শ্রবণে উৎসাহ ছিল ঈর্ষণীয়। রাগরাগিণী সম্বন্ধে জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। আগেই বলা হয়েছে, তুষারকান্তি ঘোষের আসর জমানোর কথা। তাঁর সংবাদপত্রের অফিসের কথা শোনা যায়, দীর্ঘকাল ধরে বইপাড়ায় এম সি সরকারের দোকানের সাপ্তাহিক আড্ডায় তুষারকান্তি ছিলেন নিশ্চিত প্রধান আকর্ষণ। সঙ্গী ছিলেন সেখানে সুধীরচন্দ্র সরকার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রবোধ সান্যাল বিশু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। টেবিলের ওপর পাদুটি তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে তুষারকান্তি গম্ভীরমুখে মজাদার কাহিনী শোনাতেন, হঠাৎ গেয়ে উঠতেন নিধুবাবুর টপ্পা বা ঢপ কীর্তন। সেই আসরের গল্পসল্প নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্র কাহিনী, আরও বিচিত্র কাহিনী ইত্যাদি। আসরে দেখা গেল তাঁর অবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি আর বাচনভঙ্গি; আসরের পর আবিষ্কৃত হল তাঁর চমকপ্রদ কলমের অনন্য এক ভঙ্গি। সেই আসর অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেল। শহর কলকাতাও পালটে গেছে। শহরটির শেষ নাগরিক তাঁর পোশাক বচন সুর রসিকতা নিয়ে চলে গেলেন।

●

এখন ব্রিটেনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন বেটি বুথরয়েড। তিনিই যে দেশের হাউস অফ কমন্সের প্রথম মহিলা স্পিকার। খবরটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, যে দেশকে বলা হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান এবং নারীপুরুষের সমানাধিকার বহুকাল স্বীকৃত, সেখানেই এই প্রথম সংসদের পরিচালক হলেন একজন মহিলা। দীর্ঘদিন তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, ১৯৭৩ থেকে পার্লামেন্টের সদস্য, লেবার দলের হুইপ তখন থেকেই। ১৯৮৭ সালে তিনি ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। শ্রীমতী বুথরয়েডের একটি বিশেষ কৃতিত্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তিনি প্রথম বিরোধী দল থেকে স্পিকার হওয়ার সুযোগ পান। তিনি যে শাসক পক্ষেরও আস্থা অর্জন করেছেন তা এ থেকেই বোঝা যায়। ৬৫ বছর বয়স্কা শ্রীমতী বুথরয়েড ব্রিটেনের ১৫৫তম স্পিকার, ১৩৭৭ সাল থেকে স্পিকার ব্রিটেন শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ। কমন্স সভার বিভিন্ন বিতর্কে চেয়ারপার্সন হিসেবে শ্রীমতী বুথরয়েডের চমৎকার পরিচালনা সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁকে কমন্সে মনোনয়ন দেন কনজারভেটিভ দলের মন্ত্রী জন বিফেন। তাঁর মূল্যায়ন : "ভদ্রতা এবং দক্ষতায় বুথরয়েড অসাধারণ।" নিয়মভঙ্গকারী এম পি-দের

শান্ত করতে এবং সভায় স্বাভাবিক পরিবেশ আনতে তাঁর অবদান যথেষ্ট। নিয়ম না মানা জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা যেখানে সারা বিশ্বে ক্রমশ বাড়ছে, সেখানে শ্রীমতী বুথরয়েডের মত পরিচালকের প্রয়োজনীয়তা আরও দরকারি মনে হয়। সঙ্গের চমৎকার ছবিটি শ্রীমতী বুথরয়েডের। এঁকেছেন বিখ্যাত শিল্পী অ্যান্ড্রু ফেসটিং। এটি তাঁর অফিসিয়াল পোর্ট্রেট বা সরকারি ছবি। ওয়েস্ট মিনিস্টারে স্পিকারস হাউসে এই ছবিটি থাকছে।